# পূজা-পার্বণের উৎসকথা

পল্লব সেনগুপ্ত

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা : ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
জয়ন্ত ঘোষ

প্রকাশক :
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা : ৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
পুলিনচন্দ্র বেরা
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন.
কলকাতা : ৭০০০০৬

অরুণকুমার রায়
সংস্কৃতিবিজ্ঞান-চর্চায় আমার দিশারী
তাঁর স্মৃতিতে

# সূচীপত্র

এক ॥ কথারম্ভ : পদ্ধতি ও প্রকরণ / ৩ ; দুই ॥ দেবতা ও ধর্মের বিকাশে সমাজের ভূমিকা / ১০ ; তিন ॥ মাতৃকা-উপাসনা : ইতিহাস ও প্রাক্-ইতিহাস / ২০ ; চার ॥ বাঙালীর সংস্কৃতির পূর্বসূত্র / ৩২ ; পাঁচ ॥ ব্রতকথার ইতিকথা / ৩৯ ; ছয় ॥ নববর্ষ, হালখাতা এবং গণেশপূজা : উৎস ও উৎসব / ৫৬ ; সাত ॥ জামাইষষ্ঠী : সংস্কৃতি-বিবর্তনের দর্পণ / ৬২ ; আট ॥ রথযাত্রা : সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিচিত্র নিদর্শন / ৬৬ ; নয় ॥ মনসার উপাসনা : বিচিত্র সব উৎসের ধারা-সমন্বয় / ৭২ ; দশ ॥ বিশ্বকর্মা : মেহনতী মানুষের নিজস্ব দেবতা / ৮১ ; এগারো ॥ মহালয়া : বহু-সংস্কারের সমন্বয় / ৮৪ ; বারো ॥ মহাদেবীর বোধন / ৮৮ ; তেরো ॥ মহিষাসুরমর্দিনীর প্রত্ন-ইতিহাস / ৯১ ; চৌদ্দ ॥ দুর্গার বিবর্তন : অরণ্যদেবী থেকে শস্যদায়িনী / ৯৮ ; পনেরো ॥ লক্ষ্মীর বিচিত্র কথা : ধর্মে, পুরাণে, ইতিহাসে / ১০১ ; ষোল ॥ দীপাবলী ও কালীপূজা : প্রাগিতিহাসের উত্তরাধিকার / ১০৫ ; সতেরো ॥ ভাইফোঁটার ইতিহাস / ১১১ ; আঠারো ॥ শিবঠাকুরের গোড়ার কথা / ১১৪ ; উনিশ ॥ শিবরাত্রি : সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় / ১২২ ; কুড়ি ॥ সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী : সংস্কৃতি-ভাবনার বিচিত্র সমাহার / ১২৫ ; একুশ ॥ হোলির উৎসব : সমন্বয়ের ঐতিহ্য / ১৩৪ ; বাইশ ॥ চড়ক-গাজন ইত্যাদি : দরিদ্রের মহোৎসব / ১৩৮ ; তেইশ ॥ নানা পার্বণ (১) : ঝুলন, রাস ও রাখীবন্ধন / ১৪২ ; চব্বিশ ॥ নানা পার্বণ (২) : অম্বুবাচী, ইতু, নবান্ন, পৌষপার্বণ / ১৪৫ ; পঁচিশ ॥ নানা পার্বণ (৩) : হুতুমদেও, গম্ভীরা, ভাদু, টুসু, ইঁদপূজো / ১৫০ ; ছাব্বিশ ॥ নানা পার্বণ (৪) : দশহরা, মকরস্নান, কুমিরপূজা, ধর্মপূজা / ১৬২ ; সাতাশ ॥ পশ্চিমবঙ্গের পূজা, পরব ও মেলা : সামগ্রিক সমীক্ষা / ১৬৬

"With each generation, labour became different, more perfect, more diversified. Agriculture was added to hunting and cattle-breeding, then spinning, weaving, metal-working, pottery and navigation. Along with trade and industry, there appeared finally art and science. From tribes there developed nations and states. Law and politics arose, and with them that fantastic reflection of human things in human mind : Religion."

— 'Dialectics of Nature' : F. Engels

॥ প্রথম পর্যায় ॥

# দেবকল্পনা, ধর্মাচার ও পাল-পার্বণ :
# তাত্ত্বিক ভিত্তি
# এবং
# ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত

"আগুন বাতাস জল :
আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাদের দিলো লিপি রচনা করবার আবেগ ;
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন আমিও তোমাকে সৃষ্টি করছি।...
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ....."

—'আদিম দেবতারা' : জীবনানন্দ দাশ

## এক ॥ কথারম্ভ : পদ্ধতি এবং প্রকরণ

বাংলার সমাজজীবনে যে-সমস্ত পাল-পার্বণ, ব্রত, পর্ব-উৎসব বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত আছে, এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাদের উৎস, স্বরূপ এবং বিকাশের ধারাক্রমগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। মূলত হিন্দু-সমাজে প্রচলিত পার্বণগুলি এবং যে-সমস্ত দেবদেবীকে অবলম্বন করে সেগুলি গড়ে উঠেছে, তাদের নিয়েই এই আলোচনামালা। প্রতিবেশী বিভিন্ন আদিবাসী জাতিকোমগুলির পরব-উৎসবের কথা প্রসঙ্গক্রমে এলেও, সেগুলি নিয়ে বিশদ-ভাবে আলোচনা করা হয়নি—যেমন বিশ্লেষণ করা হয়নি মুসলিম, ক্রিশ্চান ও বৌদ্ধ পর্ব-পার্বণগুলির কথাও। এর কারণ দুটি : প্রথমত, হিন্দুসমাজে প্রচলিত পরবগুলি বহুলাংশেই বিভিন্ন আদিবাসী পার্বণের সমধর্মী বা অনেক সময়েই এক-বা-অনুরূপ উৎসজাত হলেও, দুয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে; হিন্দু পার্বণগুলির মধ্যে লোকায়ত এবং শাস্ত্রীয় এই দ্বিবিধ সংস্কারেরই মিশ্রণ ঘটেছে,—আদিবাসী উৎসবগুলির ক্ষেত্রে যা ঘটেনি—এবং এর ফলে হিন্দু পার্বণগুলির মৌলিক রূপ অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। এই কারণেই সেগুলি বিশ্লেষণের পদ্ধতিও পৃথক আর সেইজন্য আদিবাসী পরব আর হিন্দু-পরবগুলি একই সঙ্গে বিচার করতে গেলে আনুপাতিক গুরুত্বের হেরফের ঘটতে বাধ্য। সেটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয়। এজন্যে আদিবাসী পরবগুলিকে বর্তমান আলোচনার প্রত্যক্ষ সীমানার মধ্যে রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে অহিন্দু পরবগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্রই বাঙালী, এমনকি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বলয়ভুক্ত নয়। বিভিন্ন দেশের মুসলিম, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধরা সাধারণত ধর্মাচারের মূল কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ রেখেই ঐ সব পার্বণ, উৎসব পালন করেন। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে বাঙালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাবিবর্তনে তাদের অন্যনিরপেক্ষ ভূমিকা নেই। তবে, গ্রন্থশেষে যে সামগ্রিক সমীক্ষা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, তার পরিসংখ্যানে সেগুলিও সংকলিত আছে, কেন না তা না হলে বাঙালীর জীবনে উৎসব-পার্বণের পূর্ণায়ত গুরুত্বটির পরিচয় মিলবে না। এই বইয়ের আলোচনা এই সব কারণে তাই অবশ্যই সীমায়ত, একথা স্বীকার করা দরকার প্রথমেই।

উৎসব-পার্বণ এবং তাদের উপজীব্য দেবতাদেব মূল রূপগুলি অন্তর্কাঠামোয়-বা-ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যে বিশ্বজনীন,সেই কথাটি কিন্তু অবশ্যই মনেরাখার প্রয়োজন আছে। কিভাবে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বহু সহস্র বছরের পথ পরিক্রমা করে এরা তাদের বর্তমান রূপগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ইতিহাস অত্যন্ত ব্যাপক এবং জটিল। এই বইয়ের মধ্যে বাংলার নিজস্ব সামাজিক-কাঠামোতে ঐ ইতিহাসের অভিক্ষেপণের একটি আভাস দেবারই প্রয়াস পাওয়া গেছে।

॥ ২ ॥

দেবতা, ধর্ম এবং পরব এগুলির উদ্ভব ও বিকাশের মধ্যে যে সর্বজনীনতার কথা উল্লেখ করা হল, তার একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র আছে। গত শতাব্দীতেই লুইস হেনরি মর্গ্যান তাঁর 'এনসেণ্ট সোসাইটি' গ্রন্থের মাধ্যমে সেই সূত্রটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করে গেছেন। আমেরিকার ইরোকোয়া কোমের রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সুদীর্ঘ কাল কাটিয়ে মর্গ্যান যে-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশ কেমন করে ঘটে তার খোঁজ নিতে গিয়ে, সেই তত্ত্বকে উত্তর-কালে সমাজ-ও-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই বিশ্বজনীনভাবে গ্রাহ্য বলেই গণ্য করেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে এঙ্গেলসেব 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যাণ্ড স্টেট' গ্রন্থে যে-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তারও ভিত্তি মর্গ্যানের ঐ সূত্রই। এই বইয়েরও বিভিন্ন পর্যায়ে মর্গ্যানের সূত্রকেই ভিত্তি রূপে গ্রহণ করে আলোচনা করা হয়েছে, এটুকু শুরুতেই বলে রাখা গেল।

অতঃপর বলা সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন যে বর্তমান লেখক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে প্রত্যয়শীল। সুতরাং বিভিন্ন দেবতা এবং পার্বণের আলোচনায় সেই তত্ত্বের প্রত্যয়ই প্রতিফলিত। আদিম শিকার-ও-সংগ্রহ-নির্ভর সমাজ, পশু-চারণজীবী সমাজ, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল শ্রেণীসমাজ—একের পর এক যে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, এবং সেই আসার যে একটা বিশ্ব-জনীন চরিত্র আছে, এমন সত্যটিও অবিস্মরণযোগ্য ভাবে এদের মধ্যে জাগরূক।

স্বভাবতই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তি যে মর্গ্যানীয় সূত্র, তার প্রসঙ্গে এখানে দু-চারটি কথা বলে নিতে হয়। মর্গ্যান দেখিয়েছেন, সমস্ত জাতি এবং কোমই অনিবার্যভাবে সভ্যতার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট স্তরপর্যায়কে ক্রমান্বয়ে

পেরিয়ে আসতে থাকে কালেব অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে। বন্য, বর্বর এবং সভ্য—এই তিনটি প্রধান স্তব পর্যাযের ক্রমবিবর্তনেব মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি, প্রজাতি, কোম, গোষ্ঠী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয। ঐ অগ্রগতির বেগ কোথাও দ্রুত, কোথাও বা ধীর। এর ফলে একই সমযে বিভিন্ন সংস্কৃতি-বলয়ের মানুষেরা, কেউ মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নত, কেউ আবার বেশ কিছুটা পশ্চাদ্‌পদ অবস্থায় থাকে। যারা এগিযে গেছে, তাদের মধ্যেও ঐ পিছিয়ে থাকা অবস্থার স্মৃতি-অবশেষ নানাভাবে, বিশেষত ধর্ম, সংস্কার, আচার, প্রথা ইত্যাদির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যে-সমস্ত দেবতা এবং পার্বণ এই বইয়ের উপজীব্য, তাদেব ক্ষেত্রেও এই বিশ্বজনীন নিয়মেব কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই সভ্যতার এমন সমুন্নত পর্যায়ে উপস্থিত হলেও, আমাদের পূজা-পার্বণ এবং দেবতা-কল্পনা ইত্যাদির মধ্যে প্রাক্‌-সভ্য মোট ছ টি স্তরের (নিম্নতম স্তরের বন্য অবস্থা—মধ্যবর্তীকালেব বন্য অবস্থা—উচ্চতর স্তরের বন্য অবস্থা—নিম্নতম পর্যায়েব বর্বর অবস্থা—মধ্যতন স্তরেব বর্বর অবস্থা—উচ্চতর পযায়ের বর্বব অবস্থা) সাংস্কৃতিক বিকাশের বিচিত্র সব স্মৃতি-অবশেষ খুঁজে পাচ্ছি অনায়াসেই।

সংস্কৃতির যে দুটি সমান্তরাল ধারা—ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকসূচক এবং মানস সম্পদবিকাশী—এরা পরস্পর-সাপেক্ষ এবং আদিকাল থেকেই ধর্ম ও আচাববিধি এদেরকে সমান্তরাল বেগে প্রবহমান কবেছে। বাঁচবার তাগিদে আদিম প্রপিতামহরা জীবিকান্বেষণে নিমগ্ন হয়েছেন এবং সেই জীবিকার তাড়নাতেই তাঁদের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, পুরাণবৃত্তান্ত প্রভৃতি সৃজনশীল কলাগুলিও হয়েছে বিকাশমান। শিকার চাই বাঁচার প্রয়োজনে—অতএব শিকারের একজন দেবতা কল্পনা করে নিয়ে তাঁকে পবিতুষ্ট করার নানারকম রীতিও উদ্ভাবিত হল : গড়ে উঠল একটি আদিম পার্বণ। কালের বিবর্তনে এক সময়ে শিকার করাটা জীবিকার্জনের মাধ্যম রূপে আর রইল না তাঁদের প্র-সন্ততিদের কাছে। হয়ত সেইসব উত্তরকালীন বংশাবতংসরা কৃষির ওপর নির্ভর করে নিজেদের অর্থনীতি গড়ে তুলেছিলেন; কিন্তু তাঁদের তদানীন্তন পূজো-পার্বণ যদিও কৃষি-শস্য ইত্যাদির দেবতাকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হতো, তবুও পূর্ব পিতামহদের শিকারকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা ধর্ম, সংস্কার এবং আচারের অভিক্ষেপণ সেইসব উত্তর কালের পূজা-পরব ইত্যাদির মধ্যে পড়তই অনিবার্যভাবে। আরও পরবর্তী সময়ে সমাজ এবং অর্থনীতি

যখন আরও বেশি উন্নত হল, তখন আবার পূর্ববর্তী ঐ দুই স্তরেরই প্রভাবশেষ সে সময়কার পাল-পরব-দেবকল্পনা প্রভৃতির মধ্যে অবলীন হয়ে থাকল।

একটু উদাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে এখানে আলোচনার সুবিধের জন্যে: শিকারের দেবতা যাতে তুষ্ট হন, সেই কারণে (ধরুন) প্রথম যে জন্তুটিকে বধ করলেন গুহাবাসী প্রত্নপিতামহরা, সেটি সেই অনির্দেশ্য দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করলেন তাঁরা 'ঘুষ' হিশেবেই হয়ত বা! পরবর্তী সময়ে যখন অর্থনীতির নিয়ন্তা শিকার নয়—কৃষি, তখন কৃষির দেবতাকে খুশি করার জন্যেও কিন্তু একটা যুবতীর মুণ্ডু হয়ত হাতেই ছিঁড়ে তার রক্ত-ধড় এবং ঐ মুণ্ডুটি ছড়িয়ে দেওয়া হল চাষের ক্ষেতে—যাতে কৃষিদেবতা ভাল ফসল দেন সেই ভেট পেয়ে। অর্থাৎ, পরব, দেবতা এবং উপলক্ষ বহিরঙ্গে পাল্টে গেলেও, তাদের সকলেরই অবলীন কাঠামোটি পরিবর্তিত নূতন সমাজ এবং অর্থনীতির পর্যায়েও মোটামুটি একই থাকছে তাহলে!.....পূজো পরবের উৎস বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি হল এইটিই, এই বিবর্তনের ধারাটিকে অন্বেষণ করতে পারাটাই।

॥ ৩ ॥

কতকগুলি বিশেষ সংস্কার আদিকাল থেকেই মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বরহস্যের নানান্ কিছুর সুসঙ্গত ব্যাখ্যা না করতে পারার মতো সুবিকশিত বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে না ওঠায়। উত্তরকালে বুদ্ধিবৃত্তিগুলি সমুন্নত হয়ে উঠলেও, প্রপিতামহদের উত্তরাধিকার হিশেবে ঐ আদিম সংস্কারগুলির শিকড় থেকেই যায় মানুষের মনের জটিল, আরণ্যক গহনে।

জাদুতে, অলৌকিক ক্ষমতায়, দৈবীসত্তায় এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বাস হল পূজো এবং পার্বণের অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তি। এইগুলিকে উপলক্ষ করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বজনীনভাবে কতকগুলি ধর্মধারা বা কাল্ট। এক একটি পরব হল এই রকম একটি কাল্টের (বা, একাধিক কাল্টের সমন্বয়ের) লব্ধফল। গাছ, ফুল, পাতা, অরণ্য, নদী, পাহাড়, পাথর, ঢেলা, আকাশ, বাতাস, জল, আগুন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি নিসর্গের নানান্ বস্তুর মধ্যে দৈবী-বা-অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে তাদেরকে মাহাত্ম্যময় এবং ভাল-বা-মন্দ করার 'জাদু'-শক্তিসম্পন্ন বলে মনে করা হয়েছে। এরাই হয়েছে দেবতা, এদের নিয়েই শুরু হয়েছে ধর্মাচার; আর তার থেকেই বিবর্তিত হয়েছে পরব-পার্বণ।

আবার আত্মা, প্রেত ইত্যাদির অনির্দেশ্য অথচ বস্তুময় অস্তিত্ব কল্পনা

করা শুরু হয়েছিল ঐ সব নৈসর্গিক দেবতাদের উপলক্ষে তৈরী পুজো পার্বণের মতোই। পশু-পাখি-সরীসৃপ প্রভৃতিকে পূর্বপুরুষ রূপে কল্পনা করে তাদের নিয়ে উৎসব-পার্বণ করাও প্রচলিত। কোনো কিছুর একটা বস্তু প্রতীকে বা প্রতীকী আচরণের মাধ্যমে এই সমস্ত দেবতার আরাধনা করাও সুপ্রচলিত।

এই সব কাল্‌টের মূল ধারা কয়েকটিই : মাতৃকা-উপাসনা, উর্বরতা-তন্ত্র, যৌন-প্রতীকোপাসনা এবং পূর্বপুরুষের স্মৃতিপূজা। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি আবার পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সন্তান এবং শস্য, এ-দুয়েরই যখন প্রয়োজন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, তখন ঐ দুইকে নিয়ে কাল্‌ট যে গড়ে উঠবে, তাতে আব সংশয় কি? আবার এ দুয়ের ক্রমবিবর্তনের ফল-শ্রুতিই হল যৌন-প্রতীক পূজা। ক্ষুধা নিবৃত্তি (অতএব শস্য) নিরাপত্তার আশা (দলেব সংখ্যা বৃদ্ধি চাই, অতএব সন্তান) এবং যৌনাবেগ পরিতৃপ্তি (সুতরাং যৌন-প্রতীককে দেবতাকল্প ভাবা)—এই তিন মৌলিক জৈব-প্রবণতা বা 'বেসিক আর্জ'-এব লব্ধফল হল প্রাসঙ্গিক কাল্‌টগুলি। আব পশুপূজা, প্রেতপূজা প্রভৃতি হচ্ছে 'ভয়' নামক বেসিক আর্জেব ফলশ্রুতি। অতএব গড়ে উঠেছে 'টোটেম' বা কুলপ্রতীকী পশুর (ক্বচিৎ ফল, ফুল) কল্পনা এবং এই সবের উপলক্ষে যা সব বিধিনিষেধ তৈবী হয়ে উঠেছে ধর্মবিশ্বাস সম্পৃক্ত হয়ে, তারা পরিণতি পেয়েছে 'ট্যাবু'-তে।

অর্থাৎ আত্মা, টোটেম, ট্যাবু ইত্যাদির উপচারসহ পূজো-পরবগুলি ক্রম-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে-চলতে এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। পার্বণের মূল উদ্দেশ্য যদি সংশ্লিষ্ট যে-বিশেষ দেবতাকে কল্পনা করা হয়েছে তার তুষ্টি সাধনই হয়, তাহলে পার্বণ-সংক্রান্ত উপচার এবং প্রথাগুলি ঐ টোটেম-ট্যাবু জাতীয় সংস্কারসমূহের অন্তর্লীন অলৌকিক শক্তি তথা জাদুবিশ্বাসেরই পরি-পোষণ করে এটাও বুঝতে হবে। জড় বস্তুর মধ্যে সত্তার অস্তিত্ব (যার রূপটি কল্পিত হয়েছিল মানুষেরই আদলে) আছে ভেবে নেওয়া থেকেই যে দেবতার উদ্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত। দেবতা যখন 'মানুষ'-এর মতোই —তখন তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ সবই থাকবে অবশ্যই! সুতরাং, ঐ সব জৈব প্রবণতার চাহিদা মিটিয়ে দিলেই দেবতা খুশি হবেন এবং যৌথভাবে গোষ্ঠীর উপকার করবেন সেই 'সেবা'র প্রতিদানে—এই মানসিকতা থেকেই পূজোর উৎসরণ, বিকাশ ও বিবর্তন এবং গোষ্ঠীগতভাবে তার যে আনুষ্ঠানিক পালন, সেটিই হল পার্বণ।

॥ ৪ ॥

আদিম কাল থেকে 'সভ্য' আমল অবধি বিবর্তিত হতে-হতে আসার পথে এই সমস্ত পূজা-পার্বণগুলি সময়ের বহুবিচিত্র পলি সঞ্চয় করেছে। পূজা-অর্চনার বিকাশের প্রতিটি স্তরেই সেই পলিকে খুঁজে পাওয়া যায় সন্ধিৎসু চোখে অন্বেষণ করলে। ধরুন, এক-একটা প্রাকৃতিক ঘটনার কথাই : হেমন্তের শেষে গাছের পাতা খসে যাচ্ছে, কিংবা বর্ষার মেঘে ঢাকা সূর্যকে কদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কিংবা অমাবস্যার রাত্রে চাঁদ একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, অথবা প্রবল খরায় নদী-ডোবা-বিল শুকিয়ে গেল, কি বন্যা, দাবানল, ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির মতো বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—এমন সমস্ত সময় এসব 'দুর্বিপাক' কাটানোর জন্য প্রত্যেক ব্যাপারটির পিছনেই মানুষের আদলে-গড়া বা পশুর চেহারায় কি মানুষ-পশুর সংমিশ্রিত রূপে কল্পিত এক-একটি দেব-তার অস্তিত্ব চিন্তা করে তাদের উদ্দেশে বিশেষ-বিশেষ সময়ে বিশেষ-বিশেষ ধরণের পূজা-উপাসনার রীতি চালু করলেন প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতামহেরা। এই সব বিশেষ সময়ে বিশেষ পূজা উপলক্ষে গোষ্ঠীগতভাবে কি সর্বজনীন ভাবে যে সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করা হত তাই ছিল প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন পার্বণ।

এখন, পূজো-আচ্চা করলেও এই সব দুর্বিপাকের প্রতিবিধান যা-হবার তা হবে আপনা থেকেই ; না করলেও তাই-ই হবে, কেন না সেটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। হেমন্তে যে পাতা ঝরা শুরু হবে, অনিবার্যভাবেই বসন্তের গোড়ায় আবার তার বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু করবেন প্রকৃতি ঠাকুরাণী—নতুন পাতা গাছে-গাছে আবার জন্মাতে শুরু করবে। মাঝখান থেকে পত্রদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত একটি পার্বণ তৈরী হয়ে গেল। ওঝা, পুরোহিত, জাদুকর-প্রমুখ আদিম সমাজের মূল নিয়ন্তারা জানতেন অন্যদের চিন্তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং তার ওপর ভরসা করেই নিশ্চিন্তে দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের ব্যাপারটা সকলকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলতেও পারতেন! এর পর যখন কৃষির আবির্ভাবের পরিণতিতে শ্রেণীসমাজ গড়ে উঠল, তখন ঐ 'যোগাযোগ' থাকার অনুরূপ-মাহাত্ম্য কিছু পরিমাণে গিয়ে বর্তাল উঁচুতলার হুজুরদের ওপরে ; তাঁরা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের সংরক্ষণে নানাবিধ শাস্ত্র তৈরী করতে লাগলেন, যাদের অন্তর্কাঠামো লোকায়ত উৎসজাত হলেও, বহির্কাঠামো ওপরতলার

নিজস্ব প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে সৃষ্ট। সংস্কৃতি-বিবর্তনের সমস্ত ক্ষেত্রেই যে-অবিচ্ছিন্ন চক্রপ্রবাহ সর্বদাই সক্রিয় থাকে, এই ক্ষেত্রেও তারই অমোঘ এবং অনিবার্য নিয়মে ঐ 'শাস্ত্র'-বিধান কিছু পরিমাণে লোকায়ত পূজা-পার্বণ, দেবতা-ইত্যাদির ওপরে এসে পড়ে।

বাংলার বহুল-প্রচলিত পূজো-পরব আর সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত দেব-দেবীদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছে। ধর্মের এবং ধর্মাচারের বিকাশে সমাজমানসের দ্বান্দ্বিক ভূমিকার প্রতিভাস সেখানেও অবশ্যই মেলে। আদিম কালের বিভিন্ন পর্যায়ে নানান অনিরসিত সংশয়ের সূত্রে যে-সব দেবতা এবং অনুষ্ঠানের মুখপাত হয়েছিল, আদিম থেকে প্রাচীন যুগ—সেখান থেকে মধ্যযুগ—ফের সেখান থেকে একাল অবধি তারা ঐ দ্বান্দ্বিক বিকাশের অবিরল চক্রধারায় বাহিত হয়ে বর্তমান রূপগুলিতে এসে পৌঁছেছে। 'বন্য', 'বর্বর' প্রভৃতি মর্গ্যান-নির্দেশিত বিভিন্ন কালপর্যায়ের স্মৃতিকে নিজেদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে, গর্ডন-চাইল্ড-উল্লেখিত 'সভ্য' পর্যায়েরও নানান্ উপস্তরকে ( কৃষি-বিপ্লব, নগর-বিপ্লব প্রভৃতি ) কম-বেশি প্রতিফলিত করেই এই ব্রত-পার্বণ-পূজো-উৎসবগুলির সামগ্রিক বিকাশ ঘটেছে। একটা কথা এখানে একটু বলে রাখা দরকার : চলে-যাওয়া সময়ের ছাপ যেমন এদের মধ্যে থেকে যাচ্ছে, তেমনই পরবর্তীকালে যে-সমস্ত সামাজিক বিকাশ ঘটবে ও ঘটছে—তাদের ছাপও এদের মধ্যে অবশ্যই পড়বে। যে-পার্বণ সমাজের কাছে তার ব্যবহারিক প্রয়োজনকে ফুরিয়ে ফেলবে, আপনা-আপনিই তার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা বাইরের রূপটি আমূল বদ্‌লে যাবে। এই বইয়ের বিশ্লেষণগুলি তাই শেষতম কথা নয়, এটুকু মুখপাতেই নিবেদন করে রাখা গেল সবিনয়ে।

## দুই ॥ দেবতা ও ধর্মের বিকাশে সমাজের ভূমিকা

ধর্মের উৎপত্তি যে বহুবিচিত্র ভাবেই হোক না কেন, পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই তার বিকাশ হয়েছে একই ছকে, মূলত সংশ্লিষ্ট সামাজিক কাঠামোকে অবলম্বন করেই। উত্তরকালে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ যখন গড়ে উঠেছে, তখন সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা গোষ্ঠী অবশ্য নিজেদের স্বার্থেই ধর্মকে সমাজের প্রকৃত নিয়ামক বলে প্রচার করে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। বলা হয়েছে, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান, যা-নাকি সমস্ত সমাজ-আয়তনকেই 'ধরে রাখে'; আর সেই জন্যই না কি তার নাম ( অন্তত সংস্কৃত ভাষায় ) ধর্ম !

অথচ সভ্যতার ইতিহাস ঠিক এক বিপরীত সাক্ষ্যই দেবে। যখন যেখানে যেমন ভাবে সমাজের কাঠামো গড়ে উঠেছে, তখন সেখানে ধর্মের ভিতর এবং বাইরের ধারণাগুলিও গড়ে তোলা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। কায়েমী শ্রেণীস্বার্থের অবিরল প্রচারে ধর্মচেতনার ওপরে যে দৈব-মহিমাই আরোপ করা হোক না কেন, মূলত ধর্মের বিকাশ ঘটেছে একেবারে গোড়ায় অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ও ইন্দ্রজাল বা জাদুবিদ্যায় অন্ধ প্রত্যয় থেকে. আর পরবর্তী সময়ে সমাজপতিদের শ্রেণীগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচ্ছন্ন সূত্র রূপে।

মন্তব্যটা একটু বিস্তৃতভাবে বিচার করা যেতে পারে। প্রাচীনতম সমাজ ছিল মূলত মাতৃকেন্দ্রিত; বিধিবদ্ধ সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক তখনও মানুষ তৈরী করতে শেখেনি বলে একমাত্র মাতৃ-পরিচয়ই ছিল সে সময়ে সুনির্দিষ্ট এবং পিতৃ-পরিচয়ের অনিশ্চিতির ফলে আদিমতম যে-সামাজিক ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, তার মূল রূপটা ছিল মাতৃকা-উপাসনা। প্রত্ন প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাতৃকা পূজা ব্যাপক ভাবেই প্রচলিত ছিল যে, তার অজস্র পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন গত এক শতাব্দীর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বের পরিভাষায় যাদের নাম 'ভেনাস'—সেই রকম নগ্নিকা নারীমূর্তি, যাদের মুখ চোখ পর্যন্ত ভালভাবে ( কিংবা আদৌ ) দেখানো হয়নি অথচ মাতৃত্ব-সূচক দেহলক্ষণগুলি ব্যাপক এবং সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত,—কমবেশি ২০,০০০ বছরেরও পুরোনো, বেশ কিছু সংখ্যায় খুঁজে পাওয়া গেছে নানান জায়গায়।

অথচ সমসাময়িক পর্যায়ের কোন পুরুষ মূর্তির হদিশ আদপেই মেলেনি। স্বভাবতই এর থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সেই পর্যায়ের সামাজিক এবং ধর্মীয় দুই কাঠামোই ছিল এক ছাঁচে ঢালা; সমাজ জীবনে মায়ের গুরুত্ব এবং ভূমিকা অপরিসীম ছিল বলেই, ধর্মীয় বিশ্বাসেও মাতৃ-দেবতাদের নিঃসপত্ন অধিকার অনুভাবিত হয়েছিল, মাতৃত্বলক্ষণ প্রকটিত 'ভেনাস' মূর্তিগুলি তারই সূচক ছাড়া আর কিছুই না।

এখনও অবধি যে সমস্ত সমাজে মায়ের প্রাধান্য টিঁকে আছে (যেমন ভারতবর্ষের নায়ার কি খাসিয়াদের মধ্যে), সেখানে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রটিও যেমন মূলত মায়ের হাতে (যথা, সম্পত্তি ও পদবীর অধিকার), তেমনি তাদের আচরিত ধর্ম-বিশ্বাসের মূল স্বরূপটিও মাতৃকা পূজা কেন্দ্রিত। মাতৃতন্ত্রপ্রধান আদিবাসীদের সমাজে এ জিনিসটি আরও স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে অবশ্যই একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে: বংশগত ও সম্পত্তিগত উত্তরাধিকার যেখানে মায়ের ধারাকে অনুসরণ করে, সেখানেও কিন্তু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত পুরুষদের যাতে; তবে সে পুরুষ মায়ের বংশের। পিতৃকেন্দ্রিক প্রতিবেশী সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাবেই যে এই ব্যাপার প্রচলিত হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা কি ভাবে প্রচলিত হয়েছে এবং কখন হয়েছে? আদিম মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ থেকে পিতৃকেন্দ্রিত সমাজের এই উদ্বর্তন কি সর্বত্রই সমান পদ্ধতিতে হয়েছে? না-কি বিভিন্ন জীবন যাপন পদ্ধতির পরিণতিতে পিতৃপ্রধান তথা পুরুষপ্রধান সমাজ এবং তার পিঠ-পিঠ পুরুষ দেবতা-প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি গড়ে উঠেছে?

দ্বিতীয় বিকল্পটির মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে। সমস্ত রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠানই গড়ে ওঠে খাদ্যের সংগ্রহ তথা উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের লব্ধফল হিসেবে। আদিম মানুষের ঐ সংগ্রহ-উৎপাদন কেন্দ্রীভূত ছিল ফলমূল জোগাড় এবং পশু শিকারের মধ্যে। স্বভাবতই, প্রকৃতি-প্রদত্ত শারীরিক বিন্যাসের কারণে ফলমূল সংগ্রহটা প্রধানত মেয়েদের কাজ ছিল, শিকারটা পুরুষের। খাদ্যের বৃহত্তর জোগানটা আসত যেহেতু শিকার থেকেই, সেইজন্য ধীরে ধীরে আপনিই পুরুষ প্রাধান্য সূচিত হতে শুরু করল।

ধর্মের কাঠামোতেও এই পরিবর্তনের ছায়াপাত ঘটল: মাতৃকা দেবতার পাশাপাশি একটি করে পুরুষ দেবতারও কল্পনা করতে লাগল আদিম

*মানুষ। এই মাতৃকাদেবীদের এবং তাঁদের পুরুষ সঙ্গীদের একটা সর্বজনীন* আদিম রূপ আছে :

"Everywhere she is unwed, but made the mother first of her companion by immaculate conception, and then of the gods and of all life by the embrace of her own son." (Encylopaedia of Religion & Ethics : Vol. I , p. 147) স্পষ্টতই, এই দেবকল্পনা আদিমতম সমাজের কোনো-ধরণের সিদ্ধ-নিষিদ্ধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগের যুগের কথা।

॥ ২ ॥

সংগ্রহকারী ও শিকারজীবী স্তর থেকে মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্বর্তন ঘটল পশুপালন এবং কৃষিকর্মের পর্যায়ে। যাযাবর গোষ্ঠী রূপেই নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ পালা শুরু করেছিল ১০,০০০ বছর আগে; কিন্তু হাজার দুই বছরের মধ্যেই যখন খাদ্যের উৎপাদন পদ্ধতি হিশেবে কৃষির আবিষ্কার করতে শিখল সে তখন থেকেই কৃষিকেন্দ্রিত অর্থনীতি গড়ে উঠল যে-সমস্ত সমাজে, তারা জানপদ জীবনেও হল প্রতিষ্ঠিত; আর যাদের অর্থনীতি গণ্ডীবদ্ধ থেকে গেল পশুচারণাতেই, তারা যাযাবর হয়েই জীবন যাপন করতে লাগল।

সমাজ-কাঠামোর এই পরিবর্তনটা ধর্মবিশ্বাসকেও বদলাতে শুরু করল। কৃষিকে অবলম্বন করে যে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হল, তার ধর্মধারায় আদিম মাতৃকা-তন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হল নূতন একটি কাল্‌ট : উর্বরতা-তন্ত্র। নারী এবং পৃথিবী এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সমার্থবোধক হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে শস্য-কামনা তথা শস্য-উৎপাদন ও সন্তান-কামনা-তথা-সন্তান-সৃজন সমধর্মী কাজ বলেই গণ্য হল। এর ফলে নানাবিধ যৌনাচারও ধর্মের নাম ধরে ব্যবহারিক জীবনে প্রচলিত হল, এবং তাতে খুশী হবার কারণ ঘটল সমাজের নিয়ন্তাদেরই। মনে রাখতে হবে যে কৃষির আবিষ্কারের পরিণতিতে আদিম সাম্যাশ্রিত সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে ততদিনে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিন্তা আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর কাজে কাজেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরও উৎপত্তি হয়েছে।

উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মচেতনা যেমন উৎপাদন-পদ্ধতি রূপে কৃষির প্রতিষ্ঠার লক্ষফল, ঠিক তেমনই এর ফলে দেবকল্পনার ক্ষেত্রেও খানিকটা হেরফের ঘটল।

*উদ্বৃত্ত ফসল যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা করে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, ঠিক সেই ছকেই দেব-কল্পনাতেও মুখ্য ও গৌণ দেবতা—এই রকম দুটি পৃথক শ্রেণী গড়ে ওঠে।* এইখান থেকেই দেবরাজ ( ইন্দ্র, জিউস প্রমুখ ) ও তার পরবর্তী পরিণতি হিসেবে এক ঈশ্বরের চিন্তা বিকশিত হল মানুষের মনে। সে কথায় পরে আসছি।

বিভিন্ন স্তর এবং শ্রেণীর দেবতাদের কল্পনা যে উত্তর পর্বে করা হয়েছিল, তার প্রমাণ ঋক্‌বেদের অর্বাচীন অংশের ( যথা ১০ম মণ্ডল ) কিছু-কিছু মন্ত্র। বৈদিক কবি প্রাচীন 'ব্রাত' অর্থাৎ দেবতাদের (মানুষেরও) যৌথ সংগঠনকে ফিরে পেতে চেয়েছেন এক জায়গায় আর আর এক জায়গায় "সমিতি সমানী"-র কামনা করেছেন। এর অর্থ প্রাচীনতর কালে যেমন দেবকুল ( এবং মানবকুলও, নিজেদের মধ্যে ) সমানমর্যাদা ও অধিকারসম্পন্ন ছিল, আবার যেন তাই হয়।

পশুচারণজীবী সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য বেশী থাকায়, তাদের দেবকল্পনাও সামগ্রিকভাবেই পুরুষ-প্রধান। পশুচারণজীবী বৈদিক আর্যভাষীদের আদি গ্রন্থ ঋক্‌বেদে তাই দুচার জন ছাড়া সবাই পুরুষদেবতা : ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, মিত্র, সোম, পূষণ-প্রমুখ। স্ত্রী-দেবতারা খুবই সেখানে অপ্রধান, ব্যতিক্রম শুধু উষা। তাও, তাঁকে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী-প্রমুখ পণ্ডিত পরবর্তী-কালের সংযোজন বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে ইনি ছিলেন সিন্ধু সভ্যতায় যে মহামাতৃকা দেবী উপাসিতা হতেন ( মনে রাখতে হবে সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক, তাই মাতৃকা দেবতার উপাসনা সেখানে বহমান ছিল উর্বরতা-কেন্দ্রিত ধর্মধারার মধ্যে; এর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া গেছে ), তিনিই। ইন্দ্র-কর্তৃক উষার ধর্ষণের যে বিবরণ ঋক্‌বেদের কোনো-কোনো সূক্তে দেখি, সেটা বিজয়ী আর্যভাষীদের হাতে পরাভূতা সিন্ধুবালাদের নির্যাতনেরই স্মৃতি বহন করেছে।

উর্বরতা-কেন্দ্রিত ধর্মধারায় মহামাতৃকার সহচর হিশেবে আর পুরুষদেবতা রইলেন না; কৃষি-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্ট হবার ফলশ্রুতিতে যে পুরুষের শাসন সূচিত হয়েছিল, তারই অনুষঙ্গ ধরে গ্রেট মাদারের পাশাপাশি গ্রেট ফাদারের চেতনাও সঞ্জাত হয়েছিল। সিন্ধু-সভ্যতাতেও আদি-শিবের প্রত্ননিদর্শ পাওয়া গেছে। যৌনাচার-ভিত্তিক ধর্মীয় উপকরণ বলেও কিছু-কিছু জিনিষ সনাক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারত সর্বত্রই ঐ পরমাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষের তত্ত্ব কোনো-না-কোনো ভাবে সৃষ্টি

হয়েছে: মিশরে আইসিস-ওসিরিস, মেসোপটেমিয়ায় তিয়ামত-অপ্‌সু, সিন্ধুতে শিব (?) ও উষা (?)। ব্যবহারিক জীবনে পুরুষের প্রাধান্য এবং ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিতে নারীর প্রাধান্য এ দুয়ের সমন্বয় ঘটল ঐভাবে ধর্মচিন্তার পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সাংখ্য শাখায় সেই তত্ত্বেরই পরিবৃদ্ধি ঘটেছে এবং উত্তরপর্বে হিন্দু ধর্ম আবির্ভূত হলে, সামগ্রিকভাবেই সাধনার ধারাটা যুগল-উপাসনামুখিন হয়ে যায়। এরই পরিণতিতে—শিব-শক্তি, বিষ্ণু (বা নারায়ণ)-লক্ষ্মী, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা—মায় গণেশ-কলা বৌ—অবধি ঐ একই ভাবনা প্রবহমান ছিল।

॥ ৩ ॥

ভারতবর্ষে (এবং অন্যত্রও) ব্যক্তিগত সম্পদের বিকাশ ঘটবার পর থেকে ধর্ম-চিন্তা এবং দেব-ভাবনায় আরও একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল: এক-ঈশ্বর-কেন্দ্রিক অধ্যাত্মবোধের প্রচার। সামাজিক দিক থেকে তখন "সমিতি সমানী" অতীতের বস্তু; পুরোনো সময়ের সাম্যাশ্রিত সমাজ তখন আর নেই; সৃষ্টি হয়েছে এক মুখ্য শাসক-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা। এরই অভিক্ষেপে, ধর্মবোধিতে এক-ঈশ্বরের সৃষ্টি। নরলোকে সেই ঈশ্বরের 'পবিত্র' প্রতিভূ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন ঐ মুখ্য শাসক: রাজা অথবা পুরোহিত। (এখনও, এই ১৯৮৪ সালেও সাধারণ জাপানীর পক্ষে জাপ-সম্রাটকে স্পর্শ করাও মহাপাতক)। সর্ব সাধনা ঈশ্বরে অর্পণ করো ভাবগত ক্ষেত্রে আর বস্তুগত ক্ষেত্রে করো রাজাকে: "বেদ (ঈশ্বরের আদেশ), ব্রাহ্মণ (ঈশ্বরের কাছে তোমার প্রার্থনা পৌছে দেবার পেশকার), রাজা (নরদেহে ঈশ্বরের প্রতিভূ) ছাড়া আর / কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার"—আর এর ব্যতিক্রম হলে' "এই ক'টি কথা জেনো মনে সার / ভুলিলে বিপদ হবে!" অতএব সামাজিক এবং ধর্মীয় দুই ক্ষেত্রেই " মামেকং শরণং ব্রজ।"

ভারতের সামাজিক ইতিহাসে বুদ্ধোত্তর কালে যে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য সর্ব-গ্রাসী হয়ে ওঠেছিল, তার বৃহত্তম উপকরণ ছিল ধর্মবিধি। বেদান্ত দর্শন বা উত্তর-মীমাংসার মায়াবাদ এবং গীতার নিষ্কাম কর্মসাধনা ধর্মের রং মাখিয়ে দর্শন ও অধ্যাত্মসাধনা বলে প্রচারিত হলেও, আদতে এরা ছিল সামাজিক শোষণ এবং পীড়নেরই হাতিয়ার। বর্ণাশ্রম-কেন্দ্রিত সমাজ-ব্যবস্থা মূলত বৃহত্তর জনসমাজকে শূদ্র (বা দাস)-ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করে তাঁদেরকে

পদানত করে রাখতে চেয়েছিল মুষ্টিমেয়ের শোষণকে চিরস্থায়ী করে রাখার স্বার্থে। ব্যাপারটাকে ধর্মের জিগির তুলে প্রচার করা সহজতর বলে, সমস্ত ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের বিধান রূপে প্রচারিত করা হল অতএব। অজ্ঞ অসহায় জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য গীতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে বলা হল তুমি শুধু কর্ম করে চলে যাও, ফলেব প্রত্যাশা কোর না—তাতেই তোমার মোক্ষ বা পরম মুক্তি। পারিশ্রমিকবিহীন শ্রমলাভের জন্য এর চেয়ে ধূর্ত আর কি তত্ত্ব থাকতে পারে! কাজে কাজেই সামাজিক শোষণ এবং বঞ্চনার স্বার্থই এখানে ধর্মচিন্তার মুখোশ পরে দাঁড়িয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

জগৎকে মায়া বলে প্রচার করাও ঐ শ্রেণী-স্বার্থরক্ষারই অঙ্গ: জগতের তাবৎ ব্যাপারটাই যখন মায়া, তখন তোমার ক্ষুধা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা—এ সবই মিথ্যা। আবার আমার ধন, প্রাচুর্য এবং সম্পদ—এও সমস্তই অসত্য, সত্যি শুধু ব্রহ্ম—তাঁর অনুধ্যান কর, মায়াপ্রপঞ্চময় জগতের সুখ-শোক, অস্তি-নাস্তি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামিও না; তাতে তোমার আত্মার মুক্তি হবে না। এই কুটিল সামাজিক-অভিপ্রায় ধর্মের নামে, অধ্যাত্মবোধের নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী এদেশেরই বৃহত্তর জনমানসকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

আদিম কালে মানুষ স্বভাবতই অজ্ঞ ছিল বলে, তারা সামাজিক বিধানকে ধর্ম বলে বিশ্বাস করত। ইতিহাসের পরিজ্ঞাত সময় যখন থেকে শুরু হল, তখন থেকে সামাজিক শ্রেণীস্তরের ওপরওলারা সেই স্তরভেদকে ধর্ম বলে প্রচার করতে শুরু করেন, আর সভ্যতার যত বিবর্তন ঘটতে লাগল, ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শোষণপদ্ধতির রূঢ়তাকে ঢাকা দেবার জন্য আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ মাখানো হতে লাগল। সমাজের শোষণভিত্তিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শুধু এ দেশেই নয়, সর্বদেশেই ধর্মকে পছন্দমতো মূর্তিতে তৈরী করেছে শাসক শক্তি। চার্চ এবং স্টেট-এর মধ্যেকার প্রাথমিক দ্বন্দ্ব পরবর্তী সময়ে বিলুপ্ত হয়ে, ও-দুই মিলে হরিহরাত্মা হয়ে গেছে: মধ্যযুগের ইউরোপের প্রতি দেশেই সবচেয়ে বড় জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল খৃষ্টীয় চার্চ। মানুষকে ভূমির দাসত্বে (সার্ফ্‌ডম) শৃঙ্খলিত রেখে শোষণভিত্তিক শ্রেণী-সমাজের কাঠামোকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল কার্ডিনালদের ধর্ম প্রচারের সৌধ। 'দেবত্র' সম্পত্তির জমিদারীর স্বরূপ আমাদের অজানা নয়!

পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরা মানব-মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য

সকলেই সামাজিক শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন : কিন্তু উত্তরকালে কায়েমী স্বার্থ এঁদের নাম ও বাণীকেই রূপান্তরিত করেছে শোষণের হাতিয়ারে। যে-সামাজিক অবিচারের উৎসে ছিল শ্রেণী-কেন্দ্রিত সমাজ-বিধান, তারই বৃহৎব্যাদিত বদন গিলে নিল মহাপুরুষদের মানবমুক্তির বাণী। কায়েমী স্বার্থ রূপান্তবিত কবে দিল সেই মহামানবদের স্বয়ং ঈশ্বর বা তাঁর অবতার রূপে !

॥ ৪ ॥

শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি যতটা সুস্পষ্ট, লৌকিক পাল-পার্বণের পরিসরে অবশ্য ততখানি নয়। বিশেষত, শাস্ত্রীয় ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, লৌকিক ধর্মাচারের মৌলিক চরিত্র তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। শাস্ত্রীয় ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে যে-চূড়ান্ত রূপটি এদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার মূল কথা বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদের মধ্যে নিবিষ্ট : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। পক্ষান্তরে, লৌকিক ধর্মের মূল কথাটি হল—ভারতচন্দ্রের ভাষায়—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" সুতরাং, লোক-জীবনের আদি উৎস থেকে স্ফুরিত হলেও, শাস্ত্রীয় ধর্ম এবং তার আচার-বিধি এবং লোকায়ত ধর্মের আচাব-বিধান একে অন্যের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক-সম্পর্কে আবদ্ধ।

আগে বলেছি, পালা-পার্বণগুলির মধ্যে শাস্ত্র এবং লোকবিধি দুয়েরই অন-বচ্ছিন্ন ধারা বহমান। সুতরাং, এই অনুষ্ঠানগুলি তা হলে কি স্ব-বিরোধী বলেই প্রতীত হবে ?·· এই প্রশ্নের যথার্থ জবাবের মধ্যেই পাল-পরবগুলির সঠিক চরিত্রকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

একথা ঠিকই যে "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি"—জাতীয় প্রার্থনা শাস্ত্র-ধর্মে অপ্রতুল নয়। কিন্তু আদিকালে যেমন ঐ প্রার্থনা সকলের জন্যেই উন্মুক্ত ছিল—সমগ্র গোষ্ঠী অথবা কোমের জন্যেই, শ্রেণী সমাজের বিবর্তনে সেটা সীমাবদ্ধ হয়ে এল শুধুমাত্র ওপরতলার সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে। কর্মফলবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদির তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করে বৃহত্তর জনসমাজকে বোঝানো হল, অন্তত বোঝাতে চাওয়া হল যে, সবই অনিত্য—তোমার এই দুঃখকষ্টও মায়া বা মিথ্যা, আবার আমার এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা দেখছ তাও মায়া ! তাছাড়া, তোমার এই কষ্ট, দুঃখ—এ হল তোমার জন্মান্তরের পাপের

কর্মফল, আবার আমার সুখও কর্মফল, তবে পূর্বজন্মের সুকৃতির! এ কথা ওপরে বলেছি।

স্বভাবতই, জনসমাজ এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনা। সুতরাং, একদিকে যেমন বৈদান্তিক ভাবধারা সর্বপ্লাবী হয়ে উঠতে চাইল, অন্যদিকে ঠিক তেমনভাবেই লোকায়তিক দর্শনের অনুগামীরা বাঁচবার, সুখী হবার, তৃপ্ত হবার মানসিকতাকে অব্যাহত রাখলেন। অতএব বজায় রইল পালা-পার্বণের চিরাচরিত অনুষ্ঠানগুলিও। শাস্ত্রাচারের অভিক্ষেপণ যা ঘটল তা ওপর-ওপর, এগুলি মূল চরিত্রটি রইল অপরিবর্তিতই।

এ জিনিষটা কিভাবে ঘটে, তার একটি নিদর্শন দেখানো জরুরি হয়ে উঠছে অতঃপর। ধরুন, হোলিজাতীয় লৌকিক একটি উৎসবের কথাই। এটি যে ঋতুচক্রের আবর্তনের ফলে বনে-অরণ্যে-গৃহাঙ্গনে নূতন ফুল-ফল-পত্র-মুকুলের আবির্ভাবকে উপলক্ষ করে সৃষ্ট হওয়া আদিম একটি আনন্দোৎসব, তাতে সন্দেহ নেই। এই উপলক্ষে আদিকালেব আরণ্যক সমাজে যে অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হতো নরনারীকে যথেচ্ছভাবে মেলামেশা করতে, তার ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই ঐ ঋতু-উৎসব এবং মদনোৎসব সমার্থক হযে গিয়েছিল। নরনারীর অবাধ মিলনসঞ্জাত 'জাদু'-র প্রভাব প্রকৃতিকেও উর্বরা করবে এই ছিল বিশ্বাস। কালক্রমে যখন শাস্ত্রধর্ম প্রবল হয়ে উঠল তখন ঐ উৎসবের ওপর রাধা, কৃষ্ণ, গোপিনী, বৃন্দাবন লীলা, বসন্তরাস-ইত্যাদি ভাবনা আরোপ করা হল, অর্থাৎ, সমাজেব উঁচু সোপানের ধ্যানধারণার সংযোজন ঘটল পুরাতন প্রথাটির (যাকে শাবরোৎসব বলা হয়েছে) উপর।

এখন বৃন্দাবন লীলা সেরে কৃষ্ণের মথুবায় যাবার আগেব এই দোল লীলার আধ্যাত্মিক এক তাৎপর্যও নির্দেশ করেছেন শাস্ত্রব্যাখ্যাতারা: এ নাকি মায়াময় ঐহিক সুখময় জগতের প্রতীক; এই ইহলোকের মায়ালীলা সেরে কৃষ্ণের মথুরা-রূপ অনন্তধামে যাবার প্রাক্কালে যে অনুষ্ঠান হয় তাই হল হোলি!

অর্থাৎ মূল উপলক্ষটির সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পার্বণটির একটা ব্যাখ্যান করা হল। কিন্তু জনসমাজ রাধা-কৃষ্ণ-গোপিনী-ইত্যাদি অনুভাবনা মেনে নিলেও, ঐ 'বৈদান্তিক' চরিত্রের ব্যাখ্যানটিকে গ্রহণ করল না, ফলে শেষ হিসেবে লোকবিশ্বাসেরই জিৎ হল, তত্ত্বভাবনার নয়।

প্রশ্ন এটাই যে, শক্তিমান্ ওপরতলার শ্রেণীসমাজ তাদের এই 'পরাভব'-কে মেনে নিল কেন? তারা ত নিশ্চয় পারত অজাতশত্রু রাজার মতো করমান

দিয়ে—এই-এই ধর্মাচার পালন করা চলবে, আর এই-এই চলবে না, এমন বিধান জারী করতে। তা কি তারা করেনি?…অবশ্যই করেছে। কিন্তু এটাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম যে, বৃহত্তর জনজীবনের অগণ্য মানুষ যাকে অন্তরের জিনিষ বলে গণ্য করে, পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বলে ভাবে, তার মধ্যে যতই সংস্কারাচ্ছন্নতা থাকুক না কেন, যতই অন্ধবিশ্বাস এবং পশ্চাৎমুখিনতা থাকুক না কেন, ফতোয়া জারি করে বা চোখ রাঙিয়ে সে জিনিষকে ভোলানো যায় না। চোখ রাঙানো এবং ফতোয়া জারি করা যে কতদূর ব্যর্থ হয় ইতিহাস বারংবার তার প্রমাণ দিয়েছে—রোম সম্রাটের নির্দেশে যীশাসের আরাধনা নিষিদ্ধ হলে, মেরীর কোলে-বসা যীশাসের মূর্তিকে নিজেদের ধর্মপ্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম আমলের খ্রীষ্টানরা শুধু শাসক শক্তির চোখে ধুলো দিতেই। প্রচলিত আইসিসের কোলে-বসা হোরাসের মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই মেরী-যীশাসের ঐ মূর্তি কল্পনা করলেন তাঁরা। 'প্রভু যীশাস আমাদের রক্ষা করুন' এই কথা প্রকাশ্যে বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেলে তাঁরা যত্রতত্র মাছের রেখাচিত্র এঁকে রাখতেন। পুরাতন রোমান সংস্কৃতির ঐতিহ্যে উর্বরতা-দ্যোতক হিসেবে মাছের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল—এই সামাজিক অবস্থাটিকে তাঁরা সুন্দরভাবে কাজে লাগালেন। মাছ—যার লাতিন নাম ইক্‌থাস—আঁকার অন্তর্নিহিত মানসিকতাটি কি ছিল?…ইক্‌থাস শব্দের প্রতিটি অক্ষরকে এমন কতকগুলি শব্দের প্রথম অক্ষর হিসেবে প্রথমযুগের খ্রীস্টানরা গ্রহণ করলেন, যাদের পর-পর সাজিয়ে গেলে নাকি ঐ 'প্রভু যীশাস আমাদের রক্ষা করুন' এই কথাটি গড়ে উঠে!

সবদেশে, সর্বকালেই অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে—ঘটেছে আমাদের পালা-পার্বণ, ধর্ম, দেবতার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। ওপরতলার 'হুজুরেরা' অনেক চেষ্টাই করেছেন নিজেদের প্রয়োজনকে বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে, লোকসমাজের 'মজুরেরা' নিজেদের ঐতিহ্যাগত প্রত্যয়কে ঠিক বজায় রেখেই গেছেন কিন্তু! আরণ্যক বৃক্ষপূজার পার্বণ অক্ষুণ্ণই থেকেছে ভিতরের কাঠামোর, বহিরঙ্গে শুধু বৈদিক ইন্দ্রপূজার প্রলেপটুকু মাখিয়ে নিয়ে তাকে করা হয়েছে ইঁদ পরব; প্রাগৈতিহাসিক কালের নগ্নিকা মূর্তির উপাসনার বাইরের ব্যাখ্যাটুকুর পরিবর্তন করে তাকে নিরাবরণা কালিকামূর্তি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; স্মরণাতীত কালের যৌন-প্রতীক আরাধনার পুনর্বিন্যাস ঘটেছে শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ট অর্চনায়।

সমাজের বিবর্তনের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক গতি আছে, তারই লব্ধফল রূপে এই

সব সমন্বয়-বা-সংশ্লেষণ এসেছে বিজ্ঞানের অমোঘ অনুশাসনে। এই সব রূপান্তরিত-হওয়া দেবতা এবং পার্বণগুলিও চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছয় নি কিন্তু, একথা বলা দরকার। আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার শুভফল যতই সমাজের সর্বপর্যায়ে উপলব্ধ হবে, বহমান এই সব সংস্কারগুলিও ততই ক্ষীয়মান হবে। যথা-অর্থে-প্রগতিমুখিনতা যখন সমাজ-মানসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তখনই ঘটবে সামগ্রিক রূপান্তর।

ওপরতলা যে নিচের তলাব কাছে হেবে গেছে এবং সেই হাবকে মোটামুটি ভাবে মেনে নিয়েছে শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে, আমাদেব সামাজিক ইতিহাসে তারও একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, সমাজপিতাবা এটা বুঝেছেন যে, বৃহত্তব আমজনতা যদি অন্ধ সংস্কারের ফাঁসে জড়িযে থাকে, তাতে ওপর-তলাব লাভ বৈ লোকসান নেই! দ্বিতীয় কথা, একবার বৌদ্ধ ধর্ম এবং আর একবার ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে অভ্যুদিত হয়ে হিন্দু ধর্মেব প্রতিস্পর্ধী শক্তিরূপে যেভাবে মাথা তুলে ছিল, তাতে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-লালিত, স্মৃতিব অনুশাসিত হিন্দু সমাজ যথেষ্টই কাহিল হয়েছে। শঙ্করাচার্য, কুমাবিল ভট্ট প্রমুখেব মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয় ঘটলে, বৌদ্ধ ধর্মকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হলেও, ইস্‌লামের ক্ষেত্রে তা ঘটতে পাবেনি—তাই তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের দল ভাবী রাখার স্বার্থে এতাবৎ 'হীন' বলে, 'অন্ত্যজ' বলে ধিকৃতদের কিছুটা ধর্মাচারকে মেনে নেওয়া হল উদারতার জন্যে নয়, আত্মরক্ষাব স্বার্থেই!

## তিন ॥ মাতৃকা-উপাসনা : ইতিহাস ও প্রাক্-ইতিহাস

সমাজবিজ্ঞানের গবেষক যাঁরা, প্রায়শই তাঁদের মধ্যে মতের মিল যে ঘটে না, এটাই আমরা সচরাচর আমরা দেখে থাকি। তবু, তার মধ্যেই ক্বচিৎ-কখনো দু-একটি ক্ষেত্রে তাঁরা একমতও হন। মানুষের সংস্কৃতিতে মাতৃদেবতার চেতনা ও প্রভাবের গুরুত্ব সেই ধরনের একটি দুর্লভ ক্ষেত্র। দৃষ্টিকোণ যেমনই হোক-না-কেন, সর্বমতালম্বী সমাজতত্ত্ববিদ্‌ই এ ব্যাপারে একমত যে, সব দেশে, সমস্ত সংস্কৃতিতেই মাতৃকাদেবীদের ভূমিকা, অন্য সমস্ত ধরনের কাল্‌ট বা ধর্মাচরণ-কেন্দ্রিত সংস্কৃতির চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ। সেই আদিমকাল থেকেই এই মাতৃকাদেবীদের কল্পনা করেছে মানুষ, বিভিন্ন যুগপর্যায়ে তার সামান্য কিছু হেরফের হয়েছে অপেক্ষিকভাবে, কিন্তু বহিরঙ্গতে অদল-বদল সত্ত্বেও, ঐ চিন্তার মূলগত কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে, এখনকার পৃথিবীতে অগ্রসরচিন্তার শবিক বলে দাবী রাখে যে সমস্ত সমাজ, ঐ আদিম-ভাবনা তাদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে সুপ্রবলভাবে।

এখনি বলেছি যে, পৃথিবীর সমস্ত আদিম সমাজেই ধর্ম চেতনার ধারাটা বেশিরভাগ সময়ে বিবর্তিত হয়েছে এক মহা-মাতৃকা-সত্তাকে কেন্দ্র করে। যদি প্রশ্ন করেন, ঠিক কবে, কখন, কোথায় এবং কেন এই মাতৃকাসত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করতে শুরু করেছিল মানুষ, তাহলে প্রথম তিনটির জবাবে নিরুত্তর থাকতেই হবে; আর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে চতুর্থটির ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র। প্রথম তিন প্রশ্নের প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু বলা যায় যে, অতি আদিমকাল থেকেই সভ্যতার সূত্রপাতেরও আগে, আমাদের প্রবুদ্ধ-প্রপিতামহবর্গ প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই ঐ মাতৃকা-কাল্‌টকে বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীনতম যে সব প্রাসঙ্গিক-প্রত্ন-নিদর্শ পাওয়া গেছে তার থেকে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে নব্যপ্রস্তর যুগ শুরু হবে ঢের আগেই, প্রত্ন প্রস্তর যুগের মধ্য কিংবা শেষ পর্বের গোড়ার দিকে মানুষের মানসলোকে মাতৃকা-সত্তার প্রতিষ্ঠা ও আরাধনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কেন? এইখান থেকেই বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যে ফাটল ধরল। একদল বলেন, মূলত কৃষিকার্য আবিষ্কৃত হবার পরে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মচেতনার

বিকাশ ঘটল যখন তখন থেকেই ধরিত্রীকে জননীরূপা গণ্য করে ধরিত্রীমাতা তথা—বসুমাতা—তথা—মহামাতৃকাদেবীর আরাধনা-উপাসনা-ভিত্তিক কাল্‌টের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি হয়। অন্যপক্ষে, এঁদের এই বিশ্লেষণকে পরবর্তীকালের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য করলেও, প্রাক্-কৃষি-পর্যায়ের প্রত্ন প্রস্তরযুগে মাতৃকা উপাসনার যে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার ব্যাখ্যান সবাই মানেন না। এমনটি করার পিছনে যুক্তিও রয়েছে। প্রত্ন প্রস্তরকালের ছোট-ছোট যে সমস্ত আদিম ভাস্কর্যের নিদর্শ পেয়েছি, তাদের সব কটিই কৃষির আবিষ্কারের বহু হাজার বছর আগের শিল্পীদের সৃষ্টি। এই মূর্তিগুলি আদিম মানুষের মাতৃকা-তান্ত্রিক-চেতনার লব্ধফল যে, সে বিষয়ে কোনো সংশয়েরই অবকাশ নেই। অবয়বগতভাবে অন্যান্য সব কিছুর সুস্থিত বিন্যাসের পরিবর্তে, মূর্তিগুলির স্ত্রী-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমনভাবেই প্রকটিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি মূর্তিকেই যে গর্ভবতী-জননী হিসেবে তৈরী করা হয়েছে এ থেকেই ঐ কথার সমর্থনে যুক্তি মিলবে।

এই সমস্ত মাতৃকামূর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় যাদের নাম 'ভেনাস', নির্মিত হয়েছিল কমবেশি ২০,০০০ বছর আগে ত বটেই : অর্থাৎ, প্রত্ন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে ; শেষ তুষারাচ্ছন্ন পর্বের মধ্যলগ্নে অন্তত পক্ষে। অস্ট্রিয়ার ভিলেণ্ডর্ফে পাওয়া ভেনাস, ফ্রান্সের ল্যাসেলে পাওয়া ভেনাস এবং ইতালীর সাভিন্যানোতে আবিষ্কৃত ভেনাস—মাত্র এই তিনটি নিদর্শের মধ্যেই শুধু প্রত্ন প্রস্তর যুগের মাতৃতান্ত্রিকতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে, এমন নয় ; এ ধরনের অজস্র মূর্তি মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, দক্ষিণ পশ্চিম সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র উত্তর, উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে মাতৃকা-তন্ত্রের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই ঘটেছিল ; অত প্রাচীন প্রত্ন-নিদর্শ সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে ( অথবা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খোঁজা হয়নি ; যেমন এ দেশে ), কিন্তু পরবর্তীকালীন ধর্মচেতনার বিকাশ, লোকপুরাণের বিবর্তন এবং লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা ইত্যাদি বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখলে সে প্রসঙ্গে সন্দেহ থাকে না একটুও।

কিন্তু মূল প্রশ্নটি এখনো অনুত্তরিত : কেন পৃথিবী জুড়ে এই মাতৃকা-কেন্দ্রিক কাল্‌ট প্রাক্-ঐতিহাসিক আদিম কাল থেকেই উদ্ভূত, বিকশিত এবং বিস্তৃত হল ? কৃষি এবং উর্বরতা-সাধনার পত্তন হবার বহু হাজার বছর আগেই কোন্ অনিবার্য কারণে আদিম মানুষ মাতৃকা-উপাসক হয়ে উঠল ?

আদিম মানুষের সামাজিক সংগঠনে স্বাভাবিকভাবেই মায়ের স্থান এবং

অধিকার যে অত্যন্তই বেশি ছিল, এ কথা সমাজবিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছেন। যখন নির্দিষ্ট দাম্পত্য-সম্পর্ক সামাজিক বিধি হয়ে ওঠেনি, তখন গোষ্ঠীতে নবজাত সন্তানের পিতৃ-পরিচয় ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সে রকম নয়: পিতা কে, অনিশ্চিত হলেও, প্রকৃতি-নির্ধারিত বিধানে মাতৃ-পরিচয় সন্তান জন্মের আগেই সকলের জানা হয়ে যায়। ফলত, এই সামাজিক পরিবেশে মায়ের স্থান এবং ভূমিকা দুই-ই ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকেই গড়ে উঠেছিল আদিম মানুষের মাতৃকা-কাল্‌ট; গর্ভবতী নারীমূর্তি এবং তাদের মধ্যে জন্মসম্পৃক্ত-ও-মাতৃত্বসূচক প্রত্যঙ্গগুলির প্রকটতা সেই কাল্‌টেরই শৈল্পিক প্রকাশ।

আদিম কালের শিকারজীবী-ও-খাদ্যসংগ্রহকারী মানব সমাজে মায়ের এই যে ভূমিকা ছিল, সেটা অপরিবর্তিত রইল কৃষি আবিষ্কারের পর কিছুটা পর্ব অবধিও। কৃষির উদ্ভবের পাশাপাশি পশুপালন ও পশুচারণও বিবর্তিত হয়ে এসেছে সভ্যতার ইতিহাসে। এর আগের স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের (মাতৃত্ব ছাড়া) কোনো অস্তিত্ব ছিল না মানুষের সমাজে; কিন্তু কৃষি ও পশুচারণা/পালনের স্তরে এসে ও-দুয়েররই আবির্ভাব ঘটল। কৃষির সঙ্গে উর্বরতার ব্যাপারটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকায় ধরিত্রীকেও মাতৃকাতন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হল এবং শস্য-সংক্রান্ত উর্বরতা ও সন্তানকেন্দ্রিক উর্বরতার চেতনা দুটি প্রাচীন মানুষের (তখন সে আদিমতার স্তর পেরিয়ে চলে এসেছে) কাছে সমার্থক হয়ে উঠল। কিন্তু কৃষি, যা নারীরই আবিষ্কার বলেই সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন, যে-সব সমাজের প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল, সেখানে পূর্বতন মাতৃকাতন্ত্রের প্রাধান্য প্রাথমিক পর্যায়ে অক্ষুণ্ণ থাকলেও, পশুপালন ও চারণা যে-সব সমাজে প্রধান উপজীবিকা হল তারা ছিল স্বভাবতই যাযাবর, কৃষিজীবীদের মতো জনপদবাসী নয়, আর তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা হয়ে উঠল পুরুষপ্রধান। এরই ফলশ্রুতি হল সে-সব সমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে মাতৃকা-প্রাধান্যের বদলে পিতৃদেবতাদের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়া। কালক্রমে কৃষিজীবী এবং পশুজীবী এ-দুই উৎপাদন ব্যবস্থার অনুগামীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে যখন সমন্বয় বা সহাবস্থান ঘটল, তখন দুই সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি, দেবকল্পনা ইত্যাদির মধ্যেও একটা বিনিময় ও সহযোগ সম্ভব হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর সম্পর্ক-সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ঘটে একদিকে যেমন শ্রেণীবিভক্ত-

সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হল, অন্যদিকে পুরুষপ্রাধান্যময় সমাজের ভাবধারার প্রভাবে স্ত্রীপ্রাধান্য-নির্ভর সমাজের ভাবধারারও রূপ বদল হল। মাতৃকাতন্ত্র-নির্ভর সংস্কৃতির সঙ্গে পিতৃদেবতা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতিরও সংযোগ ঘটল অনিবার্যভাবেই। ফলে, সমাজের ব্যবহারিক জীবনে পুরুষপ্রাধান্য বাড়ল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই; ভাবগত জীবনে মাতৃকাদেবতার স্থান বজায় রইল, অথচ তার পাশাপাশি পিতৃ-দেবতার কল্পনাও ঠাঁই করে নিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্তর্গত স্ববিরোধিতাই এই পরস্পর-বিপ্রতীপ অবস্থার উদ্ভব ঘটাল সন্দেহ নেই।

ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের এই চেতনাস্তরটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার এখানে। সামাজিক জীবনে পুরুষের ভূমিকা তখন মুখ্যতর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা সম্পর্কের চেতনা প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে পিতৃ-পরিচয়ের ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়েছে। এর সঙ্গে সম্পত্তির ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারগত বিষয়গুলিও জড়িত বলে এই স্তর থেকে সতীত্ব, সাধ্বীত্ব ইত্যাদির বিধানগুলিও সাব্যস্ত হয়েছে। একদিকে কৃষিকেন্দ্রিক উর্বরতা কাল্ট, অন্যদিকে পুরানো মাতৃক-তন্ত্রের অনু-বর্তন—এই দুয়ের সঙ্গে ঐ সামাজিক অবস্থাটি সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া গেল। নারীকে দেবীত্বের আসনে অধ্যাত্মগতভাবে বসিয়ে রাখলে, তার চেতনায় সতীত্ব, পবিত্রতা ইত্যাদির বোধকে সুপ্রোথিত করে দেওয়াটুকু অনেক সহজ হয়। এতে পুরুষের স্বামীত্বের অধিকার এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার দুই-ই নিরাপদ। সমাজের শাসন ব্যবস্থা পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, মাতৃকা দেবতার গুরুত্ব ভাবজগতে অব্যাহত থেকে গেল অতএব।

॥ ২ ॥

মাতৃকাদেবীর পাশাপাশি পিতৃদেবতার কল্পনা করেছে প্রাচীন মানুষ, এ কথা একটু আগে বলেছি। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই (প্রাচীন মিশর ছাড়া) মাতৃকাদেবী ধরিত্রীর সঙ্গে সমার্থক বলে গণ্য হলেন, আকাশ হলেন পিতৃদেবতা (শুধু প্রাচীন মিশরে ব্যাপারটা ছিল ঠিক বিপরীত)। এই "ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে" বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হল—এমন একটি ধারণাই সমস্ত মানব জগতের অধ্যাত্মলোকে গড়ে উঠেছে। সমস্ত দেশের, সব সমাজের লোক-পুরাণই এ কথার সমর্থনে সাক্ষ্য দেবে।

এই বসুমাতা বা মহামাতৃকা দেবী অবশ্য এক এক দেশে এক এক নামে

অভিহিতা হন। কখনো 'উম্মু' (মেসোপটেমিয়া), কখনো 'ঋআ' (গ্রীস) কখনো বা 'সিবীলী' (রাম), কখনো 'নের্থাস' (জার্মাণী) কোথাও আবার 'ৎলাল্লি' ইলাল্লি' (মেক্সিকো), কোথাও 'ভূদেবী' (ভারতবর্ষ)। যে নামেই এঁরা উল্লেখিত হয়ে থাকুন না কেন প্রাচীন কালে, সর্বত্রই এঁদের রূপ ও কর্মবিধি মোটামুটি একই ধরনের : এঁরা একই সঙ্গে শস্য এবং সন্তান উৎপাদনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অর্থাৎ কৃষির উদ্ভবের পরবর্তীকালে মাতৃকা কাল্‌ট এবং উর্বরতা কাল্‌ট সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে। এর ফলে, এই পর্যায় থেকে শস্য উৎপাদন-সম্পৃক্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং মাতৃকাতন্ত্র-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানগুলি সমন্বিত হতে আরম্ভ করল।

এই কথার চমৎকার সমর্থন মেলে মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া একটি দু-পিঠে খোদাই সীলমোহর থেকে, যেখানে শস্যক্ষেত্রের ওপর এক নগ্নিকা নারীকে বলিদানের উদ্যোগ করা হচ্ছে এমন একটি দৃশ্য একদিকে চিত্রিত হয়েছে, অন্যদিকে আঁকা হয়েছে সেই শস্যক্ষেত্রের ওপরে বিস্ফারিত-চরণ অবস্থায় শায়িতা এক নারীর জরায়ু থেকে উদ্গত একটি চারাগাছ। আদিমতর অবস্থায় মানুষ যেভাবে বৃক্ষাত্মার কল্পনা করে বৃক্ষোপাসনা করত, এর মধ্যে সেই চেতনাও প্রবাহমান। নারীবলি দিয়ে তার রক্তে শস্যক্ষেত্র সিক্ত করলে ফসল ভাল হবে এই জাদুবিশ্বাসেরও খোঁজ মিলছে এর মধ্যে।

দেবীকে বৃক্ষের সঙ্গে একাত্ম বলে গণ্য করে পূজা করারও নিদর্শন সিন্ধুর আর একটি মোহরে দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরকালে হিন্দু সংস্কৃতিতে মহামাতৃকা তথা মহামায়া তথা দেবী দুর্গাকে যে 'শাকম্ভরী' বলা হয়, সম্ভবত এই হল তার আদি উৎস। পৌরাণিক দুর্গার বোধনে যে 'নবপত্রিকা' (কলাগাছে কচু, মান, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক এবং ধান একত্র বেঁধে) প্রতিষ্ঠা ও পূজা করা হয়, সেও ঐ উর্বরতার দ্যোতনা সূচিত করতেই। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু লৌকিক সংস্কারে কলা এবং ধান উর্বরতার সূচক; অন্যান্য জিনিষগুলিরও প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য কিছু কঠিনবোধ্য নয়। দুর্গার আবাহন মন্ত্রে "শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার" সঙ্গে দেবীকে সমীভূত এই জন্যেই করা হয়েছে।

মাতৃকাতন্ত্রের সঙ্গে বৃক্ষোপাসনার সমন্বয়ের মতোই পশুপূজার সম্মিলনও উত্তর-কৃষি পর্যায়ে ঘটতে দেখা যায়। প্রাচীন মিশরে শিশু জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন এক গর্ভবতী হিপোপটেমাস, 'ট্-আউরেট্'। আমাদের লোকবিশ্বাসেও সন্তান-জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'ষষ্ঠী'র বাহন বিড়ালও বহুক্ষেত্রে নানা

রকম তোয়াজ (যা অর্ঘ্য দানেরই নামান্তর ছাড়া আর কিছু না!) পেয়ে থাকে। সাপের সঙ্গে উর্বরতার সম্পর্কও ব্যাপকভাবে প্রচারিত।

আদিম বৃক্ষপূজা, পশুপূজা এবং মাতৃকাতন্ত্র একত্র হয়েছিল বিবিধ প্রকারে জাদুবিশ্বাসনির্ভর চিন্তার ফলশ্রুতিতে। পরবর্তী সময়ে শস্য-উৎসব এবং নানা ধরনের যৌনাচারও একার্থক হয়ে ওঠে ঐ জাদুবিশ্বাসের কারণেই। নারীর মাতৃত্বসূচক বিশেষ-বিশেষ শারীরিক অবস্থা ও অবয়ব-সংস্থানও ঐ একইভাবে উপাসনা-বস্তু এবং পূজা-বিধিরূপে গণ্য হতে থাকে তখন থেকেই।

বস্তুতপক্ষে ভারতীয় তন্ত্রতত্ত্বের মূলও এর মধ্যেই নিহিত। সে কথায় পরে আসব। মাতৃত্ব-সূচক দৈহিক সংস্থান এবং অবস্থাগুলিকে পূজার উপলক্ষ করে তোলার নমুনা হিসেবে কয়েকটি কথার আলোচনা তার আগে সেরে নেওয়া দরকার।

মানুষ যবে থেকে প্রাণীর জন্মরহস্যের কার্যকারণ কি-কি অনুধাবন করতে শিখল, তখন থেকেই নারীর (এবং পুরুষেরও) জন্ম-সম্পর্কিত আবয়বিক বৈশিষ্ট্য-গুলি তার কাছে এক অসীম রহস্য এবং শক্তির উৎস হিসেবে গণ্য হতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির যথাযথ কিংবা প্রতীকী প্রতিরূপগুলিও তার কাছে জাদুশক্তির আধাররূপে পূজা-উপাসনার উপজীব্য হয়ে ওঠে। এইখান থেকে মাতৃকাতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা অপরিবর্তিত থাকলেও, আচার-বিধিগত রূপান্তরণ ঘটল। স্ত্রী-চিহ্নের আরাধনার হদিশ অন্তত ৫০০০ বছর আগে থেকেই পাওয়া যায়। প্রত্ন প্রস্তর যুগের শেষদিকের (+২০,০০০ বছর) 'ভেনাস' মূর্তিগুলিতে স্ত্রী-চিহ্নগুলি প্রকট করে দেখানো হলেও, কৃষি-উদ্ভবকালে (নব্য প্রস্তরযুগে; +৮০০০ বছর আগে) শুধুমাত্র স্ত্রী-চিহ্নের প্রতীকগুলিই আলাদা করে তৈরী করার প্রবণতা দেখা দিল। খৃষ্টপূর্ব ৩য় সহস্রাব্দে মেসো-পটেমিয়া এবং সিন্ধু উপত্যকায় এ ধরনের নিছক স্ত্রী-চিহ্নদ্যোতক প্রত্নবস্তুর অজস্র সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু স্ত্রী-চিহ্ন কেন, পুরুষ-চিহ্নের প্রতীকও এই সময় থেকে বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা অর্জন করতে শুরু করে। ঋক্‌বেদে "শিশ্নদেবাঃ" 'দাস' /'দস্যু' জাতির উদ্দেশে বহু কটূ-কাটব্যই করা হয়েছে। গৌরীপট্ট সহ শিব-লিঙ্গের যে উপাসনা-বিধি উত্তরপূর্বে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, তার সূত্রপাতও এই থেকেই। এ প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা পরে।

স্ত্রী-চিহ্ন পূজার সবচেয়ে বিখ্যাত পীঠ হল কামরূপের কামাখ্যা দেবীর মন্দির। এখানকার দেবী পূজাবিধিও কিছু পরিমাণে নারীর যৌন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক।

নারীর প্রতি দ্বিপাক্ষিক সময়ান্তরে উর্বরতা বৃদ্ধির যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, এখানকার দেবীর সম্পর্কেও সেটি কল্পিত হয়। অনুরূপ কল্পনা পৃথিবী সম্বন্ধেও আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতিতে রয়েছে: আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী। দক্ষিণ ভারতে, বালিকা ঠিক প্রথম যখন কৈশোরে পদার্পণ করে রজোবতী হয়, তখন সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সামাজিক উৎসবও মাতৃকা-উপাসনার এই বিশেষ ধারার অঙ্গীভূত। প্রাক্-ঋতু বালিকাকে 'কুমারী' রূপে পূজা করাও ঐ চিন্তারই ভিন্নতার প্রকাশ।

স্ত্রী-চিহ্ন পূজা, রজোবন্দনা এবং জাদুবিশ্বাস এই তিন বিষয় সমন্বিত হয়েছে 'তন্ত্র' সাধনার মধ্যে। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে বহু আশ্রিত যৌনাচার। তান্ত্রিকমতের 'যন্ত্র প্রতিষ্ঠা' 'গৌরীগরণ' (গ্রহণ? করণ?), 'বিন্দু' সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয় যাঁরা বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে অনুধাবন করেছেন তাঁদের কাছে এ কিছু কঠিনবোধ্য কথা বলে গণ্য হবে না। তন্ত্রের 'ষট্‌চক্র' এবং 'পদ্ম' চিহ্ন প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী-প্রত্যঙ্গেরই সংকেত রেখা; পদ্ম-কেন্দ্রিত 'যন্ত্র'ও বস্তুতপক্ষে তাই-ই। তন্ত্র-সাধনার পথ বেয়ে যে মাতৃকা উপাসনার ধারা এদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, ভারতীয় দর্শনের বিস্মৃত প্রায় লোকায়তিক ধারাটি তারই প্রবাহে কখন মিশে গেছে তা কে জানে! ঠিক এই ভাবেই 'দ্যাবাপৃথিবী'র মিলন কল্পনার প্রাচীন বিশ্বাসই বিবর্তিত হয়েছে সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে। অর্থাৎ ধ্রুবপদী ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী এবং অধ্যাত্মবাদী দুই রকম চিন্তাধারাই বিকশিত হয়েছে মাতৃকা কাল্‌ট থেকে এ প্রসঙ্গে সেটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পরবর্তীকালে এই ধরনের সংকেতচিহ্ন মূল তাৎপর্য থেকে বহু সময়েই সরে যায় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আবার যথা অর্থেই ব্যঞ্জিত হয়। কোনো কোনো দুঃসাহসী সমাজবিজ্ঞানী 'পবিত্র' ক্রুশচিহ্নকেও এই রকম পরিবর্তিত তাৎপর্যময় বস্তু বলে গণ্য করেন। তাঁদের মতে হিন্দু বিশ্বাসে গৌরীচিহ্ন বিদীর্ণ-কারী শিবচিহ্নের তাৎপর্য যা, ক্রুশচিহ্নেরও আদি তাৎপর্যও তাই-ই ছিল, পরে খৃষ্টোত্তরকালে তার রূপান্তর ঘটেছে।

হতে পারে হয়ত বা; না-ও হতে পারে। কিন্তু আমাদের পদ্মচিহ্নের বিশিষ্ট তাৎপর্যের কোন রূপান্তর ঘটেনি। তন্ত্রের সাধনরীতিতে পদ্মচিহ্নের সঙ্গে পূর্ণঘট প্রতিষ্ঠার যে বিধি রয়েছে, সেটি বাঙালীর ঘরে ব্রতাচারেও পালিত হয়। ব্রতের আলপনায় পদ্মচিহ্নের বিশেষ তাৎপর্য হয়ত বাঙালীর ঘরের কন্যা-বধূরা নাও

জানতে পারেন ; কিন্তু পরিপূর্ণ মঙ্গলঘট যে কিসের দ্যোতনা বহন করে সে কি তাঁদের অজ্ঞাত ? গর্ভবতী নারীর প্রতীক রূপেই যে জলপূর্ণ মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা করা হয় তার গায়ে 'পুত্তলী' এঁকে এবং ওপরে সশীর্ষ ডাব ( সেও গর্ভবতী নারীর মধ্যদেশের সংকেতবাহী ) রেখে, এতো তাঁদের অজানা নয়। তাহলে বাঙ্গালী মেয়ের ব্রতাচারের মধ্যেও ত প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেই মাতৃকা উপাসনার ধারাটিই।

বহু লৌকিক দেবীই 'ঘট'রূপে পূজিতা হন। মঙ্গলচণ্ডী না হয় প্রত্যক্ষ ভাবেই মাতৃকা, কিন্তু সর্প-অধিষ্ঠাত্রী মনসাও ঘটরূপেই উপাসিত হন ব্যাপক-ভাবে। স্ফীতোদরা নারীর অবয়বরূপ স্ফীতমধ্যা ঘটরূপিণী এই সব লৌকিক দেবীও আসলে উর্বরাশক্তির প্রতীক। তাঁর পশুপ্রতীক 'সাপ' সেও ত আবার উর্বরতার ব্যঞ্জনাবাহী ( পৃথিবী বিদীর্ণ করে ভিতরে ঢুকে যায় বলেই কি ? ) সর্বদেশের লোকবিশ্বাসে। আসন্নসম্ভবা নারীকে নিয়ে স্ত্রী-আচারের মাধ্যমে সাধ ভক্ষণের- উৎসব পালনও ত সেই মাতৃকা-উপাসনারই আর এক অভিব্যক্তি নয় কি ?

॥ ৩ ॥

আগের অধ্যায়ে মাতৃকা-উপাসনাবিধির সঙ্গে যৌন আচারবিধি পালন করা এবং না-করার প্রসঙ্গটি দু-একবার উল্লেখ করেছি। মাতৃকাদেবী যখন উর্বরতা শক্তিব সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেলেন, তখন থেকেই তাঁর উপাসনার সঙ্গে যৌনাচরণ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই লোকপুরাণে দেখা যায় আদি মাতৃকা নিজ দেহ থেকে সৃষ্টি করলেন আদি পিতৃ-দেবতাকে, এবং তার পরে উভয়ে মিলে সৃষ্টি করলেন বিশ্বচরাচর। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রত্যন্ত থেকে সিন্ধুর পূর্বোপকূল অবধি বিভিন্ন মাতৃকা-দেবীর হদিশ পাওয়া পর্যন্ত যাঁদের স্বামী বা প্রেমিক তাঁদেরই আত্মজরূপে অনুভাবিত হয়েছেন লৌকিক পুরাণ-বৃত্তে। উত্তর আফ্রিকার 'তানিট', মিশরের 'আইসিস', মধ্যপ্রাচ্যের 'ইস্তার', এশিয়া মাইনরের ( এবং রোমেরও ) 'সিবীলী', গ্রীসের 'ঋআ' এবং ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের 'আদ্যাশক্তি' বা 'পরমা প্রকৃতি'—সর্বত্রই এই চেতনার উদ্বর্তন ঘটতে দেখি।

'ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের বিশ্বকোষে' এঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "সর্বত্রই তিনি অবিবাহিতা, কিন্তু অলৌকিকভাবে গর্ভবতী হয়ে তিনি তাঁর সহচরের জন্ম দেন,

যাঁর সহযোগে সর্বদেবতা ও সর্বজীবনেরও সৃষ্টি করেন তিনি।" (অনুবাদ, লেখকের; মূল উদ্ধৃতিটি আগের অধ্যায়ে আছে)। পরবর্তী সময়ে সমাজ জীবনে যখন যৌনকেন্দ্রিক নিষেধবিধি বা 'সেক্স-ট্যাবু' সুপ্রতিষ্ঠ হল, তখন থেকেই মাতৃকা দেবীর সঙ্গে পুত্র-তথা-স্বামীর সম্পর্কটাও পুরাবৃত্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তবে 'কুমারী মাতার অলৌকিক গর্ভসঞ্চার' ইত্যাদি ধারণা যে অপরিবর্তিত রইল তার প্রমাণ 'ভার্জিন মেরী'র কাহিনী। আদি মাতার দেহজাত পুত্র আর তাঁর সহচররূপে গণ্য হলেন না, পুত্র-রূপেই ক্রোড়ে আসীন রইলেন ঐ সামাজিক 'ট্যাবু'-কে মান্য করে। রোমের সমাজে এসে আইসিস-হোরাস, প্রাচীনতর মিশরীয় সমাজে প্রচলিত কাহিনী থেকে সরে এলেন। কালক্রমে খৃষ্টধর্ম রোমের রাজধর্ম রূপে পরিণতি লাভ করলে হোরাস ক্রোডে 'ম্যাগ্‌না মার্টা' আইসিস মিশে গেলেন যীশাস-ক্রোড়ে 'ম্যাডোনা' মেরীমাতার সঙ্গে। অনুরূপভাবেই আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীতেও গণেশ-ক্রোড়ে-পার্বতী, কৃষ্ণ-ক্রোড়ে-যশোদা ইত্যাদি কল্পনা উদ্ভাবিত হল। মাতৃকাতন্ত্রের সঙ্গে আদিমতর কালে যে সব যৌনাচার প্রচলিত ছিল, একমাত্র তান্ত্রিক মতের কোনো কোনো ধারার (বামাচারী, কুলাচারী) সাধনবিধি ছাড়া তাদের রূপান্তর ঘটে গেল। নারীর উর্বরাশক্তির সঙ্গে জাদুশক্তির ধারণা সমাহৃত হয়ে নানা ধরনের মেয়েলি আচার প্রচলিত হল বটে (যথা, উত্তরবঙ্গে প্রচলিত হুদুমদেও পূজা বা নগ্নিকারূপে বৃষ্টি-আবাহনের সংস্কার), কিন্তু মাতৃকা দেবীর উপাসনা উপলক্ষে প্রত্যক্ষ যৌনাচার পালন করার রীতি স্তিমিত হয়ে গেল। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ায় যেমন দেশাচার ছিল মাতৃকা মাইলিত্তা দেবীর মন্দিরে বসে সমস্ত নারীকেই অন্তত একবার গণিকাবৃত্তি পালন করতেই হবে, সে ধরনের সামাজিকভাবে বাধ্যতামূলক যৌনাচার কোনো দেশেই আর প্রচলমান থাকল না। ইসতার প্রমুখ মাতৃকাদেবীরা যে প্রাথমিক স্তরে কামদেবীরূপেও পরিগণ্যা ছিলেন, পরবর্তী সময়ে সে সবের আর চিহ্নমাত্রও রইল না।

প্রাচীন পৃথিবীর ধর্মধারা, কিছুটা পরিবর্তিত হলেও অন্তত অনেকটাও অব্যাহত রয়েছে একমাত্র বিশ্বের ইহুদী সমাজে এবং আমাদের দেশে। ভারতীয় হিন্দু এবং ভারতীয় পার্শী তাঁদের সুপ্রাচীন কালের ধর্মকে আজও বিশ্বস্তভাবে আঁকড়ে রেখেনে। পক্ষান্তরে, খৃষ্টধর্ম ও মুসলিমধর্ম এশিয়া বাদে বাকি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র থেকেই আদিম/প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে বিতাড়িত করেছে। ভাল বা মন্দের বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটাই ইতিহাসের সত্য।

মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সর্বত্রই এ দুই ধর্মের প্রতাপে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বিতাড়িত বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে। কাজে-কাজেই পুরোনো মাতৃকাতন্ত্রও এসব অঞ্চল থেকে মুছে গেছে, শুধুমাত্র সম্ভব-ক্ষেত্রে মেরীমাতার উপাসনা ছাড়া। এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তার মহাযানী শাখায় অবশ্য তন্ত্রপ্রভাবে সৃষ্ট কিছু কিছু দেবী রয়েছেন—যেমন বজ্রতারা, জাঙ্গুলীতারা প্রমুখ। কিন্তু যথা অর্থে মাতৃদেবতা তাঁরা নন। 'মণি' ও 'পদ্ম'-সমন্বিত মন্ত্র ইত্যাদিও মহাযানী বৌদ্ধধর্মের মাতৃকাবাদের ভাবানুষঙ্গবাহী। 'মণি' ও 'পদ্ম' একত্রে শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্টের সমার্থক। পক্ষান্তরে প্রাচীন চীনের তাও-বাদ এখন ইতিহাসের সামগ্রী ; তার সঙ্গে সম্পর্কিত তান্ত্রিকসাধনানুসৃত নানান রীতিও তাই বিলুপ্ত। ইহুদী ধর্ম, মুসলিম ধর্ম, জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম এবং থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম মূলতই নারীবিমুখ। জাপানের শিণ্টোধর্মেও নারীর মর্যাদা গৌণ। ভারতের জৈন ও শিখ ধর্ম দুটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

অতএব মাতৃকাতন্ত্র এখন বেঁচে আছে ধ্রুবপদী ধর্মগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মাত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ মহাযানী ধারার ভিতরে। আর আছে দুনিয়াজোড়া অজস্র-গোষ্ঠীর আদিবাসীদের মধ্যে। সভ্যতার অসমান অগ্রগতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অসমান বিকাশ ঘটিয়েছে। তাই বহু আদিম বিশ্বাস এখন বিশ্বের অসংখ্য আদিবাসী মানবের কাছে আজো নিটুট। মাতৃকাদেবীর পূজা আজো তাঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে ঠিক সেই কারণেই। মুসলিম ও খৃষ্টধর্মবলম্বী দুনিয়ায় নানা ধরনের লোকাচার, লোক উৎসবের মধ্যে আদিম মাতৃকাতন্ত্রের রেশ খুঁজে পান অবশ্য সমাজতত্ত্বের আগ্রহী ছাত্ররা, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলির আদি তাৎপর্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 'মে পোল' উৎসব, কি 'ইস্টার' (ইসতার ?) উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করা যায় প্রাসঙ্গিকভাবে।

কিন্তু মাতৃকা-তন্ত্র পূর্ণ মহিমায় বিরাজ করছে। আদিবাসী মানুষ বলে যাঁরা পরিচিত, সারা পৃথিবী জুড়ে নানান্ নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার গহন প্রত্যন্তগুলিতে সাদা মানুষের আক্রমণ এড়িয়ে বা সয়ে যাঁরা থাকতে পেরেছেন, সেই আমেরিণ্ডিয়ান বা রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কাগাবা, চামাকোকো, ইয়ারুরো, জিভারো, জুউনি প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বান্টু, জুলু প্রভৃতি প্রাচীন জাতির সেই সব গোষ্ঠীর মধ্যে, যাঁরা এখনো খৃষ্ট ধর্ম বা মুসলিম

ধর্ম গ্রহণ করেন নি, তাঁদের মধ্যে ; পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া এবং মাইক্রো-নেশিয়ার অজস্র নিগ্রোয়েড, মঙ্গোলয়েড এবং অস্ট্রালয়েড জাতিগুলির মধ্যে, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরী জাতির মধ্যে ; নিউগিনি-পাপুয়ার আদিবাসীদের মধ্যে, উত্তর সাইবেরিয়ার বিরলপ্রায় কোনো-কোনো এস্কিমো গোষ্ঠীর মধ্যে।

আর ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ঐ প্রাগৈতিহাসিক মাতৃকা-উপাসনার ধারা শুধু প্রবহমান নেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী সে ধারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্লীন মাতৃকা-তন্ত্রের বহুতোয়া স্রোতস্বিনীকে পরিপুষ্ট করে আসছে। এই আদিবাসীদের উপাস্য মাতৃকা-দেবীরা বহু সময়েই হিন্দু ধর্মের মণ্ডপে সমাসীনা হয়েছেন ; যেমন প্রাচীন দ্রাবিড় সর্পদেবী মনচাম্মা এবং বৃক্ষদেবী চেম্মুড়ু সমন্বিত হয়ে আর্য-প্রাধান্য-পরবর্তীকালে সৃষ্ট হিন্দু ধর্মের লোকায়ত ধারায় এসে এসে মনসা হয়েছেন। পরে তাঁর ওপরে একটা পৌরাণিক-প্রলেপ বুলিয়ে শিবের কন্যা বলে প্রচার করা হয়েছে। ওরাওঁদের গোধিকাসনা চান্দী এইভাবে পরিণতি লাভ করেছেন মঙ্গলচণ্ডীতে ; মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিতা চণ্ডিকার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং নিগ্রোয়েড নৃ-গোষ্ঠীর উপাসিতা এই সব দেবী। নানা নামে অজস্র সংখ্যায় ছড়িয়ে রয়েছেন ভারতবর্ষের অরণ্য, পর্বতে। বুড়ুবুড়কি, ডোম্ব, গাডাবা, বিলি মাগ্‌গা, দারজি, গঙ্গাডিকারা, ওক্‌কলু, গোল্লা, হান্দি, হালিকার, ওক্‌কালিগা হেলেভা, হোলেইআ, ইড়িগা—অসংখ্য নামে।

এঁদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রভাবে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাতীত গ্রাম-দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। বিচিত্র ধরনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও মূলত এঁরা সর্বত্রই শিবপত্নীরূপে গণ্য হন, হিন্দু পুরাণের সংস্কার অনুযায়ী। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আদি মাতৃকার আত্মজ সহচর-রূপে যে পিতৃশক্তির কল্পনা করা করা হত, 'শিব' হলেন তিনিই, সমাজবিজ্ঞানী এবং শক্তিতত্ত্বাভিজ্ঞ ধর্মিষ্ঠ মানুষ —উভয়েই এ ব্যাপারে একমত। 'শিব' আদিতে প্রাগার্য দেবতাই ছিলেন।) —চণ্ডী, দুর্গা, কালিকা প্রমুখ প্রধানা শক্তিদেবীদের পাশাপাশি এঁরাও হিন্দুধর্মের মাতৃকা-উপাসনার ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন। কখনো এঁরা বনবিবি, কখনো সর্বমঙ্গলা, কোথাও যোগাদ্যা, কোথাও বা কংকালী—প্রভৃতি নামে হিন্দু সমাজের লোকায়ত মাতৃকাতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখছেন।

মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ—সভ্যতার এই সুবিস্তীর্ণ জন্মভূমির সর্বত্রই যে মহামাতৃকা দেবীর উপাসনা হত নানা নামে, নানান্ প্রকরণে—যিনি

এখনও ভারতীয় উপ-মহাদেশে বহু নামে-রূপে পূজিতা হচ্ছেন দেখা গেল, আদিতে কোন্ নামে তিনি অভিহিতা হতেন এ দেশে ?

আইসিস বা ন্যুট, ইসতার কিং বা উম্মু, ব্যাইর্গো অথবা সিবিলী, ঋআ, কি ওপ্‌স,বেরেসিনথিয়া নয়ত ম্যাগনা মার্টা—বহু বিচিত্র নামে রূপে এই মহা-মাতৃকা দক্ষিণ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলে স্মরণাতীত-কালে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে দেখা দিয়েছিলেন এই দেবী কোন্ নামে ? অন্যান্য দেশের পুরাণবৃত্তে প্রচলিত কাহিনীমালা থেকে এঁর ঐসব বিবিধ নাম উদ্ধার করা গেছে। কিন্তু ভারতে ?

ভারতের পুরাণ কথায় মহামাতৃকার যে সব বিচিত্র রূপ ও নাম বর্ণিত হয়েছে, তা হল হিন্দু ধর্ম জন্ম নেবার পরের ব্যাপার। অথচ, মাতৃকাদেবীর হদিশ ও প্রাগার্য সিন্ধু সংস্কৃতির মহামাতাই কালক্রমে হিন্দু ধর্মের মহাশক্তি বা জগদম্বায় পরিণত হয়েছে এত নিশ্চিত। কিন্তু ঐ সিন্ধু-মাতৃকার নাম কি ?

অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন তাঁর বক্তব্যের মর্ম হল এই :

বৈদিক আর্যভাষীরা যাযাবর জাতি হিসেবে পুরুষ প্রধান সমাজের মানুষ ছিলেন আর তাই তাদের দেবকল্পনাতেও স্ত্রীদেবতারা গৌণ এবং সংখ্যায় নগণ্য। 'অদিতি' ও 'উষা' হলেন মূলত দুই স্ত্রী-দেবতা, যাদের উল্লেখ ঋক্‌বেদে বহুবার করা হয়েছে। এঁরা ছাড়া আর সমস্ত দেবতাই পুরুষদেবতার সহচরী মাত্র। অদিতিও আবার আদিত্যদের জননীরূপেই কথিতা। শুধু উষাই নব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আর্যভাষী বৈদিক সমাজের কাঠামোতে এই একমাত্র স্ত্রী-দেবতা, যিনি পুরুষ-দেবতাদের তুল্য মর্যাদার অধিকারিণী, কল্পিতা হন কেমন ভাবে ? কোশাম্বী বলছেন যে, এই 'উষা'ই হলেন সিন্ধু-সভ্যতায় উপাসিতা মাতৃকা-দেবী, আর সেই জন্যেই ঋগ্বেদের সূক্তে ইন্দ্র কর্তৃক তাঁর ধর্ষিতা হবার বিবরণ কল্পনা করেছেন বৈদিক কবি। পরাজিত সিন্ধু-নগরীর তরুণীকুলকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিল অবশ্যই বিজয়ী আর্য সৈন্যবাহিনী। সেই নির্মম ও করুণ ইতিহাসের রূপকই হল আর্য-নায়ক ও দেবপ্রধান ইন্দ্র কর্তৃক উষার লাঞ্ছনা। উত্তরকালে বৈদিক-দেবসংঘ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে গেলেন আর প্রধান হয়ে উঠলেন আর্যপূর্ব মাতৃ-দেবী উষা ও পিতৃ-দেব শিব। উষা রূপান্তরিতা হলেন জগন্মাতায়। কোশাম্বীর এ-বিশ্লেষণ অগ্রাহ্য করা যায় না।

## চার ॥ বাঙালীর সংস্কৃতির পূর্বসূত্র

আমাদের অনেকেরই একটি পূর্ব অভিমান আছে যে বাঙালীর সংস্কৃতি মূলত আর্য-ঐতিহ্যবাহী। নৃতত্ত্বগতভাবে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী আলপাইন্ গোষ্ঠী মানুষের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক নেই; যোগাযোগ যদি কোথাও থাকে, তা প্রধানত ঐ ভাষার ক্ষেত্রেই। পক্ষান্তরে, আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি, তাদের প্রায় সবই প্রাগার্য অস্ট্রালয়েড় বা অস্ট্রিক এবং ভেড্ডয়েড বা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর উৎস থেকে আগত।

কিন্তু থাক নৃতত্ত্ববিদ্যার বিতর্ক। সংস্কৃতির দিক থেকে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি কি, তার বিশ্লেষণের মধ্যেই এ অধ্যায়ে অভিপ্রায় সীমাবদ্ধ থাকুক বরঞ্চ। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার যে 'সংস্কৃতি' শব্দের তাৎপর্য কি? কি বোঝায় এ কথার দ্বারা?

এক কথায় এর উত্তর হয়না: বলতে পারি, জাতিবিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক আচার-ব্যবহার-সংস্কার-অভ্যাস-রীতি-নীতিবোধ প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যেই তার সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। এরই স্বাভাবিক অনুক্রমে খাদ্য-পরিধেয়-ধর্ম-বিশ্বাস-বিবাহ ও অন্যান্য উৎসববিধির নিজস্বতার (বা অন্য-স্বতন্ত্রতা) প্রসঙ্গগুলিও বিচার্য হয়ে ওঠে। তারপর ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সব শেষে সমাজের কাঠামো এবং তার অর্থনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারলে, তবেই সে জাতির সংস্কৃতির প্রকৃত সত্তাটিকে উপলব্ধি করা যায়।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার যে, কোনো জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত মেয়েদের নিজস্ব প্রথা-বিশ্বাস-আচার-সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে। নারী জাতির স্বভাবজ রক্ষণশীলতা এর বৃহত্তম কারণ; অন্য কারণটি হল তাঁদের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার ফলে ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করেন তাঁরা পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চরিত্রের স্বরূপ চিনতে হলে তাই বঙ্গললনাদের নিজস্ব আচার, সংস্কার, বিশ্বাসের সর্বোত্তম প্রকাশ যার মধ্যে ঘটেছে, সেই মেয়েলি ব্রতগুলির দিকে আগে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

'ব্রত' শব্দটির বয়স অনেক প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। একটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে "বেদদ্রোহী প্রাচ্য"-দেশীয়দের ব্রতধারী ওরফে ব্রাত্য বলে গণ্য করা হয়েছে। স্মরণযোগ্য, গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের প্রবল পরাক্রান্ত 'প্রাচ্য' ও 'গঙ্গাহৃদি' জাতির শৌর্যের খ্যাতি শুনে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার ফিরে গিয়েছিলেন রণে ভঙ্গ দিয়ে। পক্ষান্তরে মনুসংহিতায় দ্রাবিড়দের "ব্রাত্যক্ষত্রিয়" ওরফে ব্রতধারী ক্ষত্রিয় হিশেবে গণ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ, ব্রতর ব্যাপারটাই বৈদিক আর্য সভ্যতার অধীনতা যারা স্বীকার করতে চায়নি, তাদের, অর্থাৎ অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড়দের উৎসজাত। শুধু ব্রতই নয়, যে কোনো সামাজিক উৎসবে বাঙালী মহিলাদের অবশ্য ব্যবহার্য যে কটি বস্তু পান, চুন, সুপুরি, নারকেল, হলুদ, তেল, সিঁদুর এবং মাছ—সবগুলিই আদি-অস্ট্রিক জাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। ভাত এবং মাছ—বাঙালীর যা প্রধান খাদ্য, তারও উৎস ঐ একই। আজকে যাঁরা দ্রাবিড়ভাষী বলে পরিচিত, তাঁদের মধ্যে তণ্ডুলজাত খাদ্যের ব্যবহার বহুল-প্রচলিত হলেও, মাছের ব্যবহারটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অথচ প্রত্ন-দ্রাবিড় বা আদি-দ্রাবিড় বলে যাঁদেরকে ঐতিহাসিকদের বৃহত্তম অংশ স্বীকার করে নিয়েছেন, সেই সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে কিন্তু মাছ খাওয়ার অভ্যাস ছিল, তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ খুঁজে পাওয়া গেছে, এবং মনে রাখতে হবে, সিন্ধু সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর সংস্কৃতির একটা প্রবল সাযুজ্য খুঁজে পাওয়াও খুব কঠিন নয়। সে কথায় পরে আসছি।

শুধুমাত্র খাদ্যাভাস কিংবা আচার-ক্রিয়া ইত্যাদির মধ্যেই বাঙালীর অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার গণ্ডীবদ্ধ হয়ে নেই। স্থান-নামেও অস্ট্রিক প্রভাবটা প্রবল। 'বঙ্গ' নামটিই ত অস্ট্রিক : কোল শব্দ 'বোঙ্গা'-র অর্থ দেবতা সাঁওতালী ভাষায় এখনো সেই অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়। বোঙ্গা>বঙ্গ=দেব-ভূমি। সমস্ত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার ঢুঁড়েও 'বঙ্গ' শব্দের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না!

বাংলা শব্দভাণ্ডারের বৃহত্তম অংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখার অব-বাহিকায় গড়ে উঠলেও, অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ওরফে দেশী শব্দের পরিমাণ সেখানে খুব কম নয়। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বঙ্গদেশীয় এক অংশ 'আসুরী' ভাষা বলে :

"আসুরানাম্ ভবৎ বাচা
গৌড়পুণ্ড্রাদ্‌ভাবা সদা।"

মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখার নাম আসুরী। অর্থাৎ, সুপ্রাচীন 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে'র মধ্যেই বাংলা দেশে অস্ট্রিক-ভাষার প্রচলনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বাংলা ভাষার ১০% থেকে ১৫% ভাষা অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় উৎসজাত, এমন মনে করবার সঙ্গত ভাষাতাত্ত্বিক কারণ আছে।

"ডিঙ্গি চড়ে ঢোল বাজিয়ে
চিঙড়ি পেটে পুরে
তেঁতুল ছালের টোপর পরে
ডাগর ডোগর ঘোরে।"

কেবলমাত্র 'বাজিয়ে', 'পুরে' এবং 'ঘোরে' এই তিনটি ক্রিয়াপদ ছাড়া এ ছড়ায় আর একটি তৎসম বা সংস্কৃত-উৎসজাত শব্দ নেই।

বাঙালীর নিজস্ব বাক্‌রীতির মধ্যেও তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষণীয়। অনুকার-সহ জোড়া-শব্দের ব্যবহার, যেমন, 'মার-ধোর', 'জল-টল', 'কথা টথা'—এই ভঙ্গীটা এসেছে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবেই। বাঙালীর ঘরের 'খোকা-খুকু' যে আসলে দ্রাবিড ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, তা-কি সবাই জানেন! এমন কি, বাঙালীর অন্নোৎসব পৌষপার্বণ বা নবান্ন যে দ্রাবিড়-বলয়ের পোঙ্গল বা ওনমেরই স্বগোত্রীয় সেটাও ত মনে রাখতে হবে। আর্যভাষী বলয়ের অন্যত্র ত এরকম কোনো ব্যাপক অন্ন-পার্বণের হদিশ মেলে না!

॥ ২ ॥

হরাপ্পা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর কৃষ্টিগত যোগসূত্রের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সমস্ত প্রত্ন-নিদর্শ খুঁজে পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। সিন্ধুর সীলমোহরে পুতুলে মৃৎ-পাত্রে—যে সব ছবি এবং চিহ্ন ইত্যাদি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অনেকগুলির সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন ব্রতের আল্‌পনার বহু চিহ্নের হুবহু আনুরূপ্য দেখা যায়। এটা কি নেহাৎই আকস্মিক? মনে ত হয় না! লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আর দেবীমূর্তির চার-পাশের পদ্মবেড় এবং জোড়া মাছ এবং বসুধারা এবং আরো অজস্র এই রকমের চিহ্ন ব্রতে আল্‌পনায় যা আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি, তাদের অনেকগুলিই ঠিক

একই রকমের 'মোটিফে' সিন্ধুর প্রত্ননিদর্শনের গায়ে আঁকা কিংবা খোদাই আছে।

মিল শুধু ঐ-টুকুর মধ্যেই সীমায়িত নয়। বাংলার যে কোনো মেলায় এখনো যে চেহারাব মাটির বেনেপুতুল দেখতে পাওয়া যায়, একেবারে ঠিক সেই রকম চেহারার—যেন একই ছাঁচে ঢালা—পুতুল মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা, চন্হুদড়ো-প্রভৃতি স্থান থেকে অজস্র সংখ্যায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গায়ে মাটির গুলি লাগানো কলসী, ভূ-ভারতে দু-জায়গায় মাত্র পাওয়া গেছে : মহেঞ্জোদড়ো অঞ্চলে এবং অজয় নদীর তীরে, রাঢ় অঞ্চলে। এই দ্বিতীয় কলসীটি কলকাতায় আশুতোষ মিউজিয়মে আছে, সন্ধিৎসু পাঠক ম্যাক্কের 'ফার্দার এক্সক্যাভেশুনস অ্যাট মহেঞ্জোদড়ো' বইযেব দ্বিতীয় খণ্ডে বিধৃত অন্য কলসীটির ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

মিলিয়ে নেওয়া যায় আরো অনেক কিছু। বাঙালীর ঘরে যে দেশী কাঁকই একদা প্রচলিত ছিল, সেই বকমের চিরুণী এবং বিয়ের সময়ে যে কাঁসার দর্পণ বরেব হাতে থাকে, হুবহু সেই একই রকমের দর্পণ যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া গেছে বিভিন্ন সিন্ধুনগবীতে।

ফরাক্কায় এবং দামোদর, অজয় ও রূপনারায়ণের তীরে সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত উৎখনন হয়েছে, তার থেকে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে আদি বঙ্গসভ্যতার প্রত্ন-তত্ত্বগত একটা প্রবল মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষত, পুতুলের এবং মৃৎপাত্রের মিলটা অত্যন্ত বেশী। একই মোটিফের পুতুল এবং একই রঙের (লাল-কালো, তাম্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শ) খোলামকুচির মিলটা প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে কখনোই আকস্মিকরূপে গৃহীত হয় না। যেমন, সিন্ধুর মোহরগুলিতে যে একশৃঙ্গী ইউনিকর্ণ-কল্প বৃষ-মূর্তি আছে, তার সঙ্গে বাংলার পটচিত্রের অগ্নীশ্বর গণ্ডার নামে-কথিত একশৃঙ্গী বৃষের রৈখিক-অভিপ্রায়ের সাদৃশ্যটাও আকস্মিক বলে গণ্য হয় না। ঐ সব ইউনিকর্ণের পাশে যে আসাসোটার মতো দণ্ডচিহ্ন অঙ্কিত থাকতে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দিরের চূড়ায় তাকে খুঁজে পাবার জন্যে কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদের তৈরী-চোখ লাগে না!

প্রাগৈতিহাসিক হরাপ্পা-সংস্কৃতির উৎস থেকে বঙ্গ-সংস্কৃতির সম্ভাব্য উৎসারণ ঘটেছিল অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগে; সিন্ধু নগরীগুলির যখন পতন ঘটে তখন সেসব জায়গার ওপর তলার মানুষরা ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্বে এবং দক্ষিণে। পূর্বদিকে তারা যে বাংলাদেশ অবধি এসে পৌঁছেছিল, তার প্রমাণ হল এই সব প্রত্ননিদর্শগুলিই।

বাঙালীর সংস্কৃতির বৃহত্তম উপাদানই আহৃত হয়েছে তার ধর্মবিশ্বাস থেকে। শুধু মনস্কামনা-সিদ্ধিমূলক নানান্ ব্রতের মধ্যেই নয়, অন্যত্রও তার ধর্ম-বিশ্বাস এবং দেব-কল্পনার মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড প্রভাব সুপ্রবল। মাতৃকা দেবীর পূজা, শিব (আদিতে যিনি মহেঞ্জোদড়োবই দেবতা)-পূজা এবং উৎপাদন-ভিত্তিক ধর্মাচরণ (ফার্টিলিটি কাল্ট), পশুপূজা, বৃক্ষপূজা-ইত্যাদির বহু-নন্দিত ব্যাপার-গুলির উল্লেখ যদি না-ও করি, অন্যত্রও আদিম অস্ট্রিক ও দ্রাবিডদেব মতো 'টোটেম' ও 'ট্যাবু'-নির্ভরতাও আমাদের বিশিষ্ট চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের সংস্কৃতিরই অঙ্গস্বরূপ।

লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁদের আদিতেও প্রাগার্য সব জাতিগোষ্ঠীর দেব-কল্পনাই প্রেরণা রূপে সক্রিয়। মঙ্গলচণ্ডীর উৎসে ওরাওঁ দেবী চান্দী, মনসার আদিতে দ্রাবিড মনচাম্মা। গোধিকারোহিনী চান্দী টোটেম-ঐতিহ্য বহন করে এনেই পববর্তীকালে আয-অধিকারে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডিকার সঙ্গে মিলে গেছেন। মনচাম্মা একই সঙ্গে সর্পটোটেম এবং বৃক্ষটোটেম। চেম্মুড়ু গাছ, মনসাসিজ গাছ, কেতকা ওরফে কেয়া গাছ, পদ্মবন ইত্যাদি অনেক কিছুই মনসার সঙ্গে যুক্ত, যা বৃক্ষ-টোটেম হিশেবেই গণ্য। চ্যাংমুড়ী, মনসা, কেতকা এবং পদ্ম—মনসার চারটি নাম এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

তৃতীয় প্রধান মঙ্গল দেবতা ধর্ম—একই সঙ্গে শিব, যম, বুদ্ধ এবং সূর্যের সমন্বিত রূপ। শিব এবং সূয আদিতে ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও, এঁব মধ্যে আসলে প্রধান অস্ট্রো-দ্রাবিড প্রভাব যা, তা হল এব প্রতীকরূপে কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডের ব্যবহার—যা একই সঙ্গে পশুটোটেম এবং আদিম প্রস্তরপূজাব সূত্রবাহী।

উৎসাহ নিয়ে কাজ করলে বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে প্রাগার্য জাতি কোম-গুলির প্রেরণার পরিমাণ কতখানি ব্যাপক তার আরো নিদর্শন অবশ্যই মিলবে। বাঙালীর যথার্থ ইতিহাস লিখতে গেলে সেই কাজ করাটুকু অনিবার্য দায়িত্ব।

॥ দ্বিতীয় পর্যায় ॥

# "বারো মাসে তেরো পার্বণ"

"শয়ন উত্থান পাশমোড়া
তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
দুই ছেলের জন্মতিথি
অষ্টমী নবমী দুটি।
খ্যাপার চোদ্দ খেপীর আট
এই নিয়ে কাল কাট।"

—পাল-পার্বণ সম্পর্কিত প্রচালত প্রবচন।

শয়ন ( আষাঢ়ের শুক্লা ), একাদশী উত্থান ( কার্তিকের শুক্লা ), একাদশী, পার্শ্ব ( ভাদ্রের শুক্লা ) একাদশী, ভৈমী ( মাঘের শুক্লা ) একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি এবং মহাষ্টমী—এই আটটি তিথির প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখিত হয়েছে ; নৈষ্ঠিক হিন্দুদের কাছে এগুলি অবশ্য-পালনীয় বলে গণ্য।

## পাঁচ ॥ ব্রতকথার ইতিকথা

বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে 'ব্রত' এবং 'ব্রাত্য' নামে দুটি শব্দ মাঝে মাঝেই ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে ; অর্থাৎ সে আজ থেকে প্রায় হাজার তিনেক বছর আগে। একটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে "বেদদ্রোহী প্রাচ্য"-দেশীয়দের ব্রতধারী ওরফে 'ব্রাত্য' বলে গণ্য করা হয়েছে। আবার মনুসংহিতার মতে দক্ষিণী তথা দ্রাবিড়দের নিন্দামন্দ করার পক্ষে ব্রাত্যক্ষত্রিয় অর্থাৎ ভ্রষ্টক্ষত্রিয় ছিল খুব বাঞ্ছিত একটি বিশেষণ।

বোঝাই যাচ্ছে যে, ব্রত নামে ব্যাপারটি যারা বৈদিক আর্য সভ্যতার বলয়ের বহির্ভূত ছিল এবং প্রাচ্যদেশীয় অস্ট্রিক এবং দক্ষিণদেশীয় দ্রাবিড়দের মধ্যেই ছিল তার প্রচলন। ঠিক এই কারণেই ব্রতধারীরা আর্যভাষী বৈদিক সভ্যতার বাহকদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন, কেননা প্রাগার্য ভারতীয় যাঁরা—প্রত্ন-অস্ট্রিক ও প্রত্ন-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বংশধরদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা ঐতিহাসিক কারণেই মধুর ছিল না।

পরবর্তীকালে 'অন্যব্রত' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে অবশ্য নানা ক্ষেত্রে। এই ব্যবহারের পেছনে একটা ইতিহাসের সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই শব্দ সৃষ্টির সমকালে ব্রত-জাতীয় ব্যাপারে আর্যভাষী বৈদিকদের সঙ্গে প্রাচীনতর জাতিকোমগুলির মিশ্রণ বেশ ভালোভাবেই ঘটে গেছে দীর্ঘ সময়ের পথ অতিক্রম করে, ফলে একদা ব্রাত্যদের আচার-বিশ্বাস-ইত্যাদিও এ মহলে অনেকখানিই ঠাঁই করে নিতে পেরেছে। তাই ঐসব আচার-বিশ্বাস অর্থাৎ ব্রত ইত্যাদির যেসব প্রকরণ সমাজের ওপরতলায় ঠাঁই পেয়েছিল সেগুলি বাদে আর সবই ছিল অন্যব্রত-ধারীদের আচার-বিশ্বাস।

কিন্তু ঐ মিশ্রণটা কেমন করে ঘটেছিল? ব্রতের মূল ধারাটির বাহক কারা, সেটি বিশ্লেষণ করলে কিন্তু তার উত্তর মিলবে। ব্রত পালন করেন মূলত মেয়েরাই এবং এটা তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে ঐতিহ্য হিশেবে পেয়েছেন তাঁদের প্রত্ন-ইতিহাসকালের প্রাচীন পিতামহীদের কাছ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। ঋক্ সূক্তের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যুক্তিশীল বিশ্লেষক মাত্রেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন অবশ্যই যে, বহিরাগত আর্যভাষীরা অশ্মময়পুরী দগ্ধ করে দাসরাজ-কুলশ্রেষ্ঠ শম্বর, শুষ্ণ, পিপ্রু, বৃত্র প্রমুখকে অন্যান্য দাসজনদের সঙ্গে হত্যা করে

এবং 'হরিযূপীয়া' ( হরাপ্পা ) নগরী বিধ্বস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, দাস বা দস্যু-বংশীয় নারীদের আলিঙ্গনাশ্লিষ্টও করেছিল ইত্যাদি মর্মে যেসব বর্ণনা সেখানে মেলে তার বাস্তব অর্থ হল পরাভূত প্রাগার্যভাষী জাতি গোষ্ঠীর নারীরা যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের আদিম নিয়মানুযায়ী বাধ্য হয়েছিল বিজয়ীদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে। হরাপ্পা সভ্যতার শিব-শক্তি আরাধনা যেমন এর ফলে কাল-ক্রমে ঐ নারীদের প্রসন্ততিদের দ্বারা উপাসিত হতে হতে বৈদিক ইন্দ্র, মিত্র, সূর্য, সোম, বরুণ প্রভৃতি অন্তরীক্ষ দেবতাদের হটিয়ে দিয়ে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের পত্তন করল মিশ্র সমাজের একটি স্তরে, অন্য স্তরে তেমনই ব্রতকেন্দ্রিক ধর্মাচারও আত্মপ্রতিষ্ঠ হল সেই সমাজায়তনের অন্তঃপুরে।

॥ ২ ॥

ব্রত শব্দের প্রধান অর্থটি ইংরেজী করে বললে হয় 'ভাউ'। আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ করতে গিয়ে বিশেষ কিছু আচার-বিধি বিশেষ কিছু সময় ধরে পালন করার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ব্রতের মূল কথাটি। জাদু-শক্তিতে বিশ্বাসেরও এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ব্রতচারী পালনের ধারার সঙ্গে সমাজের বাইরে কাঠামোর মধ্যে প্রচলিত পৌরাণিক তথা শাস্ত্রীয় ধারার সহাবস্থানের পরিণতিতে কালক্রমে দু' ধরনের ব্রত সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ধারাটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির বহু ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সাদৃশ্য বেশ কিছুটা থাকলেও, ও দুয়ের মৌলিক চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রতের আদি-ধারা—যা উত্তরকালে শাস্ত্রবহির্ভূত ব্রতরূপে পরিচিত হয়েছে তার মূল কথাই হল—চাই, দাও। অর্থাৎ পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ হবার প্রত্যাশাই সেখানে নিয়ামক-মানসিকতা ; পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় ব্রত বলে কথিত যেগুলি, অর্থাৎ পরবর্তী-কালের সৃষ্টি, সেগুলির অভীপ্সিত হল পার্থিব বন্ধনসমূহ থেকে মুক্তি। স্বভাবতই গীতা এবং বেদান্ত দর্শনের ইহবৈমুখী চিন্তার সর্বগ্রাসী প্রভাব যখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের কালে ছড়িয়ে পড়ল শংকরাচার্যের পরে—খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে। আনুমানিক ভাবে ধরা যায়—তখনই ওপরতলার সামাজিক সংস্কার চুঁইয়ে নীচে নেমে এসে এদের সৃষ্টি করেছে।

আদিধারার ব্রতের প্রধান বাহক নারীসমাজ হলেও পুরুষের পালনযোগ্য দু-একটি ব্রতও আছে, যেমন অসিধার। তবে এ ধরনের ব্রতের সংখ্যা খুব

কম। মেয়েলী ব্রতের তিনটি ভাগ: কুমারী ব্রত এয়োস্ত্রী ব্রত এবং নারী ব্রত; নামেই এদের চরিত্রলক্ষণ স্বপ্রকাশ হয়।

তবে সব ধরনের ব্রতের মধ্যেই বিভিন্ন কালপর্যায়ের পলির আস্তরণ পড়েছে। বেদান্তের মায়াবাদ কিংবা গীতার কর্মফলবাদ অবলম্বন করে যেসব শাস্ত্রীয় ব্রত গড়ে ওঠেছে—যেমন গোকুল ব্রত, গরুর মুখে ঘাস দিয়ে স্বর্গলাভই যেখানে অভিপ্রেত মোক্ষ—সেগুলির মধ্যেও যেমন দেবতার কাছে প্রার্থনা শুনি, তেমনিই ইহমুখিন আকাঙ্ক্ষাপূরক শাস্ত্রবহির্ভূত ব্রতগুলির প্রার্থনানির্ভর রূপগুলিও দেবতাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, আদিম মানুষের ধর্মধারণাকে উপজীব্য করেই হাজার-হাজার বছরের বিবর্তনে এই ব্রতগুলির উদ্ভব ঘটেছে।

মানুষের আদিম ধর্মধারণার কি-কি এই ব্রতগুলিতে টিঁকে রয়েছে? প্রথম, মন্ত্র; দ্বিতীয়, দেবমূর্তি ও উপচার; তৃতীয়, আলপনা এবং চতুর্থ, যা আর সবগুলিকে একত্রবদ্ধ করেছে, জাদুবিশ্বাস। যেহেতু কোনো সামাজিক সংস্কারই অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া গড়ে ওঠে না, তাই আদিম শিকার-ও-সংগ্রহ-জীবিকার স্মৃতি ব্রত-গুলির আদি রূপের মধ্যে যা ছিল, পরবর্তীকালের পশুচারণ এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির স্তরে—যেটা আবার অধিকাংশ ব্রতেরই পরিপ্রেক্ষিত—সেগুলির তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তবু একেবারেই কি সেই অরণ্যবাসী প্রাচীন প্রস্তর যুগের স্মৃতির অণুকণিকাও ব্রতে মেলে না? মেলে। যেমন ধরুন, থুয়া ব্রতে 'বনে বনে আয়তী' থাকার যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশমান হয়েছে সেটা তো জনপদবাসীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। বনে যাবার প্রয়োজন ঘটে তখনই, যখন শিকার বা সংগ্রহ জীবকার্জনের মাধ্যম রূপে পরিগণ্য হয়; সে মাধ্যম কৃষিকেন্দ্রিক জানপদ-জীবনের অর্থনৈতিক স্তরে বদলে গেলেও ব্রতের মন্ত্র বিধানে নিজের যেশটুকুর অবশেষ রেখে গেছে।

শিকারনির্ভর অর্থনৈতিক জীবনের সংস্কার ব্রতের আলপনার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন-ভাবে লুকোনো থেকে গেছে। মানুষ যখন শিকার আর সংগ্রহকেই তার জীবিকা নির্বাহের সীমাবদ্ধ মাধ্যম বলে জানত, তখনই সে কতকগুলো চিহ্ন ধুলোর ওপরে, বালির ওপরে, কাদার ওপরে—পশু-পাখিরা যা হেঁটে চলে-দৌড়ে-বসে-শুয়ে সৃষ্টি করত—লক্ষ্য করেছিল। মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত পশু-পাখি সরীসৃপই ছিল তার খাদ্য তথা জীবিকার মাধ্যম। সুতরাং বিসর্পিল গতিতে কোন সরীসৃপ কোন্ দিকে গেছে, ঐ চিহ্ন দেখতেই তারা তার খোঁজ করত। নদীর ধারে কাদার ওপর ঠিক কোথায় পাখিরা এসে বসে তার হদিশ

তারা পায়ের ছাপ দেখেই। সুতরাং ব্রতের আল্‌পনার বিসর্পিল এবং ভাঙা-ভাঙা ছাপ-ছাপ রেখাগুলিব আদি উৎস যে সেই শিকারকেন্দ্রিক জীবনচর্যারই সূত্র-বাহী তাতে বিশেষ সংশয়ের অবকাশ থাকে না। সেগুলি তখন গণ্য হত স্বাভাবিকভাবেই অন্নের হদিশ-দেওয়া শুভচিহ্ন হিশেবে।

পরবর্তী অর্থনৈতিক স্তরে মূল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলল চিহ্নগুলি যদিও, কিন্তু ব্যবহৃত হতে লাগল আগের মতই দেবারাধনা, পূজা-প্রার্থনার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিশেবে। কিন্তু নতুন তাৎপয আরোপিতও হল তাদের ওপর। যেমন কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে যে ধর্মাচার সৃষ্টি হয় সেখানে শস্য এবং উর্বরতা-সূচক প্রতীকগুলিই শুভচিহ্নরূপে গণ্য হওয়া স্বাভাবিক, তাই ধানের ছড়া বা গোলার আল্‌পনার পাশেঐপাখির পায়ের ছাপ বা সাপের চলার ছাপেব অবস্থান স্থায়ী হল এই কারণে যে, গোলা উপ্‌চে শস্য পড়লে পাখিরা এসে উড়ে বসে সেগুলো খুঁটে-খুঁটে খায় এবং সাপের সঙ্গে উর্বরতা বৃদ্ধির বিশ্বজনীন ধাবণা ছাড়াও আরও একটি জিনিষ এখানে স্মরণযোগ্য যে, সাপে ইঁদুর খায় এবং ইঁদুব হল শস্য-অপহারক, তাই সর্পিল চিহ্ন ( যেন ) ইঁদুরেব শস্য নষ্ট করার প্রতীক দ্যোতনাবাহী।

॥ ৩ ॥

কৃষিপূর্ব প্রাগৈতিহাসের কালের আর একটি জাদুকেন্দ্রিক সংস্কার উদ্ভাসিত হতো হাতের বা পায়ের ছাপকে শুভদ্যোতক বা অশুভরোধকরূপে গণ্য করাব মধ্যে। স্পেনের আল্‌তামিরা, ফ্রান্সেব ল্যাস্‌কো কিংবা ভারতবর্ষের ভীম-বেট্‌কা প্রভৃতি বিখ্যাত গুহা-গ্যালারীগুলির কথা যদি ছেড়েও দিই, তাহলেও গুহার দেয়ালে হাতের বা পায়ের ছাপ কিংবা তার অনুকৃত ছবি মেলে না এমন অখ্যাত গুহাও দুর্লভপ্রাপ্য। অভ্যন্তরমুখী পদচিহ্ন এবং বহির্মুখী পদচিহ্নের তাৎপর্য আজও যা, সেদিনও তাই ছিল, একটি শুভ সংঘটক অলৌকিক শক্তির আসার কল্পনা এবং অন্যটি অশুভকারী শক্তির চলে যাওয়ার চিন্তা থেকে সঞ্জাত। লক্ষ্মীর পা সেইজন্যে ব্রতের আল্‌পনার সবদাই ঘরের দুয়ার থেকে ভিতরমুখী থাকে। হাতের ছাপ দেওয়ালের গায়ে বা দোরের পাল্লায় এখনো দেওয়ার রেওয়াজ পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে অবিরলভাবে দেখা যায়। প্রাচীন ক্রীট দ্বীপের এবং মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পার প্রত্নিদর্শের মধ্যে ঐ লক্ষ্মীর পদচিহ্নের মতো প্রতীকী পায়ের ছাপের সীলমোহরও বেশ কয়েকটিই পাওয়া গেছে। প্রাচীন প্রস্তর-

যুগের গুহাশিল্প থেকে নব্য প্রস্তর যুগের সীলমোহর অবধি যে ঐতিহ্য বহমান ছিল, তারই উত্তরসরণ হয়েছে ব্রতের আল্‌পনার এই বিশেষ চিহ্নটির মধ্যে। দশ পুতুল ব্রতের মানুষের ছবি কিংবা ষষ্ঠী ব্রতের কোলে-পো, কাঁধে-পো ছবির রূপ এবং আঙ্গিকের সঙ্গে যেকোনো গুহাচিত্রে অংকিত মানব মূর্তির পার্থক্য নির্দেশ করা প্রায় অসম্ভবই।

ঠিক এই জিনিস ব্রতের আল্‌পনায় আর দুটি খুব বহুলভাবে ব্যবহৃত চিহ্নের মধ্যেও দেখি। পদ্ম এবং কারুকাজ করা চক্র আল্‌পনার দুটি খুব পরিচিত অভিপ্রায়। আদিম শিল্পকলায় স্ত্রী-প্রত্যঙ্গ এবং পুরুষ-প্রত্যঙ্গের বাস্তবানুকরী বহু নিদর্শন দেখা যেত। অ্যাবে ব্রুইলের 'ফোর হাণ্ড্রেড সেঞ্চুরীজ অব কেভ আর্ট' বইতে এরকম নিদর্শন অজস্র মিলবে। নব্য প্রস্তর যুগে যখন প্রতীক-ধর্মিতা শিল্পকলায় প্রবল হয়ে উঠল তখন পৃথিবীর অগ্রসারী সংস্কৃতির প্রায় সব ক'টি কেন্দ্রেই—মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধুতীর—স্ত্রী-অঙ্গ ফুলের প্রতীকে ব্যঞ্জিত হতে থাকে। উত্তরকালের তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রেও সে ব্যঞ্জনা অব্যাহত। সুতরাং অষ্টদল অথবা বহুদল পদ্ম এবং কারুকৃত-বৃত্ত (ও ত্রিভুজ)—তন্ত্রে যা 'যন্ত্র'রূপে অভিহিত—আদিম সংস্কৃতির সেই যোনিসম্পৃক্ত-জাদুবিশ্বাস ব্রতের মধ্যেও বহে এসেছে সমান্তরালভাবে। লোকায়ত ধর্মধারার ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-কেন্দ্রিক উর্ধ্বর্তনে সৃষ্ট হয়েছে তন্ত্রসাধনা এবং আন্তঃপুরিক ধর্মাচারেব সূত্রানুষঙ্গে এসেছে ব্রত, সুতরাং ও-দুয়ের উৎস মোটামুটিভাবে একই।

ধানের গোলা, ধানের শিস্, মাছ, সূর্য, পেঁচা ইত্যাদি আল্‌পনা-চিহ্নের মানেটা অনেক সহজ তুলনামূলকভাবে। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার স্তরে এসেও মানুষ তার অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিই চিত্রকলায় শুভ চিহ্ন বলে গণ্য করেছে। শস্য এবং পশুপালন-সম্পর্কিত বিষয়মাত্রেই তখন তার পূজাবিধির অনিবার্য অনুষঙ্গ। শস্যগুচ্ছ, মরাই, গোয়ালঘর ইত্যাদি তাই আল্‌পনায় এসেছে যুগের আর্থনীতিক প্রভাবে। কৃষি-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জানপদ জীবন ও ব্যক্তিগত সম্পদেরও শুরু: অতএব কুটির এবং লক্ষ্মীর পা। বিত্ত চাই, শস্য চাই, সন্তান চাই, উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারার এই হল মূল কথা। সুতরাং উর্বরতা-সূচক চিহ্ন সূর্য (নব্য প্রস্তর যুগে সূর্যকিরণ শস্যস্রষ্টা ও পৌরুষের প্রতীক হিসেবে কল্পিত হতে আরম্ভ করেছে) এবং মাছ। শস্য-রূপ সম্পদের হানিকর ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর শত্রু পেঁচা, সুতরাং সে হল বিত্ত-রক্ষয়িত্রী লক্ষ্মীর বাহন। এরা আল্‌পনায় এল অতএব।

মাছ, কলাগাছ এবং পানপাতা ও কড়ির উল্টোপিঠের অনুসারী কলকা ধরনের চিহ্ন যে আল্‌পনায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, সেটা আবার প্রাগার্য অস্ট্রিক সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ ফুটিয়ে তোলে। উপচার হিশেবেও এরা ব্রতে ব্যবহৃত হয়, যেমন হয় সুপুরি, নারকেল, ডাব, হলুদ, সর্ষের তেল ইত্যাদি। পান এবং কড়ি তাদের বিশেষ ধরনের আকৃতির জন্যও উর্বরতাদ্যোতক প্রতীক বলে গণ্য। কলাও তাই। অতএব অর্থনৈতিক চেতনা এবং সংস্কার এ দুয়ের যৌথ অভিপ্রায়ে এই সবই উপচার এবং আল্‌পনা-চিহ্ন হিশেবে ব্যবহৃত হতে লাগল।

॥ ৪ ॥

উপচারেব ক্ষেত্রে জলভরা ঘট ( এবং ডাব ) নারকেল, ইত্যাদি আবার আদিম মাতৃকাতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্ম চিন্তার ঐতিহ্যকে বহন করছে। এর সব কটিই হল অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রতীক। প্রত্নপ্রস্তর যুগের নারীমূর্তিরা প্রায় সর্বত্রই গর্ভবতীরূপে প্রদর্শিত। পরবর্তীকালে (মধ্য-প্রস্তরযুগে হওয়া সম্ভব) এটিও প্রতীকী হয়ে ঐ-সব ঘট ইত্যাদিতে বাঞ্ছিত হতে লাগল। ব্রতের ক্ষেত্রে প্রধান উপাস্য দেবতারা হলেন নারীই, যেমন লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, চণ্ডী প্রমুখ। এঁবাই নানা-ভাবে ব্রতিনীদের কল্পনায় উদ্ভাসিতা হয়েছেন। পুরুষ দেবতারা আছেন, যেমন থুয়া বা লাউল বা যম বা শিব, কিন্তু প্রাধান্য স্ত্রী-দেবীদেরই। পুরুষ পুরোহিত ব্রতে যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনিই পুরুষ দেবতারাও সেখানে নিতান্তই অপ্রধান বর্গের।

এইসব দেবতার বাহনরূপে যে-সব প্রাণীদেরকে এখন কল্পনা করা হয়, এককালে তারা নিজেবাই ছিল উপাস্য। দেবকল্পনার সেই প্রাগৈতিহাসিক স্তর থেকে বিবর্তিত হতে-হতে তারা অবশেষে মানবদেহধারী দেবতার বাহন-রূপে গণ্য হতে লাগল, লক্ষ্মীর পেঁচা, ষষ্ঠীর বেড়াল, সুবচনীর হাঁস ইত্যাদি যার উদাহরণ। টোটেম-তথা-কুল-প্রতীকী পশু-সম্পর্কিত আদিম চিন্তা একদিকে যেমন গোত্রভাবনার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে এসেছে, অন্যদিকে দেবমূর্তিকল্পনার বিবর্তিত মূর্তিতে বাহনরূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, পৌরাণিক এবং লৌকিক ( যাঁরা পৌরাণিক হয়ে উঠতে পারেন নি ) এইসব দেবদেবীদের ক্ষেত্রে।

থুয়া ব্রতের উল্লেখ এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে করেছি। এই থুয়া দেবতার মূর্তিরূপে যা ব্রতিনীরা পুজো করেন, তার মধ্যে এবং লাউল দেবতার মূর্তির

মধ্যেও সম্ভবত অতি আদিম কালের ধর্ম এবং দেব-কল্পনার আভাস মিলছে। কাদা দিয়ে তৈরী পাঁচটি তীক্ষ্ণশীর্ষ পিরামিড জাতীয় ছোট ছোট জিনিসকে থুয়া দেবতারূপে কল্পনা করা হয়। লাউলও অনুরূপ মূর্তিধারী, শুধু তার ক্ষেত্রে ঐ ধরনের একটিই মাত্র আয়তন তৈরী করা হয়। তার গায়ে দুটি কাঠি বিঁধে সেগুলিকে হাত হিশেবে কল্পনা করে ফুলের মালা জড়িয়ে পূজো করেন ব্রত-পালিকারা।

স্পষ্টতই, থুয়া এবং লাউলের এই মূর্তিগুলি আদিম মেন্‌হির্‌ বা বীরস্তম্ভ জাতীয় বস্তুর স্মৃতিবাহী। এদের নামের মধ্যেও অধুনা বিস্মৃত কোন আদিম তাৎপর্য আছে, যা আমাদের প্রাগার্য অষ্ট্রিক-দ্রাবিড প্রত্ন-পিতামহেরা জানতেন। লাউলকে রাতুলের অপভ্রষ্টরূপ হিশেবে ভাষাতাত্ত্বিক কোনো-কোনো পণ্ডিত গণ্য করলেও, এর মূর্তি এবং পূজাবিধির সঙ্গে ঐ আর্যীকরণ সুসমঞ্জস নয় আদৌ।

বহু সময়েই ব্রতের আরাধ্যা দেবী বড় বা ছোট একটি ঘটের প্রতীকে গৃহীতা হন যে, তার মধ্যেও একটি আদিম সংস্কার সক্রিয় আছে। ঘট আদিম কাল থেকেই অন্তর্বত্নী নারীর সংকেতবহ রূপে গণ্য। বড জালা জাতীয় পাত্রের মধ্যে মৃতদেহকে ভ্রূণরূপে পুনর্জন্মের জন্য বিন্যস্ত করে সমাধি দেবার রীতির মধ্যে ঐ ধারনার প্রমাণ মেলে। চণ্ডী, মনসা, ইতু ইত্যাদি ব্রতদেবীরা ত ঘটের মাধ্যমেই প্রতীকায়িত হন, বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর এবং ষষ্ঠীর প্রতীকও ঐ ঘটই। বটের ডাল, মনসার ডাল, অশ্বত্থের ডাল, আমের ডাল ইত্যাদিও ঘটের সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় উপচার হিশেবে যে ব্যবহৃত হয়, তার পিছনে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক বৃক্ষপূজার ধারা, কলাগাছের ব্যবহারের পিছনে একটি কারণ উর্বরতার প্রতীকপূজা বটে, কিন্তু বৃক্ষোপাসনার উত্তরসরণও অন্যতর হেতু। মোচা, মোচার খোলা, থোড়, দূর্বা, হলুদ প্রভৃতি উপচারও অনুরূপ ভাবনা-সঞ্জাত।

॥ ৫ ॥

ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্র এবং কথার বিশ্লেষণ করলেও যে তার আদিম উৎস খুঁজে পাওয়া যায়, এই অধ্যায়ে গোড়ায় থুয়া ব্রতের মন্ত্রটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তা দেখেছি আমরা। কাহিনী বা কথার প্রসঙ্গের আগে মন্ত্রের ব্যাপারটিই বিচার করা সঙ্গত। আল্‌পনার ক্ষেত্রে জাদুবিশ্বাসের অনুকৃতিমূলক রীতিটিরই উদ্বর্তন হয়েছে। ধানের গোলা আঁকলে সত্যিকারের ধানের গোলা হবে

("আমি দিই পিটুলি গোলা, আমার হোক সত্যিকারের গোলা" : সেঁজুতি ব্রতের মন্ত্র); লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকলে সেই চিহ্নে পা ফেলে-ফেলে স্বয়ং দেবীই আবির্ভূতা হবেন ঘরে। ধান, পান, সুপুরি, কড়ি (আদি ব্যঞ্জনা বদলে গিয়ে পরবর্তীকালে যা বিত্ত বলে গণ্য হয়েছে) হাতে নিয়ে ব্রত করতে বসলে ঐ সব জাগতিক সম্পদে ভাবে-ভারে ভরে যাবে সংসার, এই ধরনের বিশ্বাস আবার স্পর্শমূলক জাদুকল্পনা থেকে উদ্ভূত-মন্ত্রের ক্ষেত্রে জাদুবিশ্বাসের ঐ দুটি প্রকরণই সমন্বিত হয়েছে।

আদিম মানুষ নানাবিধ ধ্বনির সৃষ্টি করে তাদের কল্পনা-করা দেবতা এবং উপদেবতাদের পরিতুষ্ট করতে চাইত নিজেদের মঙ্গল কামনা এবং অমঙ্গল প্রতিরোধের জন্য। এরই আনুষঙ্গিক হিশেবে অঙ্গভঙ্গী, পশুবিশেষের হাঁটা-চলা-লাফানোর অনুকরণ ইত্যাদিও করা হতো। এইগুলি থেকেই যথাক্রমে মন্ত্র (যার বিবর্তিত রূপ হল গান), এবং নৃত্য-উদ্ভূত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন (সি. এম. বাওরার 'দ্য প্রিমিটিভ সং' বইটি দেখতে পারেন)। অর্থাৎ মন্ত্রের মূল তাৎপর্য হল দেবতার তুষ্টিসাধন। বৈদিক সূক্ত থেকে ব্রতের 'মন্তর' অবধি—সর্বত্রই তাই একই বক্তব্য, যা আগে বলেছি, "চাই, দাও।" বিত্ত দাও, শস্য দাও, সন্তান দাও, প্রেম দাও, শত্রুর নিকেশ কর ইত্যাদি-ইত্যাদি। (বাংলা ব্রতের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রতিনীদের শত্রু বলতে ছিলেন তাঁদের সতিনীরা। সুতরাং পৌরাণিক চণ্ডীমন্ত্রে যা "দ্বিষো জহি", ব্রতের মন্ত্রে তাই "বঁটি, বঁটি, বঁটি, সতীন পেড়ে কুটি"!) নাচের ব্যাপার ব্রতের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়ে গেছে, যদিও উত্তরবঙ্গের 'হুদুমদেও' কিংবা হিন্দীভাষী বলয়ের ছট্ জাতীয় ব্রতধর্মী পূজার ক্ষেত্রে তার খোঁজ মেলে না এমন নয়।

মন্ত্রের মূল ভাবটি আদিমকাল থেকে এ-অবধি অক্ষুণ্ণ থাকলেও, যেহেতু যুগে-যুগে মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদার রূপান্তরণ ঘটেছে, তাই তার প্রার্থনার বাস্তব উপজীব্যগুলোও বদলেছে। বল্লমের নাগালে হরিণ পাবার প্রাগৈতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা যখন জীবনে বড় হয়ে উঠল, তখন মন্ত্রের অভীপ্সিত কামনাও হল সেইটিই। কেবলমাত্র অতীত অর্থনৈতিক জীবনের প্রত্নস্মৃতির টুকরো, যেমন ঐ "বনে বনে আয়তী" (স্পষ্টতই শিকার-ও-সংগ্রহ-নির্ভর অর্থনৈতিক জীবনযাপনকারী পুরুষদের সঙ্গিনীরা গুহায় বসে এইসব প্রার্থনাই করতেন), ক্বচিৎ কখনো খুঁজে পাওয়া যায় এদের মধ্যে গারুই বা গার্সি ব্রতে যে "হালের অর্জন জালের মাছ" নষ্ট থাবার বিধান আছে, সেও তাহলে কৃষিপূর্ব শিকার-

নির্ভর জীবনের যাপন পদ্ধতির অনুবর্তনেই! 'রণে এয়ো' ব্রতের মন্ত্রে আছে "রণে রণে এয়ো রব জনে জনে সুয়ো হব।" মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের কামনা সর্বকালীন হয়ত বা, কিন্তু প্রথমাংশেব কামনা ত নিঃসন্দেহে রণনিপুণ কোনো জাতির বধূদের ছাড়া আব কারুর নয়।

তাহলে 'বাঙালী' যখন যুদ্ধ করত, তখনকার প্রত্নস্মৃতিই এর মধ্যে উদ্ভাসিত কি? রণদুর্মদ 'গাঙ্গেরাইড' (গঙ্গারাঢ়ী?) এবং 'প্রাসিয়য়' (প্রাচ্যা?) জাতির উল্লেখ গ্রীক ঐতিহাসিকেরা সশ্রদ্ধভাবে করেছেন খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে, এ কি তাহলে তারই স্মৃতিবাহী? শশাংকর আমল অবধি ত বটেই, এমন কি দেবপাল-বিগ্রহপালের সময়কাল পর্যন্ত বাঙালী লডাই করেছে। তারপরে 'রণ' ব্যাপারটা জীবন থেকে অন্তর্হিত হলেও, ব্রতিনীদের প্রার্থনায় কিন্তু পিতৃপুরুষের সেই গৌরবস্মৃতির আভাস রয়ে গেছে।

ঐ পাল-আমল পর্যন্তই বাঙালী বিদেশে বাণিজ্য যাত্রাও করছে। ব্রতের মন্ত্রে (এবং কাহিনীতেও), সে-ইতিকথা ধরে রাখা আছে। লক্ষ্মীপূজোর উপচারে কলাখোডের চৌপাল নৌকো-গডাটাও তাবই অনুষঙ্গ। 'ভাদুলী' ব্রতের একটি 'মন্তব' উদাহরণ হিশেবে দেখা যেতে পারে, "ভেলা ভেলা সমুদ্দুরে থেকো, আমার বাপভাইকে মনে রেখো। ভাই গেছেন বাণিজ্যে, বাপ গেছেন বাণিজ্যে, সোয়ামী গেছেন বাণিজ্যে।...ফিরে আসবেন আজ, ফিরে আসবেন আজ।...ভাদুলি মায়ে বর দিল, ঘাটে এল সপ্ত না।" সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রামের বণিকেরা ১৭শ শতাব্দীতেও বাণিজ্যে গেছেন, তবে দেশান্তরে নয়, বড় জোর দক্ষিণ পাটন ইস্তক। ধরা গেল এই মন্তর তখন অবধি বাস্তব আর্থনীতিক পরিবেশের সঙ্গে সমঞ্জস। কিন্তু তারপর থেকে যখন 'কালাপানি' পার হওয়া জাতিচ্যুতির হেতুসূচক বলে গণ্য হতে আরম্ভ করল ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্য-প্রভাবিত মধ্যযুগীয় স্মার্ত সংস্কৃতিগ্রস্ত বাঙালী সমাজেও, তখনও কিন্তু ঐ অতীত স্মৃতিকে অন্তঃপুরে বাঁচিয়ে রেখেছেন বাঙালী মেয়েরা ব্রতের মন্ত্রে। অনুরূপভাবে মুঘল আমলের স্মৃতির অনুরণন শুনি সেঁজুতির মন্ত্রে: "বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর ভাই হয়েছেন রাজা" কিংবা "আর্সি আর্সি আর্সি, আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি" ইত্যাদিতে।

॥ ৬ ॥

অবশেষে ব্রতের 'কথা'। দেবতা, উপচার, আচার এবং মন্ত্র যেমন ব্রতের পক্ষে অনিবার্য শর্ত, ব্রতের কথা বা গল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি নয়; অর্থাৎ কথা না-থাকলেও ব্রতের অঙ্গহানি হয় না। বস্তুতপক্ষে 'কথা' নেই, এমন ব্রতের সংখ্যা খুব কম নয়। যেমন ধরুন: 'নখ ছুটের ব্রত', 'সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত', 'যাচা পান ব্রত', 'তেজ দর্পণ ব্রত', 'রূপ হলুদ ব্রত', 'আদর সিংহাসন ব্রত', 'পদ্মপূর্ণিমা ব্রত', কিংবা সুপরিচিত 'সেঁজুতি ব্রত' কিংবা 'পুণ্যিপুকুর ব্রত' ইত্যাদি। মূলত লক্ষ্মী, চণ্ডী, ষষ্ঠী এবং মনসাকেন্দ্রিক (অর্থাৎ মাতৃদেবতামূলক) ব্রতগুলির ক্ষেত্রেই কাহিনীর প্রচলন ব্যাপক ভাবে দেখা যায়।

এমন ব্রতও আছে যার আদি কথা-বস্তুটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে এরকমও মনে করবার কারণ বিরল নয়। উদাহরণ হিশেবে ঐ যমপুকুর ব্রতেরই উল্লেখ করতে পারি: এই ব্রতে, পূজার স্থানে ছোট একটি চারকোণা পুকুর কেটে বা আলপনায় এঁকে, তার চারদিকে হয় মাটির পুতুলে সাজিয়ে নয় আলপনায় এঁকে যম, যমনী, যমের মাসি, ধোপা, ধোপানী, শেখ, শেখনী, জেলে, জেলেনী, কাক, বক, হাড়ব, কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি রাখতে হবে। প্রত্যেকটি পুতুল বা ছবিই ব্রতিনীর উপাস্য। এই ব্রতের গল্পতে আছে, যে বউ এই ব্রত পালন করতে গেলে শাশুড়ী তাকে লাথি মেরে উঠিয়ে দিয়ে ব্রত ভেঙে দিত। এই জন্যে মরবার পর শাশুড়ী নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। তার ছোট ছেলে এই ব্যাপারে জানতে পেরে বড় বউকে বলে যে যমরাজার ব্রত আবার নতুন করে পালন করলে তার মায়ের মুক্তি হবে। বড় বউ গোড়ায় রাজী হয়নি শাশুড়ীর ওপর পুরেনো রাগের বশে। কিন্তু ছেলে হবার সময় যমরাজা তাকে এমন কষ্ট দিলেন, যাতে সে তাঁর পূজো করল এবং তার ফলে তার নিজের নির্বিঘ্নে প্রসব আর শাশুড়ীর নরকমুক্তি ঘটল। সেই থেকে ঐ পরিবারে প্রতি বছর যম পুকুর কেটে ব্রত পালনের রীতি চালু হল, যার ফলে তাদের বংশে কেউ নরক-বাস করেনি, সব বউয়ের নির্বিঘ্নে প্রসব হয়েছে আর ভূ-সম্পত্তি লাভ হয়েছে। সবাই দীর্ঘায়ু হয়েছে।

সাঁওতালী সৃষ্টি পুরাণকথায় আছে যে পিলচু হাড়াম (আদি মানব)

এবং পিল্‌চু বুড়ি (আদি মানবী)-কে সৃষ্টি করার পর ঠাকুরজিউ-তথা-সিজ-বোঙ্গা (ঈশ্বর)—তাদেরকে বসবাস করতে দেবার মতো কোনো ডাঙা জমি খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি বিভিন্ন পশু-পাখিকে এবং সরীসৃপ-কীট-পতঙ্গকে আদেশ করলেন জলের তলা থেকে মাটি তুলে এনে ডাঙা জমি তৈরী করতে। অনেকবারের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শেষকালে কচ্ছপের পিঠের ওপরে মাটি রেখে পৃথিবীর ডাঙা জমি তৈরী হল, সেখানে বাস করার ভূমি জুটল পিল্‌চু হাড়াম আর পিল্‌চু বুড়ির এবং তাদের বহুদিন ধরে ছেলেমেয়ে হল। ছেলেমেয়ে যত বাড়ল, জমির এলাকাও তত বাড়িয়ে দিলেন ঠাকুরজিউ।

এই মিথ যে লৌকিক ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেটি কালক্রমে বাঙালী সমাজে পরিবর্তিত চেহারায় যমপুকুর ব্রতের মধ্যে এসেছে। কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদির সাহায্যে জমি লাভ, তার ফলশ্রুতিতে সন্তানলাভ দীর্ঘদিন ধরে (অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হয়ে) ইত্যাদি সংস্কার তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখল; শুধু পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে গল্পটা আদিবাসী সমাজের চরিত্র বদল করে বিবর্তিত বাঙালী সমাজের সঙ্গে মানানসই করে গড়ে তোলা হল। শাশুড়ী-বউয়ের দ্বন্দ্ব (যা দুই ধর্মধারা বা কাল্‌টের বিরোধ) এবং পরিণামে বউয়ের ধর্মাচারের প্রতিষ্ঠা বাংলা ব্রতকথার একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায়। বধূর ধর্মাচার এবং তার শ্বশুরবাড়ির ধর্মাচারের এই সংঘর্ষ স্পষ্টই ইঙ্গিত করছে, বধূরা 'অন্যব্রত' পরিবারের কন্যা। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি-লহনা-খুল্লনার ঘটনা এর উল্লেখযোগ্য নমুনা। ধোপা-ধোপানী, জেলে-জেলেনী, শেখ-শেখনী ইত্যাদির পুতুল বা ছবি এই ব্রতে পুজো করতে হয়, এটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখানে: সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতি, এমনকি ভিন্ন ধর্মীর প্রতিও এই অর্ঘ্য নিবেদন একটা কথাই বোঝায় যে, এর উৎস লুকিয়ে আছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার-বাইরেই। তাৎপর্যটা শুধু বিস্তৃত হয়ে গেছে পরবর্তী-কালে। যেমন সেটি হয়েছে কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদি পূজার ক্ষেত্রেও। শেখ-শেখনীর আবির্ভাব অবশ্যই মুসলিম রাজ-শাসনের আমলের স্মৃতিবাহী।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের একটি কাহিনীর উল্লেখ এখনি করেছি। অন্য কাহিনীটি, অর্থাৎ কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীতে দেখি অরণ্যচারী শিকারজীবী মানুষ কীভাবে বন কেটে জনপদ পত্তন করতে শিখল। দেবী সেখানে কখনো গোধিকা মূর্তিতে (অবশ্যই টোটেম), কখনো ঘট কাঁখে (মাতৃমূর্তির বিশ্বজনীন প্রত্নপ্রস্তর-কালীন প্রতীক যে ঘট, তা আগেই বলেছি) দেখা দিয়েছেন। ব্যাধের

মাধ্যমে এই দেবীর পূজা প্রচারিত হল – এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে, আদিতে ইনি শিকারজীবীদেরই উপাস্যা ছিলেন। ওরাওঁ-আদিবাসীদের 'চান্দী' দেবী, যাঁর উপাসকরা নিজেদের গোধিকার উত্তরপুরুষ বলেও মনে করেন অনেকে, এই বক্তব্যকেই সমর্থন করে। গোধিকারূঢ়া প্রাচীন দেবী মূর্তির প্রত্ননিদর্শ এবং "গোধাসনা ভবেৎ গৌরী" প্রভৃতি শ্লোকও এর ভিত্তি দৃঢ়তর করে তোলে অতি অবশ্যই।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের অন্য গল্পটিতে ইতিহাসের অনেক পরবর্তীকালের প্রতিভাস দেখি : বাণিজ্য করতে বিদেশে যাওয়ার সূত্রে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং দুই ধর্মধারা ( পিতৃদেবতা-উপাসক – ধনপতি এবং মাতৃদেবতা-উপাসক – খুল্লনা ) – এর মধ্যে দ্বন্দ্বে যেভাবে লিপ্ত হয়েছে এবং পরিণামে একটি ( মাতৃদেবতার উপাসনা ) বিজয়ী হয়েছে কি-করে, তার অন্তর্কাঠামোর উপবে এর বহির্কাঠামো গড়ে উঠেছে। খুল্লনার ছাগল-চরানোর বিষয়টি থেকে ধরা যেতে পারে শিকারজীবীদের দেবী, পরবর্তী অর্থনৈতিক পশুচারকদের উপাস্যায় পরিণত হয়েছিলেন। কিংবা ইনি ভিন্ন কোনো দেবী, আদিমতর দেবীর সঙ্গে কালক্রমে এক হয়ে মিলে যান।

মনসা-ব্রতের একটি কাহিনীতেও একই সঙ্গে আদিম অরণ্যজীবনের স্তর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-নির্ভর জানপদ-অর্থনৈতিক স্তর বিভিন্ন সময়ে সংমিশ্রিত হয়ে এটিকে গড়ে তুলেছে। দ্রাবিড়-বলয়ের অরণ্য দেবী মঞ্চাম্মা ( যিনি 'সর্পাধিষ্ঠাত্রী'ও বটেন ) মনসাসিজের প্রতীকে পূজিত হন এখনো ; বৃক্ষোপাসনা এবং পশুপূজা এখানে মিলেছে। এঁর অনুরূপ দেবী হলেন চেম্মুড়ু। মঞ্চাম্মা অর্থে মনসা মাতা এবং চেম্মুড়ু ( মনসাসিজ গাছ ; কাঁটাওলা ক্যাকটাস ) অর্থে চ্যাংমুড়ী ( বাংলাদেশে মনসার অন্যতম নাম ) স্বচ্ছন্দেই ধরতে পারেন। ফণি-মনসার ডালও মনসাব্রতের অতি প্রয়োজনীয় উপচার, এটিও স্মর্তব্য। পদ্মা, কেতকা ইত্যাদি নামও মনসার সঙ্গে আদিম বৃক্ষপূজাকে সম্পৃক্ত করেছে। ঘট মূর্তিতে তাঁর পূজা মাতৃকাতন্ত্রের দ্যোতক, সেটা আর নতুন করে বলার বিষয় নয়। সর্পদেবীর উপাসনাটা অরণ্যজীবন অতিক্রম করেও মানুষকে করতে হয়েছে সর্পভয়ের চিরন্তনত্বের জন্য। মনসার সঙ্গে দ্রাবিড়-বলয়ের যোগাযোগটা আর একটি কারণেও ভেবে দেখা যেতে পারে : দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, দক্ষিণী 'দেবদাসী' প্রথার সঙ্গেই সুসমঞ্জস ; বঙ্গ সংস্কৃতিতে এর আর কোনো তুলনা মেলে না। পক্ষান্তরে মনসাব্রতের গল্পেও সেই পুরুষদেবতাপূজক ( চাঁদ )

বনাম স্ত্রীদেবতা ( মনসা )—এ দ্বন্দ্ব উদ্ভাসিত। এই সব গল্পই পরিশীলিত হয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণতি পেয়েছে। আদিতে এরা পাঁচালি ছিল।

॥ ৭ ॥

মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের পরিচালিকা শক্তিই যে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, সেই ঐতিহাসিক সত্যের হদিশ দেয় দুটি বাংলা ব্রতকাহিনী: ক্ষেত্রলক্ষ্মীর ব্রতকথা আর অলক্ষ্মীপূজার ব্রতকথা। রাখাল বিনন্দকে লক্ষ্মী কেমন করে ধান চাষ করতে শেখালেন এবং নদীর পাড়ের গোচারণভূমিতে চাষের জন্যে মাটি কোপাতে গিয়ে অন্য রাখালদের সঙ্গে তার লড়াই করে জিততে হল কেমনভাবে—সেই কাহিনী নিশ্চয়ই পশুচারণার স্তর থেকে কৃষিকাজের স্তরে মানুষের বিবর্তিত হবার কালের প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতির ছায়া। বিনন্দের সঙ্গে অন্য রাখালদের দ্বন্দ্ব নূতন অর্থনৈতিক জীবিকানির্ভর শ্রেণীর সঙ্গে পুরানো অর্থনৈতিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বের দ্যোতক।

অলক্ষ্মীপূজার কাহিনী দুই মাতৃকাদেবী-উপাসকদের বিবাদ এবং তার পরিণতির পটভূমিকায় রচিত। রাজা নিজের সত্য রক্ষার জন্য হাটে-না-বিকোনো সমস্ত জিনিসের সঙ্গে বাধ্য হয়ে অলক্ষ্মী ঠাকুরের মূর্তিও কিনে আনায় রাজলক্ষ্মী, সৌভাগ্যলক্ষ্মী সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। রাজা তাঁদের বাধা না দিলেও ধর্ম যখন রাজপুরী ছাড়তে উদ্যত হলেন, তাঁকে আটকালেন এই বলে যে 'সত্য' পালন করে তিনি ধর্মকেই রক্ষা করেছেন। বাধ্য হয়ে ধর্ম রয়ে গেলেন অতএব। তখন সকলেই ফিরে এলেন। ফয়সালা হল যে, লক্ষ্মীপূজোর সঙ্গে অলক্ষ্মী পূজোও হবে, তবে পুরীর বাইরে খোলা আকাশের তলায়।

বহু বাঙালী পরিবারে আজও ঠিক ঐভাবেই অলক্ষ্মীর পূজো হয়। এই উন্মুক্ত আকাশের তলায় অর্চিত হওয়াটা আদিম দেবীর সূচক-লক্ষণ। অলক্ষ্মী দেবীর মূর্তি গোবরের তৈরী, ছেঁড়া চুল, ঝাঁটার কাঠি, জমা জঞ্জাল ইত্যাদি তাঁর উপচার; বোঝাই যাচ্ছে আদিম জাদুবিশ্বাস-সম্পৃক্ত কোনো দেবীর উত্তরসূরিকা হিসেবে এঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান। অলক্ষ্মী-জাতীয় নঞর্থক নামটা পরে আরোপ করা হয়েছে শুধু।

এই কাহিনীতে রাজার অবিক্রীত পণ্য কিনে নেবার যে ঘটনা দেখছি, সেটা রাষ্ট্র-কর্তৃক ক্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য ( এ যুগের অর্থনৈতিক পরিভাষায়: ভরতুকী ) দেবার ইঙ্গিত, যা অনেকখানি সুস্থিত সমাজব্যবস্থাকেই সূচিত করে।

এর মানে এই যে, এই কাহিনীতেও নানা যুগের ভাবনার পলি পড়েছে। এও আসলে সমন্বিত একটি কাহিনীমালার সংহত রূপচিত্র।

ঐ সমন্বয় নির্ভরতাই হল ব্রতকথার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র সামাজিক পর্যায়, গোষ্ঠী বা স্তরের পরম্পরিত স্মৃতির টুকরোগুলির সমন্বিত বিন্যাসই নয় বিভিন্ন পর্যায়ে গড়ে-ওঠা লোককাহিনীর নানা কাল-নির্ভর প্রকরণেরও মিশ্রণ এদের মধ্যে পাই। দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের অংশটুকু বাদ দিলে অধিকাংশ ব্রতকথাই রূপকথাধর্মী। রূপকথায় যেমন অবহেলিত ছোট রাণীই পরিণামে সফল হয় তেমনি একই জিনিস সেখানে দেখি। গরীবের মেয়ে ছোট বউয়ের পরিণামে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেল ( মনসার ব্রত কথা ), বুড়ি বামনীর দেওয়া ফুল ধুয়ে জল খাওয়ায় বেনে বৌয়ের ছেলে হল ( জয়মঙ্গলবার ব্রতকথা ); এ ত রূপকথার একটি বিশেষ পরিচিত উপকরণ। রাজকন্যার অসুখ সাবালো সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী প্রত্যাখ্যাত রাজপুত্র (মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রতকথা )—এ কাহিনী নির্ভেজাল রূপকথা ছাড়া আর কি? এর মধ্যে চন্দ্রদেবতার কৃপার যে কাহিনী সম্পৃক্ত হয়েছে, সেটা হল প্রাচীন চন্দ্রোপাসনার ঐতিহ্যাশ্রয়ী। এ প্রসঙ্গে লেখার শেষে আরও কয়েকটি কথা বলব।

উৎসাহী পাঠক ঐ রকম রূপকথাসুলভ উপকরণ ইচ্ছে করলে অজস্র পরিমাণেই সংকলন করতে পারেন। রূপকথা যে-সামাজিক স্তরে উদ্ভূত হতে পারে বর্তমান লেখকের শিক্ষক প্রয়াত লোককথাতাত্ত্বিক অরুণকুমার রায় তাঁর একটি গবেষণায় ( তাঁর ও সঞ্জীব সরকার সম্পাদিত 'লোকায়ত সংস্কৃতি' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য প্রাসঙ্গিকভাবে ) সেটিকে নির্দেশ করেছিলেন, আদিবাসী কৌম পর্যায় থেকে জনপদপর্যায়ে পৌঁছনোর মধ্যবর্তী একটি উপ-পর্যায় বলে। এক পূর্ববর্তী মিথ বা লোকপুরাণের স্তরও—যা হল আদিম আরণ্যক জীবনের সাংস্কৃতিক লব্ধফল—ব্রতকথায় আভাসমান, 'যমপুকুর' ব্রতকথা তার উদাহরণ। সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে মিথের অন্তর্লীন অলৌকিকতাটুকু টিঁকে যায়, তার দেবতা-নির্ভরতাটুকু প্রচ্ছন্ন হয় লোককথা, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদির মধ্যে। আবার ঐ অলৌকিকতা এবং জাদুনির্ভরতা নিয়েই পুনরাবির্ভূত হয় দেবকল্পনা, সৃষ্টি হয় ধর্মীয় কিংবদন্তীর। সেটা আরো সুসভ্য যুগের সাংস্কৃতিক উৎপাদন। বাংলাদেশের কত জায়গাতেই যে আঞ্চলিক ব্রত গড়ে উঠেছে ঐ রকম কিংবদন্তীকে নির্ভর করে, তার ইয়ত্তা নেই। এক চাঁদ সওদাগরের পাট, বেহুলার ঘাট আর নেতা ধোপানীর মাঠই অন্তত ৪ বা ৫ জায়গায়—অবশ্যই বিভিন্ন

জেলায়—দেখার সুযোগ হয়েছে একা এই লেখকেরই।

নিজের ছানার গলায় পেঁচী এসে লক্ষ্মীর গলার মালা পরিয়ে দিল তাকেই দুনিয়ার সুন্দরতম প্রাণী সাব্যস্ত করে (লক্ষ্মীর ব্রতকথা), কিংবা লোভী ছোট বউকে বিড়াল শায়েস্তা করল (ষষ্ঠীর ব্রতকথা)—এ সব তো নির্ভেজাল পশু-কথা। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মী এবং ষষ্ঠীর যত ব্রতকথা প্রচলিত আছে অল্পবিস্তর সবই পশুকথার লক্ষণসমৃদ্ধ। সেবা, দয়া, ধর্ম, ত্যাগ ইত্যাদি বিষয় ব্রতকথার মধ্যে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো আবার নীতিকথা বা কেবল বা প্যারাবলধর্মীও যে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আদিম শিকার-নির্ভর জীবন, প্রাক্‌প্রাচীন পশুচারণা-নির্ভর জীবন, প্রাচীন কৃষিভিত্তিক জীবন—তার পরবর্তী শিল্প-বাণিজ্যের জীবন—এর সমস্ত কিছুই এইসব কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান। মিথ, রূপকথা, পশুকথা, কিংবদন্তী নীতিকথা প্রভৃতি নানা চরিত্র এবং প্রকরণের এমন সমন্বয় আর কোন একটি কাহিনীধারার মধ্যে অন্য কোন সংস্কৃতিতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রতের সমধর্মী লোকায়ত ধর্মধারা বহু সংস্কৃতিতেই আছে (অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' বইটি দেখবেন) আল্‌পনা উপচার ইত্যাদি জাদুসংস্কারনির্ভর-পরিচর্যাও অলভ্য নয় তাদের মধ্যে; কিন্তু ব্রত কাহিনীর মতো এমন বিচিত্রতা, বলতে গেলে অনন্য সমন্বয় ধর্মিতা, অন্যত্র মেলে না। সেদিকে থেকে এটা তুলনা-বিরহিত।

ব্রতের মধ্যে আর একটি বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে, যার একটু প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা সবশেষে দরকার। কিছু আগে সে কথার একটা ইঙ্গিতও দিয়েছি। এই ব্রতগুলি পালন করার দিনক্ষণ একই সঙ্গে সৌরপঞ্জিকা এবং চান্দ্রপঞ্জিকা অনুসারে হয়। কিছু ব্রত আছে যেগুলি তিথি ধরে পালিত হয়ে থাকে, আবার অনেক ব্রতের পালনবিধি তারিখনির্ভর। সুতরাং প্রাচীনতর পঞ্জিকা-বিধান এবং আধুনিকতর পঞ্জিকা-নির্দেশের এই যৌথ উপস্থিতি ব্রতগুলিকে সামগ্রিক-ভাবে আরও একটি সমন্বয়ের উদাহরণরূপে প্রতিপন্ন করে। এ জিনিষ খুবই নজরে পড়ে, শুধু বাঙালী কেন, যে কোনো জাতিরই সংস্কৃতিতে।

ধরুন 'সেঁজুতি' ব্রতের কথাই। অগ্রহায়ণ মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি অবধি পালনীয় এটি; অর্থাৎ সৌরপঞ্জিকা অনুযায়ী এর আচারবিধি পালনীয়। অনুরূপ আরও কটি ব্রতের কথা বলি উদাহরণ হিসেবে: 'তুঁষতুষলী' (অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত এর পালন বিধি); 'নিত্-সিঁদুর' (চৈত্র সংক্রান্তিতে পরপর চার বছর করতে

হয় ) ; 'ইতু' ( কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি অবধি সব কটি রবিবার) ; 'তেজ দর্পণ' ( চৈত্র সংক্রান্তি), 'জয় মঙ্গলবার' ( জ্যৈষ্ঠ মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত সব কটি মঙ্গলবার ) 'গুপ্তধন' ( চৈত্র মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তিতে, চার বছর ধরে ) ইত্যাদি।

অন্যপক্ষে, তিথি অনুযায়ী তথা চান্দ্রপঞ্জিকা অনুযায়ী কটি ব্রতের কথাও বলি : লক্ষ্মী এবং ষষ্ঠীকেন্দ্রিক সব কটি ব্রত (ব্রত হিশেবে যারা সবচেয়ে সংখ্যাগুরু দুটি দল ) পূর্ণিমা তিথিতে এবং শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে পালিত হয়। অন্যান্য ব্রতের মধ্যে 'অক্ষয় সিঁদুর' ( বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া ), ; 'নখ ছুট্' ( চৈত্রের শুক্লা চতুর্থী ) ; 'পদ্মপূর্ণিমা' ( বৈশাখী পূর্ণিমা ) 'সংকটমোচন' ( অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষের দুই মঙ্গলবার, এখানে সৌর-চান্দ্র দুই পঞ্জিকার যৌথ প্রভাব পড়েছে ) মঙ্গলসংক্রান্তি ( ত্রিশ দিনের মাসের সংক্রান্তি. শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার, এখানে দুই পঞ্জিকার প্রভাব-সমন্বয় ) সৌভাগ্য চতুর্থী ( আশ্বিন মাসের দুর্গা-শুক্লপক্ষের চতুর্থী, চার বছর ধরে পালনীয় ) ইত্যাদি।

একটি জিনিষ লক্ষণীয়, দিন-অনুযায়ী ব্রতগুলির সঙ্গে সংক্রান্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। পক্ষান্তরে তিথি-অনুগ ব্রতসমূহের ক্ষেত্রে শুক্লপক্ষই মূল পালনীয় সময়কাল, ব্যতিক্রম শুধু শিবরাত্রি। চান্দ্রপঞ্জিকার ক্ষেত্রে শুক্লপক্ষ সম্বন্ধে আদিম সংস্কারের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করাটা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু দিনানুগ ব্রতগুলির ক্ষেত্রে সংক্রান্তির ব্যাপারটা কোন্ মানসিকতা সঞ্জাত ?

সংক্রান্তি-নির্ভর ব্রতোৎসবগুলি সম্পূর্ণরূপে যে, সৌরপঞ্জিকভিত্তিক সে কথা বলাই বাহুল্য। সৌরপঞ্জীর হিশেব চন্দ্রপঞ্জীর তুলনায় পরবর্তীকালের জিনিষ। গ্রহনক্ষত্রের সামগ্রিক গতিবিধিটার ছক যখন থেকে মানুষের আয়ত্তগত হয়েছে, তখন থেকেই সূর্যের সারা বছরের 'পরিভ্রমণে'র মানচিত্রও সে তৈরী করতে শিখেছে। চান্দ্রপঞ্জী যেমন পূর্ণচন্দ্রের রাত এবং নিশ্চন্দ্র রাতের নিশ্চিন্ত হিশেবের ওপর নির্ভরশীল, সৌরপঞ্জিকার ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। ঠিক ৩৬০ দিন পরে যে সূর্য একটি বিশেষ নক্ষত্রসঙ্ঘের কাছে ফের 'ঘুরে আসবে' —এইটে মানুষের বুঝতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছে। এর পরে আবার বাড়তি ৫ দিনের জটিল হিশেবটুকুও তাকে ঐ ৩৬০ দিনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। অর্থাৎ, গড় হিশেবে দৈনিক যে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গার ভূমিবিন্দু থেকে লম্বরেখা কল্পনা করলে সূর্য প্রায় ১° মতন সরে যায়—এটা বুঝতে পারার পর সে আকাশের নক্ষত্রবিন্যাসগুলিকে এক-একটা রাশি-নামে চিহ্নিত করেছে।

সংক্রান্তির দিন সূর্য একটি রাশি থেকে অন্য রাশিতে সম্পূর্ণরূপে সরে যায় বলে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে সংক্রান্তিকে বিশেষ দিন রূপে ধার্য করা হয়েছে।

বৈশাখ থেকে চৈত্র—এই বারো মাসে যথাক্রমে মেষ—বৃষ—মিথুন—কর্কট—সিংহ—কন্যা—তুলা—বৃশ্চিক—ধনু—মকর—কুম্ভ এবং মীন রাশিতে সূর্য বিচরণ করে বলে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান মনে করেছে। প্রত্যহ ১° করে সরতে সরতে ৩০ ডিগ্রীর একটি একক ( unit ) সূর্য 'পার' হয় ৩০ দিনে, সূর্যের এই 'সংক্রমণের' নামই সংক্রান্তি।

ব্রতের ক্ষেত্রে সংক্রান্তি দিনগুলির তাৎপর্য তাই বেশ খানিকটা পরিমাণে রাশিচক্রের আবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। পূর্বতন চান্দ্রপঞ্জী—যা আদিম অভিজ্ঞতা-প্রসূত এবং পরবর্তী সৌরপঞ্জী—যা উন্নততর বিজ্ঞানবোধ সঞ্জাত—এই দুই সংমিশ্রিত হয়েছে ব্রতপালনের সময়, ক্ষণ, তিথি, বার, দিন ইত্যাদি নিরূপণের ক্ষেত্রে। এত হিশেব ব্রতিনীরা হয়ত করেন না, কিন্তু লৌকিক ধর্মধারার ওপরে পরিশীলিত জ্ঞানচর্যার প্রতিভাস পড়ে এই ব্যাপারটা সম্ভব করে তুলেছে। ব্রত কথার প্রসঙ্গে এই লৌকিক নাগরিক অনুভাবনার বহুমানতার কথাটি মনে রাখতেই হবে

## ছয় ॥ নববর্ষ, হালখাতা এবং গণেশপূজা : উৎস ও উৎসব

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব পালনের প্রচলিত রেওয়াজটা খুব পুরোনো নয়। তাছাড়া বর্ষ হিশেবের পদ্ধতিও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক। স্বভাবতই পয়লা বৈশাখের নববর্ষ পালনকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনার তাই অবকাশ প্রায় থাকেই না। তবে নতুন বছরকে অভ্যর্থনা করার একটা প্রথা পৃথিবীর বহু সংস্কৃতিতেই আছে প্রাচীনকাল থেকেই—সে কথাটাও প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণযোগ্য।

যাযাবর জাতিগোষ্ঠীগুলি সভ্যতার উষাকাল থেকেই সময়ের হিশেব করত চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী। চান্দ্র বৎসর গণনার পদ্ধতি প্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিত সমাজগুলিতেও প্রায়শই অনুসৃত হত। কিন্তু সৌর-আবর্তনকে কেন্দ্র করেও বছরের হিশেব শুরু হয় বেশ প্রাচীনকালেই। এখন সৌর-চান্দ্র-মিশ্রিত হিশেব অনুযায়ী বিভিন্ন পঞ্জিকার বিধানই প্রচলিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে। কিন্তু ঠিক একই তারিখে যে বরাবরই সর্বত্র নববর্ষ পালন করে আসা হচ্ছে, এমন নয়। ইউরোপে একসময় বছর শুরু হত বসন্তকালে, মার্চ মাসে। প্রাচীন বাংলায় বর্ষারম্ভ হত হেমন্তে, 'অগ্রহায়ণ' নামটিই তার প্রমাণ। ফল-ফুলের মরসুম, শস্যের মরসুমকে বছরের প্রথম বলে গণ্য করার রেওয়াজটাই যে মুখ্য ছিল এটা বেশ বোঝা যায়। প্রাচীন চীনে অনেক সময়েই নববর্ষ নির্দিষ্ট তারিখে হত না—কোনো বছরে বারো, কোনো বছরে তের মাস গণনা করা হত চাঁদ ও সূর্যের সূক্ষ্ম গতির জটিলতার কারণে। ইহুদী পঞ্জিকাতেও নববর্ষ সুনির্দিষ্ট নয়।

বাংলা নববর্ষও যে প্রাচীনকালে একমাত্র হেমন্তেই হত এমন নয়। উত্তরায়ণ শুরু হত যখন—ফাল্গুনের পূর্ণিমা—তখনই বছর শুরু বলে ধরা হত এদেশে একসময়। দোল ইত্যাদি বসন্তোৎসবকে তারই স্মৃতিবাহী বলে গণ্য করেছেন কেউ কেউ। তামিল নববর্ষ পোঙ্গলও মাঘের শুরুতে।

বসন্তোৎসবের উচ্ছ্বাস এবং কিছুটা লাগাম-খোলা ভাব ইউরোপের নববর্ষের ইতিহাস খুঁজলেও পাই। খৃঃ পূঃ ৪৬ সালে জুলিয়াস সীজার প্রচলিত রোমান পঞ্জিকার সংস্কার করে জানুয়ারিতে বর্ষারম্ভ ঘোষণা করলেও পুরোনো 'স্যাটার্না-লিয়া'-জাতীয় লাগাম-ছাড়া যৌবনোৎসবের রেওয়াজটা তিনি পাল্টাতে পারেন

নি। এরই সূত্র বহন করে এখনো নিউ ইয়ার'স ইভের উৎসবে মিস্‌লটো (নকল গাছ)-এর তলায় তরুণ-তরুণীর চুম্বন বিনিময়ের বাধ্যবাধকতা থাকার প্রথাটি টিঁকে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক জীবনের নির্বাধ যৌনাচরণের পরিশীলিত সুসভ্য বিবর্তন হিশেবেই এই 'নকল' গাছের তলায় 'প্রেম' বিনিময়ের রেওয়াজটি বহমান আছে, এমন কথাও সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন অনেকেই।

আমাদের সমাজে সামগ্রিকভাবেই ইউরোপের চেয়ে রক্ষণশীলতা বেশি বলে, কালেব অগ্রগতিব সঙ্গে নববর্ষেব উৎসব-আচার থেকে ঐ রকমের রেওয়াজ-রীতিগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তরাপথের অনেক জায়গাতেই হোলিকে পৃথক কবে ফেলে আলাদাভাবে নববর্ষ হিশেবের রেওয়াজ এসেছে সম্ভবত এই ধরনের 'লাইসেন্স' দেবার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সামাজিক মানসিকতা থেকে। চৈত্র পূর্ণিমার পর দিন অনেক অঞ্চলেই বর্ষারম্ভ। কার্তিক পূর্ণিমার পরদিনও নেপাল ও অন্যান্য অঞ্চলে বছর শুরু হয়। কিন্তু উৎসবেব চরিত্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের সর্বত্রই—শুধু ভারতে নয়—একধবনের যৌবনোৎবের চেয়ে অন্নোৎসব রূপেই ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

জাপান বলুন, চীন বলুন, সিংহল বলুন, সর্বত্রই নতুন শস্য, নতুন ফল-কে কেন্দ্র করে উৎসব চলে। এ জিনিস মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি অঞ্চলে এবং উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদেব অজস্র গোষ্ঠীব, যেমন ইরোকোয়া, ব্লোহোমিশ, স্যালিস, চিপ্পেওয়া প্রভৃতি মধ্যেও এই উপলক্ষে অন্নোৎসবটাই মুখ্যতর বলে গণ্য। সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশেও ব্যাপারটা অনেকটা তাইই। পোঙ্গলের মূল উৎসবটাও নূতন অন্নভিত্তিক।

অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার মূল আর্থনীতিক ভিত্তি যা, সেই শস্য যখন নতুন থাকে, তখনকার চন্দ্র-সূর্যের অবস্থানকে তিথিগতভাবে হিশেব কবেই একদা পৃথিবীতে নববর্ষ পালন করার প্রথা চলিত হয়েছিল। শস্য ঘরে তোলা উপলক্ষে আদিবাসীদের মধ্যে যে ধরনের উচ্ছ্বাস উৎসব দেখি, তারই সমধর্মী নববর্ষের উৎসব। উর্বরতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরই লব্ধফল এটি। আদিম থেকে প্রাচীন, তার থেকে মধ্যযুগ—এমনকি একাল অবধি মানুষের মনে যে জাদুবিশ্বাস সক্রিয় ছিল এবং আছে, উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান তাকেই প্রতিফলিত করে। চীনে একসময় পুরনো বছরের প্রতীক কাগজের ড্রাগন পুড়িয়ে 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'কে ভস্মসাৎ করাই হোক, আমাদের বিঘ্ন-বিনাশন (একদা বিঘ্ন-রাজ) গণপতির পূজা করাই হোক, আর পশ্চিম আফ্রিকার কোনো কোনো

উপজাতির মধ্যে নতুন ফসল, নতুন বছরের মঙ্গল কামনায় ক্ষেতে নারী-পুরুষের মিলনোৎসবই হোক—সবের পেছনেই সেই জাদুর প্রত্যয়। জাপানী নববর্ষ উৎসবের একটি প্রথায় এ দুয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে : নতুন শস্যের সম্ভার ঘরে তুলে দুটি পিঠে বানানো হয়—একটি 'পুরুষ', অন্যটি 'নারী'। এদের প্রতীকী মিলনের মধ্যেই নববর্ষের উৎসবের পূর্ণ তাৎপর্যটি নিহিত থাকে সেখানে।

॥ ২ ॥

বাঙালীর নববর্ষের দুটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য : হালখাতা এবং গণেশমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা। এ দুটিই বর্তমানে ব্যবসায়ী সমাজের প্রায় অবশ্য-পালনীয় প্রথা। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, কোনো-কোনো ব্যবসায়ী আবার বৈশাখেই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গদীতে গণেশ বসান। গণেশ-প্রতিষ্ঠার মধ্যে অবশ্য বেশ কিছু সুপ্রাচীন লোকায়ত সংস্কার আছে : সে কথায় পরে আসছি। তার আগে হালখাতার প্রসঙ্গ।

এটি মূলতই মোগল আমলের রাজ্যশাসন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আকবরের আমল থেকে বাদশাহী রাজস্ব এবং তহশীল-ইত্যাদি বিষয়ে হিশেব-নিকেশ করা হতো মুসলিম চান্দ্রবর্ষ-তথা-হিজরির দিন সন প্রভৃতির অনুযায়ী। ফসলই যেহেতু ছিল রাজস্বের প্রধান মাধ্যম, তাই এই সন-তারিখের নূতন হিশেবের প্রচলিত নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ফসলী'। রাজস্ব আদায়ের নির্দিষ্ট তারিখরূপে প্রতিষ্ঠিত হল বছরের প্রথম দিন—সংস্কৃতনবীশরা আবার তার নাম দিয়েছিলেন 'পুণ্যাহ' অর্থাৎ 'পুণ্য দিন' ( প্রজার রক্ত শুষে খাজনা আদায় করার নির্দিষ্ট দিনটি অবশ্যই 'পুণ্য দিন' বৈ কি ! )।

কিন্তু হিজরি সন চাঁদের চলাফেরার নিয়মে হিশেব করা হয় বলে, তার বার্ষিক দিনসংখ্যা হল সূর্যের আহ্নিক-ও-বার্ষিক গতির ওপর নির্ভরশীল সর্বজনীনভাবে গৃহীত ৩৬৫ দিনের বছরের চেয়ে ১১ দিন কম। এর ফলে আদায়ের হিশেব-পত্র প্রতিবছর বঙ্গাব্দের ( যা ব্যাপকতর ভাবে প্রচলিত ছিল ) সঙ্গে গরমিলে পড়তে থাকায়, অবশেষে বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখকেই খাজনা-ইত্যাদি আদায়ের নির্দিষ্ট দিনরূপে স্থির করা হল। ব্যবসায়ী মহলে ঐ রেওয়াজটিই হালখাতায় পরিণতি লাভ করেছে পরবর্তী কয়েক শত বছরে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য : দক্ষিণ ২৪-পরগণার নানা জায়গায় হালখাতা হয় চৈত্রের মাঝামাঝি ; কারণ অজ্ঞাত।

মহারাষ্ট্রের মতো অবশ্য গণেশ চতুর্থী ( ভাদ্রমাসে ) পালনের সঙ্গে তুলনীয়-ভাবে ব্যাপকভাবে গণেশপূজা বাংলাদেশে হয় না। গণেশ পূজা এবং তাঁর মূর্তি বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে প্রাক্-মুস্‌লিম কালের কিছু সংস্কার-বিবর্তনের আকর্ষণীয় একটি ইতিহাস লুকিয়ে আছে। পরবর্তী কালের 'সিদ্ধিদাতা' এই গণেশ ওরফে গণপতি কিন্তু আদিতে গণ্য হতেন 'বিঘ্নরাজ' হিশেবে। গণেশই ধ্রুবপদী ভারতীয় দেবদেবীদের মধ্যে ( বিষ্ণুর নৃসিংহাবতার রূপ ছাড়া ) একমাত্র পশু-মানব-সমন্বিত মূর্তি। এককভাবে পার্বতী কর্তৃক গণেশকে জন্মদানের যে পৌরাণিক বিবরণ কালক্রমে প্রচলিত হয়েছে, তার আদি-কাঠামো ওরফে আর্কিটাইপ বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে ইনি প্রথমে কোনো পার্বত্য জাতি ( 'পার্বতীপুত্র' কথাটি স্মরণযোগ্য )—যাদের কুলপ্রতীক ছিল হাতী, তাদের উপাস্য দেবতা। গণেশ যে মূলে প্রাগার্য দ্রাবিড়ভাষী জাতি-কোমের দেবতা, একথা অনেক পণ্ডিতই বলেছেন।

পরবর্তী সময়ে সামাজিক দ্বন্দ্বের বিবর্তনে সমন্বয় সৃষ্টি হল যখন, তখন পশু এবং মানুষের মূর্তিরও প্রতীকী সমন্বয় ঘটল। ইঁদুর বাহন সম্ভবত সেই ভিন্নতর যে দ্বন্দ্বশীল গোষ্ঠীর নরদেহী-দেবতা, তার বাহন ছিল—ওরফে তাদের কৌলিক টোটেম ( পশু-প্রতীক ) ছিল পার্বতীর 'ইম্যাকুলেট কনসেপশ্যন'-জাত পুত্র গণেশকে শিবপুত্র রূপে গ্রহণ করা, তাঁকে আর্যীকরণ বা এরিয়ানইজেশ্যনেরই দ্যোতক বলে ধরা যায়, যদিও শিবও মূলে ছিলেন প্রাগার্যভাষীদেরই দেবতা, হরাপ্পা-সংস্কৃতির শীলমোহর তার পরিচয়বাহী।

গণেশ নামের তাৎপর্যটির অন্বেষণও এখানে প্রাসঙ্গিক। 'গণ' শব্দের মৌলিক অর্থ ট্রাইব বা আদিবাসী কোম। প্রাচীন ভারতে 'গণ' রাষ্ট্রগুলিতে ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্যানুসারী বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণী সমাজের পরিবর্তে একধরনের সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র- প্রচলিত ছিল। যেগুলিকে ধ্বংস করার 'প্রয়োজনীয়' স্বার্থ সম্পর্কে কৌটিল্য বহু কথা লিখেছেন তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে'। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বহির্ভূত এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো দেবতাই 'গণেশ' বা 'গণপতি'-রূপে গণ্য হতেন। পঞ্চাশ প্রকরণের গণপতি-মূর্তি কল্পনা ঐ বিভিন্ন 'গণ' রাজ্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উৎসজাত হয়ত বা। এই রাষ্ট্রগুলির গণতান্ত্রিক চরিত্রই ছিল শ্রেণীশোষক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির আওতাভুক্ত অন্য রাষ্ট্রগুলির সামাজিক শাসন-শোষণের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। তাই গণেশ আদিতে 'বিঘ্নরাজ' বলেই গণ্য হতেন।

পরবর্তীকালে গণরাষ্ট্রগুলি যখন অবশেষে বিধ্বস্ত হয়ে যায় তখন সংস্কৃতি-তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের দেবতা, অভিজেতা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বলয়ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির দেবমণ্ডলে রূপান্তরিত চরিত্রে গৃহীত হলেন। গণেশের 'বিঘ্নকারী' চরিত্রকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ভুলে যাওয়া হল। তিনি পরিণত হলেন সিদ্ধি-দাতায়। তাঁর শিবপুত্ররূপে স্বীকৃতি এবং হস্তীমুখকে ইন্দ্রের বাহনের ছিন্নমুণ্ড রূপে কল্পনা ইত্যাদি-বিষয় তাঁকে 'জাতে' তুলল! 'সিদ্ধম্' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'অক্ষর'; লিপি প্রচলন করার ব্যাপারে তাঁকে স্মরণ করা হতে লাগল এবং বিজিত গণরাষ্ট্রগুলির মানুষের সঙ্গে কার্যকরী একটা সমন্বয়-ব্যবস্থা হিশেবেই সব পূজার আগে গণেশ পূজা বিহিত হল সম্ভবত। নব বর্ষারম্ভে সর্বকর্মের প্রাক্কালে গণেশ পূজার উৎসও সেখানেই নিহিত।

গণেশ যে মূলত অব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বলয়ভুক্ত দেবতা ছিলেন, তার একটি হদিশ মেলে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার নানান্ অঞ্চলে প্রচলিত একটি লোকপুরাণ-বৃত্তের কাহিনীতে। শনির দৃষ্টিতে মুণ্ড উড়ে যাবার পর ঐরাবতের মুণ্ড এনে গণেশের দেহে বসানোর যে ধ্রুবপদী পুরাণের গল্প প্রচলিত আছে, ঐ লোকপুরাণ কথায় তার পরিপূরক পরবর্তী অংশটুকু গড়ে উঠেছে। গণেশের আদি মুণ্ডটিই (স্থানীয় সংস্কার-অনুযায়ী) বারাঠাকুর রূপে গৃহীত এবং উপাসিত হয় ঐ সব অঞ্চলে। এই লৌকিক দেবতা বারাঠাকুরের সঙ্গে গণেশের অভিন্নতা কল্পনা, পরিশীলিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাবজাতও হতে পারে। তবে, বিপরীতটা হওয়াও অসম্ভব নয়; অর্থাৎ গণেশ আদিতে লৌকিক দেবতাই ছিলেন—সেদিক থেকেও 'গণেশ' নামটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়।

পুরাণবৃত্তের অর্বাচীন স্তরে গণেশের স্ত্রী হিশেবে সিদ্ধি ও বুদ্ধিকে নির্দেশ করা হলেও, প্রাচীনতর গণেশভাবনায় লক্ষ্মী হলেন তাঁর নর্মসহচরী; লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিথুন মূর্তিতে গণেশকে দেখাও যায় (যার বিবর্তন জাপান ও চীনদেশের গণেশ ও তাঁর সঙ্গীর যুগলমূর্তি কুঅন-সি-ত্যেন বা কঙ্গি-তেনে ঘটেছে); ঠিক অনুরূপ মিলনোৎকণ্ঠিত ভঙ্গীরত ভাবে গণেশের ও-লক্ষ্মীর যুগল ধ্যানমূর্তিও কল্পিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ধর্মতাত্ত্বিকরা এই লক্ষ্মী, শিব-পার্বতীর কন্যা নয় বলে প্রাগ্রসর সমাজের সংস্কারানুযায়ী ব্যাখ্যা করলেও, আদিমতর সমাজের কোনো কোনো গোষ্ঠীতে অনুসৃত ভাই-বোনের বিবাহে 'ট্যাবু' না থাকার সূত্রও এই লক্ষ্মী-গণেশ কল্পনার মধ্যে থাকতে পারে। দুর্গাষষ্ঠীব্রতের একটি গল্পে যে দেখা যায় নারায়ণই দুর্গার স্তন্য পানের লোভে দেবীর নির্মিত

পুতুলের মধ্যে প্রবেশ করেন, যা জীবন্ত হয়ে গণেশ নামে পরিচিত হয়, সেই গল্প গড়ে ওঠার পিছনে গণেশ লক্ষ্মী-সংক্রান্ত এই সমস্যার সূত্র থাকা সম্ভব। নববর্ষের উৎসবের সূত্র ধরে গণেশপূজার তাৎপর্য প্রসঙ্গে এত 'অশাস্ত্রীয়' কথা বলার কারণটুকু এ অধ্যায়ের পরিশেষে বলতে হবেই; সে জবাবদিহিটুকু পাঠককে দিতেই হবে বর্তমান লেখককে। নববর্ষের উৎসবের মধ্যে যে অর্বাচীনকালের লোকবিধির সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণাতীতকালে লৌকিক সংস্কার রূপান্তরিত বা পরিশীলিতভাবে চলে আসছে, গণেশপূজার আনুপূর্বিক ধারাক্রমটি বিশ্লেষণ করলেই সেটি বোঝা যায়। বর্ষবোধনের বিশ্বজনীন লোকবিধি ত মানা হচ্ছেই; মধ্যযুগকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য-রাজস্ব-ইত্যাদি-নির্ভর সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্ট হালখাতার ব্যাপারটাও এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর্থনীতিক বিবর্তনের পথ ধরে: আর গণেশপূজার মধ্যে সুপ্রাচীন কোমসমাজের বিবিধ বিধি এবং সংস্কার এসে সমাবৃত হয়েছে। এই সবকিছুর সমন্বয়েই বাঙালীর নববর্ষ যথা-অর্থ একটি প্রধান লোক-উৎসব রূপে গড়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রে গণেশচতুর্থীতে যে গণপতি-উৎসব হয়, তার প্রেক্ষিত আলাদা; গণেশ সেখানে হিন্দু ক্ষাত্র শক্তির প্রতীক; বাংলার গণেশের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে অন্তত চরিত্রগত অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে, এ কথা স্মরণযোগ্য।

## সাত ॥ জামাইষষ্ঠী : সংস্কৃতি-বিবর্তনের দর্পণ

প্রকৃতপক্ষে, ভাইফোঁটা এবং জামাইষষ্ঠী এই দুটি অনুষ্ঠানের প্রসার বাঙালীর অন্তঃপুরে যতখানি ব্যাপক, সেই অনুপাতে এদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবানুষঙ্গ খুবই কম। যেটুকু আছে, তাও প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উৎসজ সংস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, প্রাচীনতর লৌকজীবনের প্রতিভাস এর মধ্যে বিম্বিত হয়েছে, আদিম অরণ্য জীবনের অধুনাবধি প্রসারিত রূপান্তরিত এক মূর্তিতে। ভাইফোঁটার কথা যথাকালে আলোচনা করব। আপাতত, জামাইষষ্ঠী : স্বজনোৎসব বলতে বাঙালীর সমাজে যা প্রচলিত, তার অন্যতম, অন্যতরটি, বলাই বাহুল্য, ঐ ভাইফোঁটা।

এখনি জামাইষষ্ঠীকে, আদিম আরণ্যজীবনের রূপান্তরিত প্রতিভাস বলেছি। এই পার্বণের অবশ্যষষ্ঠী নামটিই, সেই বক্তব্যের সমর্থনে প্রথম সাক্ষ্য। ঐ নামের বিশ্লেষণ দিয়েই আলোচনা শুরু করি বরং। এক অর্থে, জামাইষষ্ঠীও একটি ব্রত এবং বহু ব্রতের অনিবার্য আঙ্গিকস্বরূপ এরও 'কথা' বা গল্প আছে, তাও আবার একটি নয়, দুটি।

যে-কোনো রকমের ষষ্ঠীপূজার সঙ্গে বেড়ালের একটা গভীর নিবিড় যোগাযোগ যে আছেই, তা তো সর্বজনের জানা। স্বভাবতই, সন্তানকামনা এবং তার মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর পূজা-ব্রত ইত্যাদির পূর্ণায়ত রূপটি মেলে। সম্ভবত বহু সন্তান হয় বলেই এবং সচরাচর অপঘাতে-মারা পড়ে না এই কারণেও বটে, বেড়ালকে সন্তানদায়িনী-ও-রক্ষাকারিণী দেবী ষষ্ঠীর বাহনরূপে গণ্য করা হয়েছে। দেবমূর্তির বিবর্তনতত্ত্ব-অনুসারে আদিতে বেড়ালই যে ছিল আরাধ্য দেবতা, পরবর্তীকালে নারীমূর্তিধারিণী মাতৃকাদেবী ষষ্ঠীর বাহন হিশেবে তার পদাবনতি ঘটেছে যে, একথা মেনে নেওয়া যায়।

অর্থাৎ, একদিকে বেড়াল ছিল একসময়ে গোষ্ঠীগত ভাবে একটি কুলপ্রতীকী পশু ( টোটেম ), পরে উর্বরতাতান্ত্রিক ধর্মধারার বিকাশ ঘটলে ধীরে-ধীরে তার ক্রিয়াকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়ে সন্তানকামনা ও রক্ষণের প্রতীকে পরিণতি ঘটেছে। তবে, বেড়ালকে মারতে নেই—এই নিষেধাত্মক সংস্কারের ( বা 'ট্যাবু'-র ) মাধ্যমে তার প্রাচীনতর টোটেম-সুলভ মর্যাদার অনেকখানিই রক্ষিত

আছে। অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের গল্পেও সেই ট্যাবু-ভাবনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখি আমরা।

ব্রতের কাহিনীতে আছে যে, বাড়ির ছোটবউ লোভে পড়ে মাছ-দুধ সব লুকিয়ে খেয়ে ফেলে কালো বেড়ালের নামে দোষারোপ করত। এর শোধ নেবার জন্যে বেড়াল যতবারই ছোটবউয়ের কোলে ছেলে আসে, রাত্রিবেলা লুকিয়ে চুরি করে বনের মধ্যে ষষ্ঠী ঠাকরুণের বটতলার থানে রেখে দিয়ে যায়। এইভাবে ছোটবউয়ের ছ'-ছটি ছেলে-মেয়ে খোয়া গেলে, সবাই তাকেই রাক্ষসী বলতে লাগল। সাতবারের বার বেড়াল যখন আবার বাচ্চা চুরি করে পালাচ্ছে তখন ছোটবউয়ের ঘুম ভেঙে যাওয়াতে সে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাতের কাঁকন ছুঁড়ে মারল বেড়ালের গায়ে আর অমনি তার পিঠ কেটে রক্ত পড়তে লাগল। আর সেই রক্তের দাগ ধরে-ধরে বউ গিয়ে পৌঁছল বনের মধ্যে সেই বটতলায়। তারপর ষষ্ঠীর আদেশে বেড়ালের পায়ে ধরলে তখন দেবী দয়াপরবশ হয়ে ছোটবউয়ের সাতটা বাচ্চাকে ফেরৎ দেন, তারপর কাঁকে-পো কোলে-পো হয়ে বউ ত বাড়ি ফিরল। সবাই দেবীর এবং তার বাহনের ব্যাপার শুনে উৎসাহী হয়ে, ষষ্ঠীঠাকুরাণীর পুজো এবং বেড়ালের যত্ন-আত্তি করতে শুরু করল।

দেবীর বরে সবাই পুত্রকন্যা লাভ করল। ছেলেমেয়েরা বড় হলে তাদেরও বিয়ে-থা হল এবং যে-তিথিতে ছোটবউ মেয়েকে খুঁজতে-খুঁজতে বনের মধ্যে গিয়েছিল, সেই তিথিতে প্রতি বছর ছেলে এবং জামাইদের আদর করে সবাই আম-কাঁটালের বাটা সাজিয়ে খেতে দিতে লাগল। এই পার্বণের নাম তখন থেকে হল অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী।

স্পষ্টতই, এই গল্পের আদি-কাঠামো-অনুযায়ী হলেন অরণ্যচারিণী কোনো দেবী। বেড়ালের পায়ে ধরার যে-উল্লেখ এতে আছে, তার থেকে বোঝা যায় যে, সেও এই দেবীর উপাসকদের কাছে দেবতাকল্প। বটের ডাল মাটির চাপড়ার মধ্যে পুঁতে ঘট বসানোর যে-রেওয়াজ সমস্ত ষষ্ঠীপুজোর মধ্যেই দেখা যায়, সেটিও তাঁর আদিকালের আরণ্য-উৎসের স্মৃতিবাহী। বাঁশের পাতা সাজানো, আম কাঁটাল এবং অন্যান্য ফলমূল বাটায় সাজিয়ে খেতে দেওয়া এ সবই একই উপলক্ষজাত। তালপাতার পাখা দিয়ে ছেলে-মেয়ে-জামাইদের হাওয়া করার যে-রেওয়াজ পূর্ববঙ্গীয় লোকাচারে আছে, সেটিও মূলত অতীতকালের আরণ্য-সমাজের রীতির অনুবর্তন : বনের ধারের তাল গাছের পাতার স্নিগ্ধ

ব্যজনের প্রতিকল্প আর কি! বাটার সঙ্গে ছোট-ছোট তালপাতার পাখা এবং তালপাতার কাঠিতে তৈরি ধনুক বাণ সাজিয়ে দেবার প্রথা কোথাও-কোথাও যে এখনো দেখা যায়, সেও সম্ভবত ঐ একই কারণে। ষষ্ঠীর পূজোয় ব্যবহৃত শোলোক-তথা-মন্ত্রেও এরই প্রতিভাস দেখি: 'আইলাম গো মরণে, মা ষষ্ঠীর বরণে।'

॥ ২ ॥

জামাইষষ্ঠীর ভিন্নতর যে ব্রতকথাটি প্রচলিত আছে, সেটির মধ্যে অনেক অগ্রসব সমাজের ভাবনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। স্বামীর বাণিজ্য-প্রবাসকালে শ্বশুরবাড়িতে অবহেলিতা পুত্রহীনা নারীব দেবী ষষ্ঠীর মহিমায় সন্তানলাভ হয়। সেই সন্তানের স্ত্রী দেবার জন্য নিবেদিত 'বাটা' আগে গ্রহণ করায় শাপগ্রস্তা হয় এবং তার ছয় ছেলে জন্মের পবেই মারা যায়। তখন সেই হতভাগিনী নারী আত্মীয়-স্বজনের হাতে লাঞ্ছিতা হয়ে আবার সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় বনে গিয়ে বাস করতে থাকে। এক বিদ্যাধর সপ্তম সন্তানরূপে জন্মা-বাব পব বিদ্যাধরীরা তাকে প্ররোচিত করে নিদ্রিতা মাকে ছেড়ে চলে আসার জন্যে। শিশু-বিদ্যাধর'শাস্ত্রবচন' উদ্ধৃত করে মাকে ছেড়ে যাওয়াব অনৌচিত্য বুঝিয়ে বললে বিদ্যাধবারা ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যায়।

অতঃপর কাঠুবিয়াদের সাহায্যে মা এবং ছেলে বাড়িতে ফিরল এবং বাড়ির লোকে নানান্ অদ্ভুত শর্ত পূরণ করার পর বিদ্যাধর স্বস্থানে ফিরতে চাইলে তার মা তাকে নিরস্ত করে এবং ষষ্ঠী ঠাকরুণেব পুজো করে। দেবীর মাহাত্ম্যে বিদ্যাধর নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়ে মায়ের কাছে থেকে যায়।

আগের গল্পটির তুলনায় এটি নিঃসন্দেহে খাপছাড়া এবং অগোছালো। শাস্ত্রবচন ইত্যাদির দোহাই দওয়া এবং মৃতবৎসাকে পবিবারের অন্যদের পবি-হার কবা ইত্যাদি ব্যাপার অনেক 'উন্নত' ওরফে জটিল সামাজিক মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। অবশ্য আগের গল্পটিব চেয়ে এর সামাজিক পরিবেশ অনেক অপ্রাচীন, তার হদিশ তো বাণিজ্যযাত্রার উল্লেখেই মেলে। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে তাই প্রথমটিরই গুরুত্ব বেশি।

কিন্তু একটি প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে: ছেলে-মেয়ের জন্ম এবং নিরাপত্তা বিধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠীর পুজো উপলক্ষে জামাইয়ের ভূমিকাটি কি? জামাইকে পুত্রতুল্য ধরে নিয়ে এই ব্রত পালিত হয় এমন মনে করা চলে

হয় ত বা ; কিন্তু, সে ক্ষেত্রে কন্যার তুলনীয়া পুত্রবধূরাই বা বাদ পড়ল কেন ? শাশুড়ী বউয়ের চিরাচরিত অপ্রণয়ই কি এর কারণ ? নইলে তৃতীয় প্রজন্মের আগমনের উৎসে জামাতা এবং পুত্রবধূ—উভয়ের ভূমিকাই ত সমতুল্য !

এসবের উত্তর খুঁজতে হলে আবার কৌম জীবনের বিস্মৃত উৎসের মধ্যে সন্ধান চালাতে হয়। জামাই, সে অন্য কৌম থেকেই আসত এবং বিয়ের ব্যাপারটা সভ্যতার প্রথম আমলে ছিল হরণমূলক, যার নাম 'রাক্ষস' বিবাহ। এই হরণের ব্যাপারটা প্রায়শই বিনা লড়াইতে হত না ; বিবাহ উপলক্ষে ধাঁধা শুধোনো, জামাই-ঠকানো ইত্যাদি তার অনুষঙ্গরূপে স্মৃতিতে বয়ে চলেছে। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষেও কোনো-কোনো জায়গায় ( যেমন, ডোমকল ) দই নিলামে তোলার সূত্র ধরে কাদা খেলার রেওয়াজ আছে। যে জামাইরা ডাক দিতে-দিতে দইয়ের নিলামে হাল ছেড়ে দেন, তাঁদের গায়ে কাদা মাখিয়ে রঙ্গ করা হয় এবং গ্রামের যে জামাইটি শেষ পর্যন্ত দই কিনতে সমর্থ হন সবচেয়ে বেশি দর দিয়ে, তাঁকে নিয়ে তখন হুল্লোড় চলে। মূলত, শ্যালিকা, শালাজ এবং অনুরূপ সম্পর্কীয়ারাই এই জামাইষষ্ঠীর দই-কর্দম খেলায় যোগ দেন।

এটা একদিক থেকে আদিম ঐতিহ্যবাহী এক-ধরণের ছাড়পত্র-দেওয়া নারী পুরুষের অবাধ মিলনোৎসবের সূচক বলে যেমন গণ্য হতে পারে ( দই এবং কাদা, দুটিই বিশিষ্ট প্রতীক ), অন্যদিকে কাদা মাখিয়ে জামাইদের লাঞ্ছিত করা অথবা কল্পনাতীত দাম হেঁকে বিড়ম্বিত করার অন্তরালে 'হরণ'-কালীন দ্বন্দ্বের মানসিকতার অবশেষই প্রত্যক্ষ হয় না কি ! এই সবের পর জামাতাদের আপ্যায়নের পর্ব শুরু হয়।

অধিকাংশ জায়গাতেই এই ধরণের কৌমজীবনের 'রাক্ষস' বিবাহকালের লড়াইয়ের ট্র্যাডিশ্যনটুকু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরের অংশটুকু, যথা বিয়েটা একবার ঘটে গেলে জামাইকে মেনে নেওয়া—সেই বাস্তববুদ্ধির পথ ধরেই জামাইয়ের আবির্ভাব ঘটেছে অরণ্যষষ্ঠীর উদ্যানে। অন্য ষষ্ঠীর উপলক্ষগুলি ছেলেমেয়েদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হলেও, অন্তত একটি ষষ্ঠী ব্রতে জামাইকে মুখ্য স্থান দিয়ে আদিম কৌম সমাজের প্রতিহিংসু মন থেকে সভ্যতার পথে অগ্রগমনের পরিচয়ই সুপরিস্ফুট হয়েছে।

## আট ॥ রথযাত্রা : সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিচিত্র নিদর্শন

রথারোহী ইন্দ্রের কল্পনা ঋগ্বেদে আছে ; বৌদ্ধ সামাজিক উৎসবেও রথে করে বুদ্ধমূর্তিকে নিয়ে পথ-পরিক্রমার কথা আছে। কিন্তু ওড়িশা এবং বাংলায় যেভাবে রথযাত্রা উৎসব বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে এর মধ্যে অন্যান্য প্রচলিত পার্বণের মতো প্রাগিতিহাসের কাল থেকে সূত্রান্বেষণ করা খুব কঠিন বলেই মনে হয়।

অথচ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সংস্কৃতিবিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী অন্বেষক মাত্রেই খানিকটা সন্ধিৎসা দেখালে রথ-উৎসবের অন্তর্লীন স্মরণাতীত কালের থেকে বহমান বহু বিচিত্র বিশ্বাস এবং তাদের সম্পৃক্ত রীতি, আচার ইত্যাদির হদিশ পাবেন।

শুরুতেই রথ উৎসবের কেন্দ্রীয় ত্রিমূর্তি—জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের প্রসঙ্গ বিচার্য। জগন্নাথ দেবতার উদ্ভব সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে, কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়নি। দেহাবশেষ স্বরূপ তাঁর অস্থিগুলি একত্র করে কয়েকজন কৃষ্ণভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দান করেন। বিষ্ণুর আদেশে তাঁর নির্মিয়মান নিমকাঠের মূর্তির মধ্যে ঐ অস্থিগুলি রাখার ব্যবস্থা করেন রাজা। বিশ্বকর্মা ঐ মূর্তি তৈরীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রাজার ব্যস্ততায় বিরক্ত হয়ে মূর্তির মধ্যে অস্থি স্থাপন করার পরই বিশ্বকর্মা চলে যান হাত-পা ইত্যাদি না নির্মাণ করেই। তখন ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে রাজা তাঁর বরে মূর্তির চোখ, দৃষ্টি এবং প্রাণের সংস্থান করেন। এই গল্পেরই ভিন্নতর একটি অনুষঙ্গ আছে : বসুশবর নামে এক অরণ্যচরের উপাস্যদেবতা নীলমাধবের কাষ্ঠ-মূর্তির মধ্যেই বিশ্বকর্মা কৃষ্ণের অস্থিগুলি সন্নিবিষ্ট করেন। ঐ মূর্তির হাত-পা-ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এই মূর্তিই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জগন্নাথ রূপে পূজা করেন। এখনও স্থানীয় আদিবাসীরা—যাঁরা শবরবংশীয় বলে দাবী করেন, জগন্নাথ পূজায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নাম তখন হয় দয়িত।

স্পষ্টতই, এই সব প্রচলিত কাহিনীর অন্তরালে কয়েকটি আদিম সংস্কার ও ঐতিহ্যবোধ সক্রিয় আছে : প্রথম, মৃতের অস্থি পুনঃ-সংযোজন করে নতুন

কলেবর গড়ে আবার তাতে প্রাণসঞ্চার করা যায় ; দ্বিতীয়, বৃক্ষপ্রাণ মূর্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয় ; তৃতীয়, জগন্নাথ, মূলে ছিলেন আরণ্যক কোনো জাতির ( শবর হতে পারে, হওয়া সম্ভব ) উপাস্য দেবতা। আদিম দেবতাসুলভ রূপটি তাঁর মূর্তিতে প্রকট—হাত নেই, পা নেই, একখণ্ড কাঠের মধ্যেই মুখ চোখ আঁকা। হুবহু, 'টোটেম পোল'-জাতীয় জিনিষ—রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যাবার দরকার নেই, আমাদের মধ্যভারতের গোন্দ্, মুরিয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যেও এই জিনিষ আছে ; স্মৃতিশীল পাঠক বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' বইটির কথা স্মরণ করবেন। মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেই এই ধরনের ছুঁচলো এক ধরনের উপাস্য মূর্তিকে ফ্যালিক সিম্বল যা পুরুষত্বচিহ্নের প্রতীক বলে নির্দেশ করেছেন।

তা যদি হয়, তা হল জগন্নাথের মূর্তি একদিক থেকে বিচার করলে, উর্বরতা-তন্ত্র-তথা ফার্টিলিটি কাল্টের দ্যোতক। ত্রিমূর্তির দ্বিতীয় পুরুষ, বলরাম প্রসঙ্গে এই সূত্র ধরেই আসা সম্ভবপর। বলরাম-বা-হলধর, কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই বলে পুরাণে প্রথিত। হল, অর্থাৎ লাঙ্গল ধারণ করেন যে দেবতা স্বয়ং, তিনি কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত নিঃসংশয়ে ; কৃষ্ণ নামটির মধ্যেও অবশ্য সেই ব্যঞ্জনা আছে। তা ছাড়া বলরাম অনন্তনাগ বা শেষনাগের অবতার বলেই গণ্য ; সেদিক থেকেও তিনি এক অর্থে উর্বরতা কাল্টের সঙ্গে যুক্ত, সাপ যেহেতু পুরুষত্বের দ্যোতক বলে পরিগণ্য হয়।

অতঃপর সুভদ্রা। পরিশীলিত পৌরাণিক কাহিনীতে সুভদ্রা অর্জুনের পত্নী ; কৃষ্ণের সহায়তাতেই তাঁকে অর্জুন হরণ করে নিয়ে যান। এই পৌরাণিক সূত্র ধরলে রথযাত্রা উপলক্ষে একই সঙ্গে তিন ভাই বোনের পূজার্চনা ইত্যাদি হয়ে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের দিক থেকে অভিনব এবং সম্ভবত, তুলনাবিরহিত একটি নিদর্শন। কারণ, লোকজীবনে যেখানেই মূর্তি উপাসনার মাধ্যমে ধর্মাচার পালন করা হয়, সেখানে ভাই-বোনের যুগল মূর্তি কল্পনা করে কোনো দেবতার অর্চনার হদিশ মেলে না—অন্তত এই লেখকের তেমন নজীর জানা নেই।

॥ ২ ॥

সচরাচর যুগল মূর্তি থাকলে, পুরুষ-প্রকৃতি এই রকমই কল্পনা করে আসছি আমরা সেই প্রত্ন-ইতিহাসের কাল থেকে : শিব-শক্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা ইত্যাদি। অথবা, মাতা-পুত্র এই রকমও কল্পনা করা হয়ে থাকে

বিভিন্ন ধর্মে ; যেমন : আইসিস-হোরাস, মেরী-যীশু, পার্বতী-গণেশ, যশোদা-কৃষ্ণ মায় বনবিবি-দুখে, নারায়ণী-বারাঠাকুর ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুইবোন একত্রে দেখা যায় ( ওলাবিবি-ঝোলাবিবি), সাতবোনও ( পৌরাণিক সপ্তমাতৃকা কিংবা লৌকিক সাতবৌনি বা সাতসিনি ইত্যাদি স্মরণযোগ্য )।

তাহলে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম এই ত্রয়ীকে নিঃসন্দেহে দেবভাবনার বিশ্বজনীন চরিত্র যা, তার অন্তর্লীন কাঠামোতে ( ইনফ্রা-স্ট্রাকচার ) ফেলে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না। ক্রিশ্চানদের হোলি ট্রিনিটি, হিন্দুদের ত্রিদেব এবং বৌদ্ধদের ত্রিশরণ নিতান্তই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক চিন্তার এবং পরিশীলিত একটি দর্শনচেতনার ফলশ্রুতি। এই রথযাত্রা উৎসবের মধ্যে বৌদ্ধ রথযাত্রার প্রভাব থাকা অসম্ভব নয় ; প্রচলিত একটি কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধের দাঁত নাকি জগন্নাথের মূর্তির অভ্যন্তরে লুকোনো আছে, বারো বছর অন্তর মূর্তির বদল যখন হয়, তখন ঐ নবকলেবরের মধ্যে সঙ্গোপনে সেটি চোখ-বাঁধা অবস্থায় সুরক্ষিত করে রাখেন প্রধান সেবায়েত।···এটা গল্পই নিঃসন্দেহে ; কিন্তু বৌদ্ধ একটা প্রভাব এর মধ্যে আছে সন্দেহ নেই। চীনে বুদ্ধমূর্তিকে রথে চড়িয়ে ঘোরানোর রেওয়াজ একদা ছিল ; ব্রহ্মের বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি চেহারায় জগন্নাথের রথেরই সমধর্মী এবং রথের রশি টানতে অধিকারী সকলেরই—জাতি, বর্ণ, ধর্ম, কুলীন, অচ্ছুৎ বলে সেখানে প্রভেদ নেই। যদিও মন্দিরে প্রবেশাধিকারী সবাই নন ব্রাহ্মণ্য-সংসার-বিধি অনুযায়ী ( পুনশ্চ 'শবর' প্রসঙ্গ ; তাঁদের অবতংসরা কিন্তু এই অধিকার পান, পূজার ক্ষেত্রেও )। এই সব মিলিয়ে রথ, জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম এবং রথযাত্রার মধ্যে বৌদ্ধ অনুষঙ্গ যে কতকটা আছেই, তাতে আর সন্দেহ কি! দশ অবতারের তালিকাতে নবম নাম কখনো বুদ্ধের, কখনো জগন্নাথের, এও স্মর্তব্য।

কিন্তু তাতে করেই ত্রিমূর্তির সঙ্গে ত্রিশরণ—বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ—অভিন্ন ছিল একদা এমন সিদ্ধান্ত দুরান্বয়ী। পক্ষান্তরে, প্রাচীন বিবরণ অনুসারে : রথ-চলা-কালে জগন্নাথ এবং সুভদ্রার মধ্যে অবৈধ একটি সম্পর্কের অভিযোগ এনে টিট্‌কিরি দেওয়াটা উৎসবের অনিবার্য একটি অঙ্গ বলেই গণ্য করা হয়। জন ডসন্ তাঁর হিন্দু ধ্রুবপদী অভিধানেও এ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই রীতির সূত্র ধরে রথযাত্রা উৎসবের উৎস এবং বিকাশের ধারাটিকে বিশ্লেষণ করা যায়। জগন্নাথ-সুভদ্রার সম্পর্ক নিয়ে অভব্য টিট্‌কিরি দেওয়ার রেওয়াজ থেকে বিশ্বাস করা যায় যে এটিও আদিতে এক ধরনের মদনোৎসব ছিল। শাবরোৎসব ( জগন্নাথের সঙ্গে শবর-অনুষঙ্গ স্মর্তব্য ), হোলি ইত্যাদির

সঙ্গে এটি অবশ্যই তুলনীয় এই ক্ষেত্রে। এ ধরনের উৎসব প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্রই আছে—প্রাচীন রোমের ব্যাকানালিয়া এবং স্যাটার্নালিয়া, প্রাচীন ইংলণ্ডের মে-পোল ফেস্টিভ্যাল, মধ্যযুগের ফ্রান্সের ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্লাভ, টিউটন, কেলটিক, গল-প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির মধ্যে, ওজিবওয়া, চেরোকী, স্যালিস, টুপী-মুণ্ডুরুকু, ইয়াঘান, ঈর-ঈওরোণ্ট প্রভৃতি রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে, ফাল্টি-আশান্টি, বুশম্যান, কাফির প্রভৃতি আফ্রিকার আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে, প্রাচীন চীনে, জাপানে, মিশরে, গ্রীসে এবং অবশ্যই ভারতে, এই ধরনের উৎসব প্রচলিত ছিল, আছেও, অনেকটা মৃদুভাবে অবশ্য। সাঁওতাল, মুরিয়া, দাফ্‌লা, বোড়ো, টিপরা, হাজং, রিয়াং, চোলা-নাইক্কার প্রভৃতি আদিবাসী জাতিদের মধ্যে এই একই ছাঁদের উৎসব এখনো আছে। গবেষকরা মনে করেন, বিয়ের সময়ে গান এবং নাপিতের ছড়ার মধ্যে যে অশালীন শব্দ এবং বর্ণনার রেওয়াজ আছে, সেও মিলনোৎসবের ঐ আদিম ঐতিহ্যেরই অনুষঙ্গবাহী। 'গোল্ডেন বাউ'-তে জেমস ফ্রেজার এবং 'হিস্ট্রি অব হিউম্যান ম্যারেজ'-এ এডোয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক এ ধরনের সুপ্রচুর নমুনা সংকলিত করেছেন।

সুতরাং জগন্নাথ (যাঁকে তাঁর বিশেষ আকৃতির জন্য যৌন প্রতীকের বিবর্তিত রূপ বলা যায়—উৎসাহী পাঠক স্যান্ডর ব্রাউনের 'সেক্স ওয়রশিপ অ্যাণ্ড সিম্বলিজম অ্যামং দ্য প্রিমিটিভ রেসেজ' নামে বইটি দেখতে পারেন) এবং সুভদ্রার মাধ্যমে আদিম-বা-প্রাচীন-কালীন একটি মদনোৎসবই রথযাত্রায় বিবর্তিত হয়েছে মনে করা যায়। বলরাম লাঙ্গলধারী বটেন আবার মদ্যপান-তথা-নেশার হুল্লোড়ের দেবতাও বটেন (তুলনীয় রোমান দেবতা ব্যাকাস) এবং তাঁর সম্পর্কে পুরাণবৃত্ত আছে যে, মত্ত অবস্থায় জলকেলি করতে ঝোঁক চাপলে তিনি অনিচ্ছুক যমুনা নদীকে লাঙ্গল দিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই লাঙ্গলের (সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বের বিদ্বান্‌রা জানেন এটিও হল একই সঙ্গে কৃষির এবং পুরুষাঙ্গের প্রতীক; অন্তত এই ভাবেই প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে এই বস্তুটি ঐতিহ্যাগত ভাবে গৃহীত) পীড়ন সইতে না পেরে নদী শেষে নারীর রূপ ধরে জলকেলি করে বলরামের সাধ মেটান। পুরাণবৃত্তটি, বলা বাহুল্য, তাৎপর্যপূর্ণ। অতএব এই বলরামকে অবশ্যই মদনোৎসবের একজন প্রধান চরিত্র রূপে আমরা যে দেখি, তাতে আর আশ্চর্য কি?

॥ ৩ ॥

রথযাত্রা উৎসবের 'যাত্রা' শব্দটির তাৎপর্যও বিচার্য। 'যাত্রা' অর্থে 'গমন'। যাওয়া ছাড়াও এই শব্দের বিশেষ একটি ভিন্নতর ব্যঞ্জনা আছে ( রমণ ) যা মদনোৎসব জাতীয় উপলক্ষের সঙ্গে সাযুজ্যসম্পন্ন। রথযাত্রার কদিন আগের স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান ছাড়াও এতগুলি লোক-উৎসব-পার্বণ 'যাত্রা' শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত : দোল, রাস, ঝুলন, চন্দন—যার প্রত্যেকটির সঙ্গেই নরনারীর অবাধ মেলামেশার রেওয়াজটা ঐতিহ্যাগত। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'রথযাত্রা' শব্দের অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাটা খতিয়ে বিচার করলে, ঐ একই সিদ্ধান্তে পৌছনো যায়। স্নানযাত্রার তাৎপর্যও ভিন্ন কিছু নয়; বিশেষত প্রতীকী ধারাস্নানও উর্বরত-তন্ত্রের একটা দ্যোতক। বসুধারার তাৎপর্য স্মর্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে।

কিংবদন্তী-অনুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী ছিলেন গুণ্ডিচা। যাত্রা করে জগন্নাথ গুণ্ডিচার মন্দিরে যান এবং আটদিন পরে উল্টোরথে ফেরেন। স্থানীয় ঐতিহ্যানুসারে এই ব্যাপারটি 'মৌসী'-ওরফে মাসীর বাড়ি যাওয়া। 'মাসীর বাড়ি' কথাটি পূর্ব ভারতে সব সময়ে খুব সরলার্থবাহী নয়! বিশেষত, এই বিশেষ ক্ষেত্রে রথ সেখানে এসে পৌছলে নবমাবতারকে যাঁরা প্রত্যুদ্গমনের মাধ্যমে সমাদরে বরণ করেন তাঁরা সবাই পুরুষ হলেও তাঁদের উপাধি তখন 'গোপিনী' ( ডঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার এই তথ্যটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন )। সুতরাং 'মাসীর বাড়ি'-তে 'গোপিনী'-পরিবৃতা হয়ে জগন্নাথ যে রাসলীলারই অনুরূপ কিছুতে নিমগ্ন হবেন, এটাই সম্ভবত এই রেওয়াজের অন্তর্লীন সংস্কার ছিল। এই গুণ্ডিচাবাড়ি যাওয়াকে অনেক সময়েই জগন্নাথের শ্বশুরবাড়ি যাওয়াও বলে, এটিও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

রথযাত্রার সময়কাল আষাঢ়মাস কেন এ প্রশ্নও এখানে প্রাসঙ্গিক। এই উৎসব যদি উর্বরতাতন্ত্রের সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয়—যা না হবার কোনো কারণ দেখি না—তাহলে ঐ ভরা বর্ষা হল কৃষির মরশুম এবং কৃষির পরিবৃদ্ধির জন্য মদনোৎসব পালন মানব সভ্যতায় বেশ প্রাচীন ব্যাপার। কৃষ্ণ এবং বলরাম—কৃষির অনুষঙ্গে এর মধ্যে এসেছেন যে, সে কথা আগেই বলেছি। শবরদের প্রাচীন দেবতা নীলমাধব কৃষ্ণাবতার জগন্নাথে পরিণতি লাভ করেছেন, যে-দেবতা আবার পুরুষাঙ্গ-প্রতীক, অর্থাৎ ঐ উর্বরতাতন্ত্রের ভিন্নতর ঐতিহ্যের সূত্রধারী। বলরাম

সুভদ্রা তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছেন শবরদেরই সাওরা নামে শাখাগোষ্ঠীর একটি লোক পুরাণবৃত্তের বিবরণের জের ধরে। ভেরিয়ের এলুইন তাঁর 'দ্য রিলিজ্যন অব অ্যান ইণ্ডিয়ান ট্রাইব : সাওরা'-তে এই বিবরণ সন্নিবিষ্ট করেছেন। আদ্যিকালে নাকি তিন প্রধান সত্তা (ওরফে-কিত্তুঙ) আবির্ভূত হন—দুইভাই একবোন : রম্মাকিত্তুঙ, বিম্মাকিত্তুঙ এবং সীতাবৈকিত্তুঙ। এঁদের সন্তানেরাই হলেন নাকি সাওরা জাতির প্রাচীন প্রপিতামহবর্গ। রম্মা-বিম্মা দুইভাই হলেন সাওরা জাতির মুখ্য দেবতা, সীতাবৈ হলেন মুখ্য দেবী। (সন্দেহ নেই রাম-সীতা ভীম নামগুলি উচ্চতর অর্থনৈতিক সংস্কৃতি থেকে গিয়ে এই পুরাণবৃত্তান্তের মূল নামগুলিকে হটিয়ে দিয়েছে।) দুইভায়ের মাঝে তাঁদের স্ত্রী-তথা-ভগ্নীর মূর্তি রেখে সাওরারা পূজা করতেন একদা। স্মরণযোগ্য রথযাত্রার সঙ্গে বৌদ্ধ ঐতিহ্য কিছুটা বিজড়িত এবং সেই ঐতিহ্যে রাম ও সীতা ভাইবোন হয়েও দম্পতি—'দশরথ জাতক' দ্রষ্টব্য। এইটিই রূপান্তরিত হয়ে রথযাত্রার ত্রিমূর্তিতে পরিণত পেয়েছে খুব সম্ভবত। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য মূল আদিবাসী ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেছে এখানে অন্য আর সব জায়গার মতোই। বৌদ্ধ প্রভাব তার মধ্যে আরও কিছু উপাদান সংযোগ করেছে। অবশেষে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম ও সাম্যভাবনা এই উৎসবকে বর্তমান রূপ দিয়েছে। কিন্তু এর মূলে সেই সাম্য-কেন্দ্রিক উর্বরতাভাবনা— মদনোৎসব যার অনুষঙ্গ মাত্র। বিচিত্র উপাদানগুলি এর মধ্যে সমাবৃত হয়ে একে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ছাত্রের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি ভাবনার বিষয় করে তোলে অবশ্যই।

ওড়িশা হয়ে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার পথ ধরে রথের উৎসব বাংলায় এসেছে। বাঙালীর সংস্কৃতিতে রথযাত্রার রীতিটিই এসেছে শুধু, বাকি যে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে আছে—যথা, শবর-সম্পর্ক বা সুভদ্রা-জগন্নাথের সম্পর্ক নিয়ে টিট্‌কিরি—এগুলো আসেনি। তার অর্থ ওড়িশার রথযাত্রা বাংলায় এসে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা হয়েছে বেশ খানিকটা পরিশীলিত হয়েই—আনন্দ এবং হৈ-চৈটাই তার মুখ্য ব্যাপার, ধর্ম এবং সংস্কারটা পরোক্ষে চলে গেছে এখানে আসার পর।

## নয় ॥ মনসার উপাসনা : বিচিত্র সব উৎসের ধারা-সমন্বয়

মনসাকে অর্বাচীন পুরাণে পাওয়া গেলেও আসলে তাঁকে লৌকিক দেবী হিশেবেই গণ্য করতে হয়। এর কারণ, সর্প-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনা পৃথিবীর আদিমতম ধর্মসংস্কারগুলির অন্যতম। সুতরাং দশহরা থেকে শুরু করে ভাদ্রের নাগপঞ্চমী তিথি পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে সর্প-উপাসনার ব্যাপক রেওয়াজ দেখি, তাকে দেবীভাগবত বা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কি মহাভারতের সূত্র ধরে ধ্রুবপদী 'মহিমা' দান করাটুকু সঙ্গত নয়।

ভরা-বর্ষার মরশুমে মূলত নদীমাতৃক বাংলা দেশে একজন সর্প-দেবতার উপাসনার মাধ্যমে সাপের ভয় দূর করার আদিম সংস্কারই এখনকার মনসা পূজায় পরিণতি পেয়েছে। এই দেবীকে বিচিত্র সমন্বয়ের প্রতীক রূপে গণ্য করা যায়। ইনি একই সঙ্গে পশু-পূজা, বৃক্ষ-পূজা, নদী-উপাসনা এবং মাতৃকা-আরাধনার ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছেন। তাছাড়াও সমাজবিজ্ঞানের আলোয় খুব খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে এঁর মধ্যে শিশ্ন-প্রতীক পূজারও একটা আভাস অবশ্যই মেলে। এত ধরনের পূজা-অর্চনার ধারা একটি মাত্র দেবতার মধ্যে সমাহৃত হয়েছে, এটা বাস্তবিকই খুব আকর্ষণীয় বিষয়!

অনেক বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে একমত যে, মনসা পূজার এই রূপটি খুব সম্ভবত দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছে। মনসা পূজার অনিবার্য উপকরণ যে-মনসাসিজ গাছ, দ্রাবিড়-বলয়ে তার প্রতিনাম হল চেম্মুড়ু; স্মরণযোগ্য যে বাংলা দেশে মনসা ঠাকুরানীর আর একটি নাম হল চ্যাংমুড়ী। দাক্ষিণাত্যের নানা অঞ্চলে যে-'মনে মন্‌চাম্মা' নামে সর্পাধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনা হয়, প্রায়শই তাঁর কোনো মূর্তি থাকে না—ঐ চেম্মুড়ুর ডাল মাটিতে পুঁতে তাকেই দেবীর প্রতীক হিশেবে ধার্য করেন ভক্তের দল। মনসার যে-কাহিনী মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে প্রচারিত এদেশে, তাতে দেবসভায় বেহুলার যে-নৃত্যবর্ণনা আছে, বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তার কোনো তুলনাযোগ্য দ্বিতীয় নজির মেলেনা। এটা বাংলার সংস্কৃতিতে প্রক্ষিপ্ত অবশ্যই—কেন না দেবতার সামনে নারীর নৃত্যশৈলী দেখানর কোনো লোকজীবন-সম্মত ঐতিহ্য সেখানে গড়ে ওঠেনি (হুদুমদেও-নাচ ইত্যাদির

পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণই আলাদা )—এটি পুরোপুরি ভাবেই দক্ষিণের মন্দিরের দেবদাসী নৃত্যের ছকে ঢালা। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উৎস থেকে এই কথা মনে করেছেন যে দেবদাসী-প্রথা বাংলা দেশের উচ্চবিত্ত সমাজের লালসা-তৃপ্তির পরিপোষণের জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে অষ্টম শতাব্দীর পর এখানে আমদানী করা হয়। এ জিনিস আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত নয়। সুতরাং, চেম্মুড়ু>চ্যাংমুড়ী, মন্‌চাম্মা>মনসা মা এবং বেহুলার নাচ=দেবদাসী-নৃত্য—এই তিনটি অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য অবশ্যই বাংলাদেশের মনসা দেবীর বর্তমান ভাবগত অবয়বটি যে দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যাশ্রিত কাঠামোর ওপর গঠিত, সে কথাকেই সপ্রমাণ করে।

ঐ মনসা গাছকে পূজোপকরণ হিসেবে গণ্য করার মধ্যেই শুধু বৃক্ষোপাসনার ঐতিহ্য রয়েছে মনসা পূজায়, এমনটি নয়। শিব-কর্তৃক বিল্ববৃক্ষ আশ্লিষ্ট হবার পরিণতিতে মনসার জন্ম হবার গল্পও; বৃক্ষোপাসনার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। এই দেবীর এক নাম কেতকা-অর্থাৎ-কেয়া এবং আরেকটি নাম পদ্মা। এ ছাড়া জাঙ্গুলী বা জাঙ্গলী নামও পাওয়া যায়। স্পষ্টতই, এই দেবীকে তাঁর কোনো একটি আদিম পর্যায়ে বৃক্ষ বা ফুল ইত্যাদির প্রতীকেই পূজো করা হতো—যেমন এখনও 'মনে মন্‌চাম্মা'-র পূজো হয়—এ সব তারই প্রমাণ। সিজ গাছ, পদ্ম ফুল এবং কেয়া ফুলের অন্যতর ব্যঞ্জনাও আছে—সে কথা পরে আলোচনা করছি।

জাঙ্গলী বা জাঙ্গুলী দেবী অবশ্যই শুধুমাত্র বৃক্ষ-উপাসনার ঐতিহ্য বহন করেন না—জঙ্গলের শুধু 'ফোরা' নয় 'ফণা'-ও ( ইংরেজী-বাংলা দুই অর্থেই এখানে ! ) তার সঙ্গে সম্পর্কিত নিশ্চয়ই। স্বাভাবিক ভাবেই সাপ এর মধ্যে এসেছে। কিন্তু শুধু সর্পবাহনা মনসাই নয়, হংসবাহনা ও হস্তীবাহনা মনসার মূর্তিও দেখা গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শে—এবং চ্যাং মাছকেও মনসা পূজার অন্যতম উপচার রূপে কোনো-কোনো জায়গায় দেখা যায়। সেটা খুব সম্ভবত চ্যাংমুড়ী নামটার সঙ্গে ভাবানুষঙ্গ বজায় রেখেই সৃষ্টি হয়েছে—তা ছাড়া ঐ বিশেষ মাছটির মধ্যে ফণাওয়ালা সাপের একটা আদলও আসে। কিন্তু হাঁস এবং হাতীর প্রশ্নও তা সত্ত্বেও থেকেই যায়।

॥ ২ ॥

মনসাকে যে শিবের মানসকন্যা বলা হয়, সেটা নিতান্তই অর্বাচীন কালের 'শিষ্ট' সংস্কৃতির ফলশ্রুতি। মনসার জন্মের দুটি গল্প যা প্রচলিত আছে, তার একটিতে দেখি শিবের চরিত্রবল পরীক্ষা করার জন্য দুর্গা কোচ-যুবতীর ( রাঢ় অঞ্চলের কাহিনীতে ডোম-কন্যার ) মূর্তি ধরে তাঁকে অরণ্যের মধ্যে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যান। এরই লব্ধফল, কোচ জাতির দৌহিত্রী রূপে মনসার জন্ম। অর্থাৎ, এই গল্পের অন্তর্কাঠামোর সূত্র ধরে মনসাকে যেমন শিবের দুহিতা রূপে দেখছি, তেমনই, তাঁকে কোচনী-কন্যা হিশেবেও দেখছি। যেখানে যে-কোনো দেবীকেই ব্রাহ্মণ-ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চ বর্ণেই জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায় বাংলা দেশের কিংবদন্তীতে, সেখানে অবণ্য-প্রত্যন্তনিবাসী কোচদের বা অন্ত্যজরূপে অবহেলিত ডোমদের ঘরের মেয়ে হিশেবে মনসাকে মেনে নেওয়া নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সূচক। আদিতে ইনি যে ধ্রুবপদী অর্থে পৌরাণিক দেবী নন, লোকায়ত উৎসেই যে এঁর উৎসারণ ঘটেছে—এই প্রচলিত লৌকিক কাহিনীটি তাকেই সূচিত করছে।

এই গল্পের যে ভিন্নতর তাৎপর্য, তারই সূত্রে মনসার গজবাহনা এবং হংস-বাহনা রূপ দুটিও বিশ্লেষণ করা যায় আবার। শিবের ( এবং দুর্গারও ) কন্যা হিশেবে মনসা লক্ষ্মী-এবং-সরস্বতীর সঙ্গেও সমীকৃতা হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। মনসাকে মহাজ্ঞানের অধিকারিণী হিসেবে দেখা হয় ( সম্ভবত এই 'জ্ঞান' হল জীবন ও মৃত্যুর রহস্য, লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভ যার ব্যঞ্জনাবাহী )—তাই এই বিশেষ 'বিদ্যা'-র অধিদেবী রূপে তিনি বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সঙ্গে সমীভূতা। এইটুকু ছাড়াও, আর একটা কথা আছে : মনসা নাকি "ঝল্লমল্ল"—অর্থাৎ গান-বাজনার উপচার ছাড়া পূজা গ্রহণ করেন না, এমনই লোকপ্রত্যয় আছে। এই "ঝল্লমল্ল" ( মনসামঙ্গলে, যারা এসব করে তাদের দুজনের নাম 'ঝালু-মালু' ) সরস্বতীর এলাকাভুক্ত বিষয়; সুতরাং এই দিক থেকেও মনসা এবং সরস্বতীর সাযুজ্য অপ্রত্যাশিত নয়।

সুতরাং, এই প্রসঙ্গক্রমেই সরস্বতীর বাহন হংস, মনসার বাহন রূপেও হাজির হয়েছে। মনসা ও সরস্বতীর পারস্পরিক যোগসূত্রে নদী-উপাসনার কথাটিও আসবে : সে কথাটিও যথাকালে আলোচ্য। বৌদ্ধদের সর্পাধিদেবী

বিষহারিণী জাহ্নবীতারা ( জাহ্নবী শব্দটি আমরা আগেই বিচার করেছি ) এবং সরস্বতীর মূর্তি প্রকরণগত সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। সুতরাং এই সূত্রেও মনসা এবং সরস্বতীর সমীভবন সম্ভাব্য।

শিবকন্যারূপে লক্ষ্মীর সঙ্গেও মনসার ভাবৈক্য আছে। প্রচলিত লোকায়ত সংস্কারানুযায়ী সাপ সম্পদরক্ষকও; সর্পমণির কল্পনা এবং গুপ্তধনের প্রহরী হিশেবে সাপের উপস্থিতি লোককথার বিশেষ পরিচিত উপকরণ। অতএব বিত্তাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এবং সর্পাধিদেবী মনসা মিলে যেতেই পারেন স্বাভাবিকভাবে। লক্ষ্মীর কমলা নাম এবং মনসার পদ্মানামও এই ভাবনা সমীকরণের অনুষঙ্গ স্বরূপ. লক্ষ্মী বহু সময়েই পদ্মিনী বা পদ্মাবতী রূপেই উল্লেখিত হন—এই বিষয়টি এখানে স্মরণযোগ্য।

লক্ষ্মীর অন্যতম বাহন রূপে গজ বা মহানাগ বহু প্রাচীন আমল থেকেই স্বীকৃত। হাতীর এই 'নাগ' নামটি কোন্ সূত্রে হয়েছে, সেটি অবশ্য প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে মনসার বাহন সর্পনাগ এবং লক্ষ্মী একটি বাহন হস্তীনাগ, এই দুই নাগের নামবাচক সাদৃশ্য, মনসার একটি বাহন রূপে হাতীকেও সাব্যস্ত করেছে। (পুরাণবৃত্তে এ ধরনের জিনিষ ঘটে। উদাহরণত: দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকের বিবাহসূত্রে, তিনি 'দেবসেনাপতি'; এই পরিচিতিটি উত্তরকালে এইভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, তিনি 'দেবকুলের সৈন্যবাহিনীর অধিপতি'।)

॥ ৩ ॥

সাপ, রাজহাঁস এবং হাতী—মনসার এই বেশি-বা-কম প্রচলিত তিনটি বাহনই পশুপূজার সুপ্রাচীন সূত্র ধরে উত্তরপর্বে বাহন মূর্তিতে উপস্থিত হয়েছে। সরস্বতীর সঙ্গে মনসার সমীভবন ঘটার প্রসঙ্গক্রমেই মনসার সূত্রে নদী-উপাসনার বিষয়টিও বিচার্য। গঙ্গা উত্তরাপথে পবিত্র নদীরূপে সর্বজনীন স্বীকৃতি পাবার আগে সরস্বতী নদীই ছিল সেই সম্মানের ভাগী। পরে যখন গঙ্গা পবিত্রতার আধার বলে গণ্য হল ( গঙ্গাকে আবার বিষহারিণী বলেও গণ্য করা হয়েছে ), তখন সরস্বতীর উত্তরাধিকারও তাতে বর্তিয়েছে এবং বাংলা দেশে গঙ্গার ব্যাপকতোয়া শাখাটি 'পদ্মা' নামেও খ্যাতি লাভ করেছে। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে মনসাতন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে এই নামকরণের বিশেষ তাৎপর্যটি অনুধাবন করা কঠিন নয়। মনসা-কাল্‌টের মধ্যে প্রাচীনতর নদী-উপাসনার ধারাটি এই ভাবে সুপ্রচ্ছন্নরূপে বহমান রয়েছে।

মাতৃকাদেবী রূপেও যে মনসা পরিগণ্যা, এ-কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘট-প্রতীকে তাঁর পূজা হবার বিধিও সর্বজনবিদিত। স্বভাবতই তাঁকে উর্বরতা-কেন্দ্রিক-ধর্মধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা রূপেও গ্রহণ করতে হয়। তবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'ফার্টিলিটি কাল্‌ট' শস্য নয়, শুধুমাত্র প্রজননের সঙ্গেই বিজড়িত। সাপের অধিদেবী হিসেবে তাঁর পক্ষে সেটাই স্বাভাবিকও বটে। অন্যান্য মাতৃকাদেবী ( যেমন চণ্ডী ) ঘটে পূজিতা হন ঠিকই, কিন্তু মনসা ঘটের অনন্যতা আছে ; অন্য মাতৃদেবীরা যেখানে শুধু ঘট রূপেই অর্চিতা হন, সেখানে ঘটের গায়ে অঙ্কিতা গর্ভবতী নারীব মূর্তিতে ইনি বিরাজ করেন। এই সংযোজন সম্ভবত পৌরাণিক মনসা-তথা-স্ত্রী জবৎকারু—যিনি কশ্যপের কন্যা, বাসুকীব ভগ্নী এবং আস্তিকের জননী—সঙ্গে লৌকিক মনসাব একীকরণ হবার ফলশ্রুতি। স্বামী-জরৎকারু পত্নীকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে দেবতারা স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার না-করে ত্যাগ করা পাপ বললে তিনি অতঃপব স্ত্রীকে গর্ভবতী করে ছেড়ে চলে যান। সম্ভবত এই জন্যেই মনসাব গর্ভবতী মূর্তি দেখি। অন্যান্য মাতৃদেবীরা যেখানে অনেক বেশি 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'-প্রতীক, ঘটরূপা মনসাব প্রতীক-ধর্ম সেখানে অনেক বাস্তব বা 'রিয়াল'।

প্রচ্ছন্ন-যৌনপ্রতীক উপাসনার ধারাও এখানে সংযুক্ত দেখি। প্রথমত, বিশ্ব-জনীনভাবেই সাপের সঙ্গে প্রজননের একটা সংস্কার সংবদ্ধ রয়েছে। সাপের স্বপ্ন দেখলে সন্তান-সম্ভাবনা ঘটে, দুটি সাপের 'শঙ্খ লাগা' দেখলে শুভ কিছু ঘটে, সাপ পুরুষত্বসূচক প্রত্যঙ্গের প্রতীক, নির্বিষ সর্প এবং পুরুষত্বহীন 'বেটাছেলে' পরস্পরের উপমা, খোলস ছেড়ে সাপের বেরোনো যৌনসক্রিয়তার রূপক—যার মাধ্যমে নতুন দেহ-তথা প্রাণের আবির্ভাব ঘটে—ইত্যাদি সংস্কার বিশ্বজনীন। যৌন জ্ঞান সাপেই দিয়েছে মানুষকে, এ গল্প শুধু মাত্র আদম ইভকে নিয়েই নয়, আরো নানাভাবে বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির লোককাহিনীতে পাওয়া যায়।

সুতরাং, সর্প তথা তার দেবীর পূজার মধ্যে শিশ্ন-প্রতীক উপাসনার ধারাটি অবলীন হয়ে আছেই তাতে সন্দেহ কি! সন্তানসম্ভবা-নারীর-রূপে ঘট মূর্তিতেই শুধু মনসার পুজো হয় না, শোলার তৈরী যে এক বিশেষ আকৃতির বস্তুর ওপর মনসা মূর্তি এঁকে বা খোদাই শিষ্ট করে পুজো করা হয়, তার লৌকিক নাম 'করণ্ডী', শিষ্ট ভাষায় যার মানে যোনি। মনোবিজ্ঞানে পুষ্পকেও ঐ একই প্রত্যঙ্গের প্রতীক রূপে ধরা হয়, সুতরাং 'পদ্মা' এবং 'কেয়া' নাম দুটির বিশেষ

তাৎপর্য বোঝা কঠিন নয়। পদ্মের ওপর শিবের রাগমোচন হওয়ায় মনসার জন্ম হওয়া, কিংবা কোচনী / ডোমনীর ছদ্মবেশে কেয়াবনে দুর্গার ঘুরে বেড়ানর গল্পগুলি এই সমস্ত আদিমকালাগত প্রতীক-সংস্কারের উপর পরিশীলনের রং-পালিশ চড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। তন্ত্রে স্ত্রী-প্রত্যঙ্গকে ত সর্বদাই 'পুষ্প' বলে অভিধা দেওয়া হয়, অষ্টদল পদ্ম, শতদল পদ্ম এবং সহস্রদল পদ্মের ব্যঞ্জনা যে সেখানে কি, তত্ত্বাভিজ্ঞ মানুষ মাত্রেই তা জানেন। কামরূপী উপভাষায় এবং অসমীয়া ভাষায় কেতকা বা কেতি শব্দের অর্থে ব্যঞ্জনাও ঐ একই।

বেলগাছকে উপলক্ষ করে শিবের কামনা উদ্দীপিত হবার তাৎপর্য বৃক্ষোপাসনার সঙ্গে যেমন সংযুক্ত, ঠিক তেমনই শিশ্ন প্রতীকের একটা ব্যাপারও তার মধ্যে আছে। বিশেষত বেলগাছ, সহজবোধ্য কারণেই হিন্দু-সংস্কারে নারীবৃক্ষ রূপে কল্পিত ( যেমন, কলাগাছও )। তেমনই আবার মনসাসিজের গাছও শিশ্ন প্রতিভূ—বিশেষত, ফণা তোলা বিষদন্তধারী সাপের সঙ্গে তার চেহারার সাদৃশ্যটা কাঁটার খোঁচা না খেলেও সচেতনভাবে খেয়াল করা যায়!

॥ ৪ ॥

মনসাকে টোটেম বা কুলপ্রতীকী বলে আদৌ গণ্য করা যায় কি? হাঁস এবং হাতীর ব্যাপার দুটি অন্যভাবে এলেও, যেখানে সাপ রূপেই এই দেবীর মূর্ত অভিপ্রকাশ সেখানে টোটেম জাতীয় একটা ভাবনার আভাস মেলে বৈ-কি! মনসা-জন্মের আর একটি যে কাহিনী আছে, ছদ্মবেশিনী পার্বতীকে দেখে পদ্ম বনে শিবের রাগমোচন ঘটলে চ্যাং মাছ সেটি গলাধঃকরণ করে তার তেজ সহ্য না করতে পেরে উগ্‌রে দেয় এবং সেই বীর্যপুঞ্জ পাতালপুরীতে পৌঁছে মনসারূপে মানবীয় কলেবর ধারণ করে—চ্যাং মাছের টোটেমের ব্যাপারটাও এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব। টোটেম-তত্ত্বের বিদ্বৎজনেরা শুধু পশু নয়, ফল-ফুল ইত্যাদিকেও কুল বা জাতির প্রতীকচিহ্নের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেন: পদ্ম, কেয়া ইত্যাদি ফুল এবং বেল ফলও তাহলে এই প্রেক্ষিতে বিচার্য।

পুরাণ-প্রথিত নাগজাতির টোটেম সম্ভবত সাপই ছিল। আর্যভাষী জাতিগোষ্ঠীগুলি এদেশে আসার আগে যে প্রত্ন-অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়রা বাস করতেন, সাপের পূজা যে তাঁদের মধ্যে বিধিমতেই প্রচলিত ছিল, হরপ্পায় পাওয়া শীল-মোহরে তার প্রমাণ হাজির।

টোটেমের বিষয়টি আরও একভাবে বাংলা দেশে প্রচলিত মনসা ব্রতের

গল্পের ভিতরও দেখতে পাবেন। সাপেরা এক বেণে-বউয়ের মাসতুতো ভাই রূপে গণ্য, স্বয়ং মনসা তার মাসী এবং তাঁর বরে বেণে-বউয়ের শ্বশুরকুলের বিত্ত উপ্‌ছে পড়ল—ইত্যাদি মর্মে প্রচলিত ঐ ব্রতকাহিনীতে লক্ষ্য করার বিষয় হল দুটি: এক, মনসা এখানে ধনদা দেবী (অর্থাৎ, লক্ষ্মীর গুণঋদ্ধা) এবং দুই, তিনি মানবকন্যার সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধা। নাগেরা মাতৃকুল-সম্পর্কে তার ভাই, সুতরাং টোটেম ভাবনা এখানে সুস্পষ্টই।

ব্রতকথাটির মধ্যে সমাজবিজ্ঞানগত আর কোনো তাৎপর্য না থাকলেও প্রচলিত মঙ্গল কাহিনীটির অন্তর্লীন গুরুত্ব সমাজতত্ত্বের ছাত্রের কাছে অবশ্যই আছে। প্রথমত, এই কাহিনীতে মানুষ দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, দুই, মানুষ দেবকুলের এক্তিয়ার থেকে মহাজ্ঞান আয়ত্তগত করে আনছে; তিন, বেহুলার মাধ্যমে নারীর বিদ্রোহের চিত্র সর্বপ্রথম আমরা দেখি এবং চার, তার অসহায় নৃত্যের মাধ্যমে শ্রেণী বিভেদী সমাজের ভয়ঙ্কর শোষক রূপটি অনাবৃত হয়ে ওঠে। এই সব কটি দিকের বিচার করলে মনসাকাহিনীর সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব যে কতখানি, তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

আদিমকাল থেকে প্রকৃতির অন্তর্লীন অলক্ষ্য দৈবীশক্তির কল্পনা করে মানুষ তার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণই করে গেছে, তাকে পরিতুষ্ট করার চেষ্টা করছে—এইটিই সর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত সংস্কৃতিতে আমরা দেখেছি। বুদ্ধিতে বা কৌশলে দেবভোগ্য কিছু—যেমন, আগুন—দেবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বা লুকিয়ে নিয়ে আসার মধ্যে প্রকৃতির ওপরে মানুষের অধিকার বিস্তৃতির ক্রমান্বিত পরিচয় ফুটে ওঠে অবশ্যই; কিন্তু দৈবশক্তিকে অমোঘ এবং অলঙ্ঘ্য বা অনিবার্য বলে না মনে করে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর ছবি মনসা-কাহিনীর চন্দ্রধর সওদাগর চরিত্রের মধ্যে দেখি, সেটি নিঃসন্দেহে এই কাহিনীর আদিম কালের উৎসের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে আপাতদর্শনে অপ্রত্যাশিত বলেই মনে হবে। সমাজ এবং পরিবারের অনুশাসনের বিরুদ্ধে, মৃত্যু-জয়ের সংকল্প নিয়ে বেহুলার কলার মান্দাসে ভেসে পড়াও এক ধরনের বিদ্রোহী মনেরই পরিচয়বাহী। দেবসভার 'সজ্জন'-দের লোলুপ দৃষ্টির সামনে অসহায়ভাবে বেহুলার নৃত্যগীতও সমাজবিজ্ঞানীর চোখে একটি বিশেষ তাৎপর্যরূপে ধরা দেয়। শ্রেণীনির্ভর সমাজেই কুলবধূকে সভানর্তকী-রূপে বারাঙ্গনার সমতুল্য পর্যায়ে নামিয়ে আনে—আদিম বা কৌম বা লোকায়ত সমাজ তা করে না। তাই মনসা-কাহিনীর মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণীসোপানের ওপর পৈঠার মানুষদের কাছ থেকে—মনসা-

প্রমুখ দেবতারা যার প্রতীক—মহাজ্ঞান-তথা-মৃত্যুঞ্জয়ের রহস্য, পুনর্জীবন অর্জনের রহস্য ছিনিয়ে আনার দ্বান্দ্বিক চিত্র ফুটেছে, অন্যদিকে ওপরতলার 'দেবতা'-দের শোষণের শিকার হয়ে নীচের তলার 'মানবী'-কে ইজ্জত বেচতে হচ্ছে স্বামীর জীবনের মূল্য স্বরূপ—এই ছবিও তেমন ভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে। মনসাকে উপলক্ষ করে ইতিহাস-সচেতনতার এই যে সুষ্ঠু অভিপ্রকাশ দেখি —এর মতো সামগ্রিক একটি তাৎপর্য ক্ষমতা অন্য কোনো ধরণের পূজো-পরবের দেবতা-কথার সঙ্গে জড়িয়ে নেই ওতঃপ্রোতভাবে এটা অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

* * *

মনসার ব্রতকথা এবং মনসার 'মঙ্গল'-কথা—এ দুটির মধ্যে অবশ্যই ভাবগত দিক থেকে প্রথমটি প্রাচীনতর চরিত্রের। খুব সম্ভবত, ব্রতকাহিনীটিই বঙ্গ সংস্কৃতির ভূমিজাত; মঙ্গলকথাটি দ্রাবিড়-বলয় থেকে সরে এসে এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে বহু শতাব্দীর বিবর্তনে। মনসা পূজার মধ্যে সেই প্রাচীনতর ঐতিহ্যের আদিমতা এখনো টিঁকে গেছে—প্রাচীনতর সংস্কারও। পক্ষান্তরে তরুণতর মঙ্গল কথাটি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় বেশি জনপ্রিয় হয়েছে।

বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শিব এবং চণ্ডীর কোনো না কোনো রূপকে অবলম্বন করে যেমন থান বা মন্দির আছে প্রায় সর্বত্রই, তেমনই মনসার থানও অত্যন্ত সুলভ সেখানে। খোদ কলকাতা শহরেই 'মনসাতলা' নামের পাড়া অপ্রাপ্য নয়— শিব বা চণ্ডীর নামাবলম্বী মহল্লার মতোই। বিশেষ-বিশেষ দিনে মনসার পূজো ত সে সব জায়গায় হয়ই, ঘরে-ঘরেও হয়। তাই মনসাকেও বাঙালীর অন্যতম প্রধান দেবতা বলেই গণ্য করতে হবে। সর্প মূর্তিতে, মনসাসিজ মূর্তিতে, হংসবাহিনী মূর্তিতে, কৈতরী (গর্ভিণী) ঘটে, অষ্টনাগ চালিতে, বিয়াল্লিশনাগ চালিতে, শোলার করণ্ডীতে—কোনো-না-কোনো ভাবে তাঁর পূজো হয়ে থাকে সর্বত্র—দুধ-কলা সন্দেশ-ফুল-চাল দিয়ে যেমন, তেমনই হাঁস, মুরগী মায় শুয়োর অবধি বলি দিয়ে তার রক্ত করণ্ডীতে ছিটিয়েও। মূর্তিহীন অবস্থায় শুধু একটি ঢিবিকেও মনসার প্রতীক বলে ধরে নিয়ে উপাসনা করা হয়—আদিম ঐতিহ্যেরই ভগ্নাবশেষ রূপে ধরতে পারেন এই ব্যাপারটিকে।

বাড়িতে মনসার থানের আলপনার ওপরে যদি বাস্তু সাপ এসে ঘুরে গিয়ে ঘরে ফিরে যায়—ভক্ত-ভক্তারা মনসার বাহনের সেই উপস্থিতিকে নিজেদের পিতৃপুরুষের আবির্ভাব বলেই গণ্য করেন। পশুকে পূর্বপুরুষরূপে গণ্য করার

টোটেম-ভাবনার সঙ্গে সেখানে পিতৃপুরুষের আত্মাকে পূজার প্রাগৈতিহাসিক প্রবণতাও সংমিশ্রিত। আর মনসা পূজার পার্বণী উৎসবই যে তার উপলক্ষ, এটাও স্মর্তব্য।

মনসা-পরবের প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের কথাও সবিশেষভাবে বিচার করা দরকার। মনসার 'গাজন' উপলক্ষে মল্লভূম অঞ্চলে যে ঝাঁপান্ খেলা হয় কয়েক গণ্ডা জীবন্ত সাপ নিয়ে—পরিশেষে তার বিশ্লেষণ করতে হবেই। মনসা পূজাকে এক অর্থে মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনা কবা বলে গণ্য করা উচিত—এমন কথা ওপরে বলেছি। জীবন্ত একগাদা সাপের ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তাদেরকে নিয়ে খেলা করার মধ্যে মানুষের সেই ভয়মুক্তির সাধনা সিদ্ধিলাভ করেছে। দাঁতে ব্যাটল সাপ কামড়ে উত্তর আমেরিকার হোপি আদিবাসীরা যে পরবী নৃত্য করেন—তার উদ্দেশ্য বৃষ্টি নামানো, ফসল ফলানো, সন্তান লাভ। বাঙালী ঝাঁপান্ খেলুড়েরা আরো বেশির প্রত্যাশা করেন: এই নাচ, এই খেলা তাঁদের কাছে পুরুষকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক, দেবতার কোপকে প্রতিহত করার দ্যোতক। যথা অর্থে তাই তাঁরা বেহুলার প্র-সন্ততি, চাঁদের উত্তরপুরুষ। আর কোন্ পরবের উৎসে এমন মানুষের মর্ত্যসীমাচূর্ণী-অমর-মহিমার সন্ধান মেলে মনসার শ্রাবণী সংক্রান্তির পূজোয় এই ঝাঁপানের খেলা ছাড়া।

## দশ ॥ বিশ্বকর্মা : মেহনতী মানুষের নিজস্ব দেবতা

ঋক্‌বেদের মন্ত্রে যদিও অনেকবারই বিশ্বকর্মার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে তিনি পুরাণেও স্থান পেয়েছেন, তবু মূলত তাঁকে প্রাগার্যভাষী জনপদনিবাসী জাতিগোষ্ঠীরই উপাসিত দেবতা বলে গণ্য করাই সঙ্গত। কেননা, বৈদিক সাহিত্যে তাঁকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে কল্পনা করা হলেও, তাঁর মূল পরিচয় স্থাপত্যবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা হিসেবেই। সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু, বজ্র ( ইন্দ্র ) প্রভৃতি নিসর্গদেবতার উপাসক ঋক্‌বৈদিক আর্য-ভাষী জাতিকোমগুলি আদিতে ছিল যাযাবর, জীবনযাত্রা নির্বাহের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কিছু-কিছু অস্ত্র-যন্ত্র ইত্যাদি তাদের অবশ্যই ছিল, সে বাবদে একটি দেবতাকে কল্পনা করাও স্বাভাবিক। তাঁর নাম ত্বষ্টা। পক্ষান্তরে, হিন্দুকুশ পেরিয়ে এসে সিন্ধুতীরের যে সভ্যতাকে তারা বিধ্বস্ত করেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে নাগরিক। হরাপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি মহানগরীগুলিতে স্থাপত্যশৈলীর যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উদ্ধার করা গেছে, তা থেকেই বোঝা যায় সেই বিদ্যায় ঐ সভ্যতার বাহকরা কত দূর অগ্রসর হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বিশ্বকর্মা যখন স্থাপত্যবিদ্যার অধিষ্ঠাতা রূপেও স্বীকৃত, তখন স্থাপত্য-নির্ভর নাগরিক সংস্কৃতির দেবকল্পনার মধ্যেই তাঁর উৎস খোঁজা স্বাভাবিক। পরবর্তী-কালে ঋক্‌বৈদিক আর্যভাষীদের সঙ্গে প্রাগার্যভাষী প্রত্ন-দ্রাবিড় ও আদি-কোলা-রীয় গোষ্ঠীর হরাপ্পীয়দের দ্বন্দ্ব-সহাবস্থানের পরিণতিতে হিন্দু পৌরাণিক-সংস্কৃতি যখন গড়ে উঠল, তখন, দুই গোষ্ঠীর যন্ত্রদেবতা-শিল্পদেবতা সম্মিলিত করে বিশ্বকর্মাকে বর্তমানে-পরিচিত রূপে কল্পনা করা হয়েছিল।

বিশ্বকর্মাকে পুরাণে কল্পনা করা হয়েছে রাক্ষস-রাজপুরী লঙ্কানগরীর নির্মাতারূপে। বিশ্বকর্মার পুত্র নল-নামধারী বানর রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধনের সেতু নির্মাতা। নলের জন্মকালে বিশ্বকর্মাও নাকি বানরই ছিলেন! বিশ্বকর্মার যে-মূর্তি উত্তরকালে পরিচিত হয়েছে, সেটি হস্তীবাহন। হাতীর সঙ্গে উরাল-হিন্দুকুশ পেরিয়ে-আসা বৈদিকদের পরিচয় থাকার কথা নয়, পক্ষান্তরে হরাপ্পা-সংস্কৃতির শীলমোহরে হাতীর হদিশ বহুবারই মেলে; দেবমূর্তি-খোদিত বলে-

স্বীকৃত মোহরেও তার উপস্থিতি আছে। এই সমস্ত বিষয়গুলিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে একদিকে : ইনি আসলে প্রাগার্য নাগরিক জাতির দেবতা, আদিতে হাতীর (অথবা বানরের) প্রতীকে পূজিত হতেন, উত্তরকালে সাংস্কৃতিক সহাবস্থান-ও-সমন্বয় ঘটলে বৈদিক নাম 'বিশ্বকর্মা' এই সমন্বিত-দেবতার উপরও আরোপিত হয়, বৈদিক দেবতা ত্বষ্টার বিভিন্ন গুণ এবং এখন-বিস্মৃতনামা হরাপ্পীয় দেবতার স্থাপত্যবিদ্যা ও আনুষঙ্গিক-অন্যান্য দক্ষতা তাঁর মধ্যে একত্রে কল্পনা করা হয়।

ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা এবং বিস্মৃতনামা হরাপ্পীয় শিল্পদেবতা একাকার হয়ে মিলে-মিশে যাবার পর যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে পুরাণবৃত্তে, সেখানে দেখি তিনি অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের ছেলে এবং বিদ্যাগুরু বৃহস্পতির ভাগনে। দেবতাদের পুষ্পক-বিমানের নির্মাতা, স্থাপত্যবেদ নামে উপবেদের রচয়িতা, আগ্নেয়াস্ত্রের স্রষ্টা, বিষ্ণুচক্র, শিবত্রিশূল, কুবেরপাশ, কার্তিকের ভল্ল, ইন্দ্রপ্রস্থ নগর এবং জগন্নাথের বিগ্রহ নির্মাণকারী। সহস্র শিল্পবিদ্যার অধিকারী বিশ্বকর্মা যবিষ্ঠ বা অগ্নিরূপেও কথিত, তাঁর হস্তীবাহন মূর্তির হাতে মশালও আছে হাতুড়ীর সঙ্গে। তাঁর কাজ হল : কারুকৃত্য, তক্ষণ এবং ধনুষ্কেপণ। তাঁর কন্যা সংজ্ঞাকে সূর্য বিবাহ করেছেন এবং তিনি সূর্যতাপ শনিচক্রের সাহায্যে এক-অষ্টমাংস কর্তিত করেন, সেটিই নাকি মর্ত্যে পতিত হয়ে অগ্নিতে পরিণতি পেয়েছে।

বিশ্বকর্মার অনুরূপ শ্রমদেবতা পৃথিবীর নানান সংস্কৃতিতেই কল্পিত হয়েছেন। গ্রীকো-রোমক পুরাবৃত্তের ভালকান এবং হেফাইস্তোস, উত্তর এবং মধ্য ইউরোপের পুরাণ কথার থর প্রমুখ দেবতা বহু সময়েই শিল্প-স্রষ্টা বা নির্মাতারূপে কল্পিত হন। এঁরাও আগুনের সঙ্গে অভিন্ন। যবিষ্ঠ এবং হেফাইস্তোস শুধু শব্দের উৎসেই এক নন, দেবতা-ভাবনাতেও সমান সূত্রবাহী এ কথা ভাবারও অবকাশ অবশ্যই আছে।

অর্থাৎ, শ্রমনির্ভর জানপদ-সভ্যতা গড়ে উঠলেই তার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষদের ধর্মধারণারও একটা বিবর্তন ঘটে। বর্ণাশ্রমকেন্দ্রিত ও শূদ্র-শ্রমের ওপর নির্ভরশীল হিন্দু সভ্যতাই হোক, আর দাস-সমাজের শ্রমের ওপর গড়ে ওঠা গ্রীকো-রোমক সভ্যতাই হোক, সর্বত্রই শ্রমিক-জনতা তাঁদের নিজস্ব চেতনার অভিব্যক্তিতে একটি করে শ্রমদেবতা খাড়া করেছেন আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ হিসেবে। অসুর-দৈত্য-দানব-যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতিকে দমন করার পৌরাণিক গল্প এক অর্থে শ্রমজীবী মানুষের দমিত হবারই কাহিনী।

মাঝে মাঝে দৈত্যরা যে বাহুর এবং অস্ত্রের বলে দেবলোক অধিকার করেছেন, সে হল তাঁদের রুদ্ধ বিক্ষোভের কল্পকাহিনী। সেই তাঁদেরই প্রতীকী-দেবতা হিশেবে বিশ্বকর্মার তাই একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা আছে সন্দেহ নেই। বিশ্বকর্মার সঙ্গে ইন্দ্রের দ্বন্দ্ব এবং তাঁর হাতে সূর্যের বিক্রম হানির কাহিনী তার হদিশ দেয়। বৈদিক নাম এবং চরিত্র তাঁর ওপরে যতই আরোপ করা হোক-না কেন, মূলত যে তাঁর স্বরূপ অবৈদিকই, তাঁর শ্রমিক সুলভ হাতুড়ী ও মশাল ধারণ এবং হস্তী ( এবং বানব ) টোটেম-তথা-কুল / কৌম প্রতীক সঞ্জাত হওয়া থেকেই বুঝতে পারি।

কিন্তু ভাদ্র সংক্রান্তিতে তাঁর পুজো কেন? বৃহৎ সংহিতাতে হয়ত এ ব্যাপারে হদিশ মিলবে। গ্রীষ্মান্তে যে সূর্য মেঘ রচনা করে বর্ষণের মাধ্যমে বিশ্বের কর্ম ( অর্থাৎ কৃষি ) সংরক্ষণ করেন তিনিই হলেন বিশ্বকর্মা। অর্থাৎ ভাদ্রের শেষে বর্ষান্তে কৃষিকর্মেব পূর্ণতা হলে, ফসলের প্রতীক্ষা শুরু হয়। তাই সেই কর্মক্ষান্তিতে, ভাদ্রসংক্রান্তিতে তাঁকে পূজা কবে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হয়। তাহলে বিশ্বকর্মা শুধু শ্রমিকের নন, কৃষকেবও উপাস্য ছিলেন একদা। হলধরের ( অর্থাৎ চাষীর ) ভ্রাতা জগন্নাথ ( ওরফে, কৃষ্ণ-তথা-কর্ষণকারী, চাষী ) বিগ্রহ নির্মাণের সঙ্গেও তাঁকে কি সেজন্যই সংযুক্ত করা হয়েছিল? পশ্চিমবাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে যে এইদিন 'রান্না পুজো' প্রচলিত আছে, সেও কি ঐ প্রাচীন শস্যোৎসবেরই স্মৃতিবাহী?

ঘুড়ি উড়িয়ে বিশ্বকর্মার পরব পালন করার যে প্রথা প্রচলিত হয়েছে, সেটা মূলতই সূর্য-পূজার একটা ইঙ্গিত দেয়। শস্য-উৎসব-তথা-উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মভাবনায় সূর্য দেবতার একটা ভূমিকা আছেই। বিশ্বকর্মা পুজোয় সেটাও স্মরণযোগ্য নিশ্চয়ই।

## এগারো ।। মহালয়া : বহু-সংস্কারের সমন্বয়

দুর্গাপূজা উপলক্ষে শারদোৎসবের সূত্রপাত প্রকৃতপক্ষে মহালয়ার তিথি থেকেই শুরু হয়ে থাকে। আশ্বিনের অমাবস্যার এই মহালয়া নামটির উৎসের মধ্যেই এর ধর্মীয় সংস্কারগত তাৎপর্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। এই বিশেষ দিনটিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে স্মরণাতীত কাল থেকে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নামটির নিহিতার্থ সন্ধান করা প্রয়োজনীয় সবার আগে। 'মহালয়' শব্দের আক্ষরিকভাবে সমার্থ হল : 'আনন্দনিকেতন'। সংস্কার-অনুযায়ী ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে আশ্বিনের কৃষ্ণা পঞ্চদশী অর্থাৎ, অমাবস্যা অবধি প্রেতলোক থেকে পিতৃপুরুষের আত্মারা মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন নিজেদের ছেড়ে-যাওয়া গৃহ-পরিজনের মায়ায়, মহালয়ায় তাঁদের সকলের আবির্ভাব সম্পূর্ণ হয় বলেই, সেই দিনটিতে তর্পণের মাধ্যমে তাঁদের পরিতৃপ্তি-বিধান করে প্রতি গৃহেই আনন্দোৎসব পালনের বিধি আছে। আলয় যেদিন মহ ( অর্থাৎ, আনন্দ )-ময় হয়ে ওঠে সেই দিনই হল মহালয়া।

আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ-ওরফে-পিতৃপক্ষের প্রতিদিনই পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করার রীতি একদা প্রচলিত ছিল। শ্রদ্ধা সহকারে যে অন্নজল নিবেদন করা হয়, তা-ই শ্রাদ্ধ; আর তার মাধ্যমে আগন্তুক আত্মাদের তৃপ্ত করা যায় বলেই, একে তর্পণও বলি আমরা ঐতিহ্যানুগতভাবে।

এক কথায় মহালয়া তাহলে হল পূর্বপুরুষের প্রেতকে পূজার বিশেষ তিথি। এই প্রেতপূজা, মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত আদিম একটি বিশ্বাসের লব্ধফল। সেই জন্যই মহালয়ার মতো উৎসবকে স্মরণাতীত কাল থেকেই প্রচলিত বলেছি এই নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে। বস্তুতপক্ষে, নিয়ানডার্টল মানুষও ( যারা কম করেও ৪০,০০০ বছর আগেই ধীরে ধীরে বিলীয়মান হয়ে গেছে উন্নততর প্রজাতি ক্রো-ম্যানীয়দের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে) যেভাবে কিছু-কিছু বিশেষ রীতি বা আচার মেনে মৃতকে সমাধিস্থ করত, তার থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে তারা ঐ মৃতের পুনরাগমন সম্ভব, এমন কল্পনাও করত। সারা

বিশ্বজুড়েই যে, প্রয়াত ব্যক্তির সত্তার পুনরাগমন অসম্ভব নয় এমন ধারণা প্রবহমান আছে সভ্যতার গোড়ার পর্ব থেকেই। প্রাচীন মিশরের পিরামিড-সমাধিগুলির মধ্যে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ত বটেই—মায় ফারাওয়ের আত্মা ফিরে এসে যাতে কোনো রকম চাহিদা অপরিপূর্ণ থাকার কারণে কষ্ট না-পায় সে জন্যে দাসদাসী এমনকি রানীদের পর্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় তার মধ্যে পুরে দেওয়া হতো কোনো-কোনো সময়ে।

॥ ২ ॥

এই প্রেতাত্মার পূজার ব্যাপারটা সর্ববিধ শ্রাদ্ধের মধ্যেই সুস্পষ্ট। মহালয়ার ক্ষেত্রে তাহলে বৈশিষ্ট্যটা কি ?···যে সময়ে মহালয়া তিথি, তখন এদেশে ফসল-ভরা মাঠ সাধারণভাবে থাকার কথা—খরা-বা-বন্যায় শস্য নষ্ট না-হয়ে গেলে মরশুমে পিতৃপুরুষ ছেড়ে-যাওয়া গৃহে ফিরে আসছেন এবং উত্তর পুরুষের স্বাচ্ছল্য দেখে আনন্দিত হচ্ছেন এমন কল্পনার পিছনেও আদিম কিছু প্রত্যয় ক্রিয়াশীল আছে আজো। আদিম পিতামহরা মনে করতেন যে, তাঁরা যে অন্ন ( শিকার, বা ফলমূল, বা অন্য কোনো খাদ্যবস্তু ) অর্জন করলেন, সেটা কোনো-না-কোনো অলৌকিক শক্তির দান। প্রকৃতির অন্তর্লীন বলে-কল্পিত এইসব শক্তির নাম মান্যা ( ই. বি. টাইলর তাঁর 'দ্য প্রিমিটিভ কালচার' বইতে এই শব্দটির মুখপাত করেছেন )।

এই 'অলৌকিক' শক্তিময় প্রকৃতিনিচয়ের মধ্যে পিতৃপুরুষের আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করার একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে : আদিম মানুষের মনের সঙ্গে শিশুর মানসিক-প্রবণতার একটা মৌলিক সমধর্মিতা আছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা একবাক্যে সিদ্ধান্ত করেছেন সবাই। শিশু যেমন তার খাদ্যের জোগানদাতা রূপে পিতা-মাতা বা অন্যান্য সব অভিভাবকদেরই ভাবতে শেখে, আদিম মানুষও তেমনি তার খাদ্য ( শিকার-করা প্রাণী কিংবা সংগৃহীত ফলমূল ) জোগান দেয় যে 'অলৌকিক'-মান্যা, সেও তার পিতৃপুরুষ—এমনই ধারণা করতে অভ্যস্ত হয়েছিল। এই 'মান্যা'-ই কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে দেবতায়। দেবতার উদ্দেশে অঞ্জলি-অর্চনা নিবেদন করা এবং পিতৃপুরুষের আত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তর্পণ-তথা-ভোজ্য-উৎসর্গ করা মূলত একই ব্যাপার। মহালয়ায় এই সংস্কারেরই পরিশীলিত এবং শাস্ত্রবিহিত-ব্যাখ্যান ঘটেছে স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে।

॥ ৩ ॥

স্নানান্তে, জলে—বাঞ্ছনীয়ত বহমান নদীতে—কোমর পর্যন্ত মগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে করাঞ্জলিতে জল তুলে সূর্যের দিকে মুখ করে মন্ত্রোচ্চারণ করবার পর, হাতের জল মুঠি খুলে নদীতে ( বা পুকুরে ) ফেলে দেবার মধ্যে আরো কিছু অতীতকালীন সংস্কার সমাবৃত আছে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সূর্য পূজা এবং নদী পূজার সুপ্রাচীন রীতিও বিমিশ্রিত হয়েছে। সূর্য-উপাসনা-কেন্দ্রিক ধর্মধারা ( কাল্ট ) এবং নদী-বন্দনার-ধর্মধারাও সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের চোখে উর্বরতাকেন্দ্রিত ধর্ম-বিশ্বাসেরই এক-একটি ভাবগত অভিব্যক্তি। সূর্যকে পুরুষশক্তির এবং নদীকে নারীশক্তির প্রতীক রূপে কল্পনা করেছে মানুষ হয়ত কৃষির উদ্ভবের আগে থেকেই —তারপর চাষবাস করতে শেখার পর, রৌদ্র এবং জলের গুরুত্ব কতখানি সেটাও তার উপলব্ধিতে এসেছে।

ফসল যখন মাঠে, তখন ফসলের উৎস যেসব নিসর্গশক্তি—ঐ রৌদ্র এবং জল—তাদের উদ্দেশেও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি এই মহালয়ার তর্পণের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়াত পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশে তর্পণ আর নদী ও সূর্যের উদ্দেশে তর্পণ তখন একত্রে সমাহৃত হয়ে গেছে ভাবনার স্তরে।

এই বক্তব্যটির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে মহালয়া উপলক্ষে পালিত একটি ধর্মাচার পালনের সমস্তটুকু বিশ্লেষণ করলে। বর্তমানে অবশ্য এই আচারটি বিলীয়মান হয়ে এসেছে প্রায় সর্বত্রই। তর্পণান্তে একখণ্ড কাঠের উপর একটি জ্বলন্ত কয়লার টুকরো বসিয়ে সবটা ভাসিয়ে দেবার রেওয়াজ ছিল একটা বিশেষ মন্ত্র আবৃত্তি করার মাধ্যমে। বন্ধুবর ডঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার মন্ত্রটির ভাষ্য করেছেন এইভাবে: 'যাঁরা মৃত্যুলোককে ছেড়ে আমার আলয়ে এসেছেন তাঁরা এই উজ্জ্বল আলোকে অনুসরণ করে অগ্রগমন করুন।' অর্থাৎ, অগ্নিময় উজ্জ্বলতাই হল তাঁদের পথবর্তিকা। মহালয়ার অনুষ্ঠানে সূর্যের ভূমিকাটি এখানে সুস্পষ্ট: তেজোময় ও রশ্মিময় সূর্যই হল পিতৃপুরুষের আলয়—সূর্যালোক এবং পিতৃলোক ভাবনার স্তরে ছিল অভিন্ন হয়ে। ঐ তেজ-রশ্মিময়তার প্রতীকী নির্দেশনই হল জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড; আর জলের ওপর সেটি ভাসিয়ে দেবার তাৎপর্যও সুস্পষ্ট—জল ও উত্তাপ—মাতৃ-ও-পিতৃ শক্তিদ্বয়ের প্রতীক যারা—তারা সমন্বিত হয়ে

শ্রাদ্ধ-বা-তর্পণকে সার্থক করছে, এই রকমই একটা ভাবনা এই আচারের অনুষঙ্গে সক্রিয় ছিল।

মহালয়াকে পিতৃপক্ষের শেষ দিন বলে গণ্য করা যেহেতু, তাই ঐ ভাসমান অগ্নিখণ্ড প্রকৃতপক্ষে পিতৃপুরুষের আত্মাদের পরিতৃপ্ত করে প্রেতলোকে প্রত্যাবর্তনের পথ দেখানোরও দ্যোতক বলে গণ্য করা চলে। বিশেষত, আদিম কাল থেকেই অগ্নিকে প্রেতভয় দূরীকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করে আসা হয়। তাই যে সময়ে প্রয়াত সমস্ত আত্মারা এসে সমবেত হয়েছে বলে কল্পনা করা হচ্ছে, ঠিক তখনই এই অগ্নি-প্রজ্জ্বালনের ব্যাপারটা ঘটান হয়। অশুভকারী যদি কোনো আত্মা থাকে ( আদিম মানুষের মনে তাদের সম্পর্কে প্রগাঢ় ভীতি ছিলই—আজো কি নেই ! ), তবে তাকে বিতাড়িত করার জন্যও ঐ আগুন জ্বালানোর রেওয়াজটা এসেছে মহালয়ার আচারবিধিতে।

মহালয়ার মধ্যে অতএব, পিতৃপুরুষের আত্মাকে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য দেওয়া, সূর্য এবং নদীর পূজা, উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারার অনুসরণ, 'অশুভ প্রেত'-বিতাড়ন প্রভৃতি বহুবিচিত্র সংস্কার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আশ্বিনের অমাবস্যায় পিতৃপুরুষকে এইভাবে নিজেদের ঘরে ফসল তোলার প্রাক্কালে স্মরণ করারই অনুষঙ্গ বহন করেই কার্তিকের পুরো মাসটাই রাত্রে আকাশ প্রদীপ জ্বালানোর রেওয়াজ হয়েছে মনে করা যেতে পারে। ভরা ফসলের মাঠ এবং ঘর চিহ্নিত করার প্রয়োজনে ঐ প্রদীপ জ্বালানো—এর অবলীন কল্পনা, নক্ষত্র লোকের বাসিন্দা পিতৃপুরুষরা যেন এই সমৃদ্ধি দেখে পরিতৃপ্ত হন। উর্বরতা-কেন্দ্রিক কাল্‌টেরই আরেক প্রকাশ আর কি এই উৎসব।

## বারো ।। মহাদেবীর বোধন

দুর্গাপূজার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হিশেবে দেবীর যে বোধন-তথা-জাগরণের প্রথা প্রচলিত রয়েছে, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত পুরাণের কাহিনীটি দিয়েই আলোচনা শুরু করি। প্রাচীন সংস্কার-অনুযায়ী বর্ষার মাসগুলি দেবতাদের বিশ্রামের কাল বলে মনে করা হত ; এই ভাবনা-অনুসারে হিন্দুধর্ম তার পৌরাণিক রূপসহ গড়ে ওঠবার পর থেকেই বিভিন্ন দেবতাব পূজার প্রাক্কালে তাদের বোধনের প্রথা প্রচলিত হয়। দুর্গার পূজা প্রাথমিকভাবে বসন্তকালে হত, মূলত শীতের শেষে নতুন করে শিকার-ও-খাদ্যসংগ্রহের আদিম অভ্যাসকে অবলম্বন কবে গড়ে-ওঠা ধর্মধারা-বা-কাল্‌টের বিবর্তনে। পৌরাণিক কাহিনী-মাফিক, রাবণ বধের প্রাক্কালে শরৎ ঋতুতে ব্রহ্মা দুর্গার অকাল-জাগরণ বা বোধন করেন রামচন্দ্রের নির্বন্ধে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে। এই শারদীয়া বোধনই অকালবোধন রূপে এরপর থেকে প্রচলিত হয়েছে। নবমী তিথিতে রাবণ বধের পর দেবকুল নাকি দেবীকে মহাসমারোহে দশমীর দিন বিদায় দিয়ে কৈলাসধামে পাঠান। মাঝের কদিন রাম-ও-রাবণের যুদ্ধের সময়কালে তাঁরা মহাদেবীর আরাধনা করে তাঁকে তুষ্ট করার পরিণতিতে রামের হাতে রাবণের মৃত্যু ঘটে ।

এই কাহিনী বাল্মীকিতে নেই, কিছু-কিছু প্রাক-মধ্যযুগীয় পুরাণগ্রন্থে আছে। কৃত্তিবাসে অবশ্য রামের দ্বারা দেবীর বোধন করারই কাহিনী বর্ণিত। এই অকাল বোধনকে উপলক্ষ করে ধর্মভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক-এবং-সাংস্কৃতিক-নৃতত্ত্বের কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রশ্নেরই অবতারণা করা যে, সম্ভব হয় এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে সেকথা বলা যায়। প্রথমত, দুর্গার যে ভাবমূর্তিই নানা বিবর্তনের পরিণতিতে ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অন্তরে গড়ে-উঠুক না-কেন, আদিতে তিনি শিকার-ও-সংগ্রহের দেবী রূপেই কল্পিতা হয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে সংশয় নেই। বলিদান-প্রথা সেই শিকারের প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতির অনুবর্তন ; নবপত্রিকার উপচার, আদিম ফলমূলশস্য সংগ্রহের রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

বোধনের যে-পৌরাণিক গল্পই পরবর্তীকালে সংযুক্ত হক না-কেন, দুর্গার পূজা প্রসঙ্গে, মূলে যে ঐ শিকার-ও-সংগ্রহ-নির্ভর ধর্মধারার উপজীব্য আচার-

বিধির সঙ্গে বোধন-বা-জাগরণ-কেন্দ্রিক কিছু সংস্কার ছিলই, তার সন্ধান মেলে লৌকিক বনদুর্গার পূজা উপলক্ষে গাছজাগানোর প্রথার মধ্যে। দেবী সেখানে বৃক্ষবিশেষের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন বলে কল্পনা করা হয় এবং সেই গাছকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেই বনদুর্গার 'বর্ত' ( অর্থাৎ, ব্রত ) বা পূজার মুখপাত করা হয়।

এই সব লৌকিক স্ত্রী-দেবতাই বিবর্তিত হতে-হতে একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে ক্ল্যাসিকাল দুর্গায় পরিণতি লাভ করেছেন। লৌকিক রীতিগুলি বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েও টিঁকে আছে তার মধ্যে, কিন্তু প্রত্যেকটি রীতিব অন্তর্নিহিত প্রাচীনতর ভাবনা-তাৎপর্যের বাইরের ব্যাখ্যাটা পাল্টে গিয়ে কোনো-একটা-কিছু পুবাণ-কাহিনীর উদ্ভব ঘটেছে সেখানে।

সংস্কৃতির ক্রমচলিষ্ণু চরিত্রের জন্য প্রথা, আচার, বিশ্বাস, সংস্কার-ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমনটি যে হামেশাই ঘটে, সেকথা নৃ-বিজ্ঞানী এবং লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন। সুতরাং দুর্গার বোধনের মধ্যে আদিম বৃক্ষ জাগরণ, শস্য-জাগরণ-ইত্যাদি বিশ্বাসই সঞ্চিত হয়ে আছে ; ক্ল্যাসিকাল রামাযণের অনুষঙ্গ হিশেবে যে-সব অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠেছে, সেগুলির মধ্যে বৃক্ষের বোধনের বদলে দেবীর মানবীমূর্তিতে জাগরণের কল্পনাটা ঐসব সংস্কারের সম্পর্কিত আচরণরূপে প্রতিভাসিত হয়েছে।

কিন্তু বৃক্ষজাগরণের কল্পনাটা প্রাথমিকভাবেই বা কেন সঞ্জাত হয়েছিল ? বর্ষার শেষে শরৎকালে নতুনকালে নতুন করে যখন মানুষ স্বচ্ছন্দজীবনের আস্বাদ পেত, তখন প্রকৃতি-উপাসক আদিম মানুষেরা বৃক্ষের অবলীন যে-অলৌকিক শক্তির কল্পনা করত (পূর্বে উল্লেখিত সেই 'মান্যা' ), তাকেই জাগিয়ে তুলত—বরং বলি, জাগিয়ে তোলার ভাবনায় বিশ্বাস করত, মূলত, নূতন করে খাদ্যসংগ্রহের আয়োজন যখন শুরু হত, তখনকার সেই-আরণ্যক-উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসনটা ধর্মধাবার মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিফলিত হত। ফল, মূল, শস্য-ইত্যাদি যখন খাদ্যরূপে প্রয়োজনীয়, তখন তাদের প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করেই এক-একটি দেবকল্পনা দানা বাঁধল। এদের প্রত্যেকটিই সমাবৃত হয়েছে দুর্গার সঙ্গে আরাধিত নবপত্রিকার মধ্যে : কলা ( ব্রহ্মাণী ), কচু ( কালী ),হলুদ (দুর্গা), জয়ন্তী ( কার্তিকী ), বেল ( শিবা ), ডালিম ( রক্তদন্তিকা ), অশোক ( শোক-রহিতা ), মানকচু ( চামুণ্ডা ), ধান ( লক্ষ্মী )। এই সব দেবীদের নাম, পরবর্তী-কালে নির্দিষ্ট হয়েছে, আদিকালে নিশ্চয়ই এইসব তৎসম শব্দের মাধ্যমে এঁরা

পরিচিত হতেন না। এঁরা সবাই মিলেই কালক্রমে দুর্গার সঙ্গে সংমিলিতা হয়ে গেছেন—যদিও এখনও এঁরা বোধনের পর আলাদাভাবে পূজিতা হন। কলা বউয়ের উপস্থিতি এবং তার গলায় শ্বেত অপরাজিতার লতা এবং হলুদ সুতোয় বেঁধে নবপত্রিকা দোলানোও ঐ আদিকালের বৃক্ষোপাসনা-কেন্দ্রিত ভাবনার অনুসরণে। হরাপ্পা সংস্কৃতির শীলমোহরে বৃক্ষস্থিতা দেবীর উপাসনার ছবিও খুঁজে পাওয়া গেছে। সে কথা পরে উল্লেখিত হয়েছে। শরৎকালীন' অরণ্য-প্রান্তরে খাদ্য সংগ্রহের নতুন উদ্যমের সূত্রপাত যে বৃক্ষ দেবতাদের বোধনের মাধ্যমে হত, উত্তরকালে মহিষমর্দিনীর সঙ্গে তাঁরা মিশে গেছেন এবং সেই ক্ষেত্রেও বোধনের রেওয়াজটা থেকেই গেছে। বোধনের মীথ্-বা-পুরাবৃত্ত তারই ওপর গড়ে-তোলা বহিঃ সৌধ।

## তেরো ॥ মহিষাসুরমর্দিনীর প্রত্ন-ইতিহাস

ঋক্‌বেদে উল্লেখিত দেবকুলকে পশ্চাৎপটে সরিয়ে দিয়ে, প্রাগার্য প্রাচীন ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর দেব-দেবীরা সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব কালেই নবোদ্ভূত হিন্দুধর্মের প্রধান উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এই দেবদেবীদের মধ্যে প্রধানা হলেন মাতৃকা দেবী, যিনি উত্তরকালে শক্তিরূপে কথিতা হয়েছেন : আর পুরুষ দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে গৃহীত হলেন শিব। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রের শাসন-এবং-সমাজ-ব্যবস্থা খৃষ্টপূর্ব সতেরোশো শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে প্রাকৃতিক অবক্ষয় এবং বহিরাগত আর্যভাষী এক রণদুর্মদ জাতির আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও, তাঁদের প্রধান দুই উপাস্য—মহামাতৃকারূপিণী কোনো দেবী এবং মহিষশৃঙ্গভূষিত, যোগাসনারূঢ় কোন দেবতা, যথাক্রমে শক্তি এবং শিবরূপে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম-কেন্দ্রিত সংস্কৃতি-চিন্তায় পরমা প্রকৃতি এবং পরমপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

এই শক্তি দেবী নানা নামে ও মূর্তিতে হিন্দু সমাজে কল্পিতা হয়েছেন : চণ্ডী, দুর্গা, উমা, হৈমবতী, কালিকা এবং দশমহাবিদ্যার রূপে আরো নানান্‌ভাবে। প্রত্যেকটি রূপকল্পনাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনী, যাদের অন্যতম হল চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের বিবরণ। এই পুরাণ-কথা গড়ে ওঠার পিছনে যে লোকপুরাণ বা মীথ্‌ লুকিয়ে রয়েছে, অবশ্যই তার একটা ইতিহাসসম্মত ভিত্তি আছে, পরবর্তী সময়ে যা অলৌকিকতাময় পুরাণ-কথার তলায় চাপা পড়ে গেছে।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর বিখ্যাত গবেষণা 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন :

"মহিষমর্দিনী দেবী সম্বন্ধে আর একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই মতে দুর্গা হইলেন ভূমধ্যসাগরাঞ্চলের ব্যাইর্গো দেবী—ইনি সমরপ্রিয়া দেবী। এই ভূমধ্যসাগরাঞ্চলবাসিগণ কর্তৃক মন্‌-খ্‌মের জাতির বিজয়ই মহিষমর্দিনী দেবীর মূর্তির মূল কথা। মন্‌-খ্‌মেরগণ একটি মিশ্র নৃজাতি, খানিকটা ক্যাম্পিয়ান,

খানিকটা অস্ট্রলোইড, কিছুটা অ্যালপাইন্। ইঁহাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মহিষের একটা বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে গো যে-রূপ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল মন্-খ্মেরগণের মধ্যে মহিষও সেইরূপ পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মন্-খ্মের-মর্দনই হইল মহিষ-মর্দন ; ভূমধ্যসাগরীয়গণের সমরদেবী হইলেন ব্যাইর্গো বা দুর্গা ; তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মন্-খ্মের-বিজয়ই রূপ ধারণ করিল দুর্গার মহিষমর্দিনী মূর্তিতে।"

অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁর জীবনকালে শক্তি-তত্ত্ব এবং আনুষঙ্গিক দর্শন-বিষয়ে ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতবর্গের অন্যতম বলে মান্য হতেন। সুতরাং তাঁর মতো বিদ্বান মহিষাসুরমর্দনের মীথ্ গড়ে ওঠা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করতে হবে, সে ত বলাই বাহুল্য।

একালে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে ইতিহাস চর্চার অন্যতম একটি বিশিষ্ট রীতি হল যে, যে-কোনা প্রচলিত লোককথা, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে সম্ভাব্য-স্থলে পাওয়া প্রত্ননিদর্শনের সম্পর্ক কি, সেটা যাচাই করা। এর ফলে নানা অলৌকিক কথার আড়ালে ঢাকা লৌকিক তথা বাস্তব এবং ইতিহাস-সম্মত সত্য-টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হবে। শ্রদ্ধেয় ডঃ দাশগুপ্ত যে দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ অভিমতের অনুকূলে কথা বলেছেন, তার কতখানিতে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সমর্থন মেলে, সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে দেখা যেতে পারে।

যথার্থরূপে মহিষাসুরমর্দিনী বলে যাঁকে গণ্য করা যেতে পারে, তাঁর প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন যা-সব পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে প্রাচীন যে কটি, তারা সবাই হল গুপ্ত যুগের। এলাহাবাদের সন্নিকটে ভিটায় পাওয়া একটি সীলমোহরে খোদিত সিংহারূঢ়া এক দেবী মূর্তিকে স্যার জন মার্শাল দুর্গা বলে গণ্য করেছেন ; এটিই, আর উদয়গিরি এবং ইলোরার গুহাগাত্রে খোদাই করা দেবীর মূর্তি, সেগুলিও মোটামুটিভাবে ঐ সময়কালের বলেই স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর।

অবশ্যই, যে ধরনের ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন, তার বয়স আরো অনেক প্রাচীন। ঐ ধরনের ঘটনা যদি প্রকৃতই ঘটেও থাকে, তাহলে তার সম্ভাব্য সময়কাল আর্যভাষী জাতির আক্রমণের পূর্ববর্তী, কারণ আর্য-আবির্ভাবোত্তর কালে ভূমধ্যসাগরীয় বনাম মন্-খ্মের প্রভৃতি প্রাগার্য প্রত্ন-দ্রাবিড়, প্রত্ন-অস্ট্রিক প্রভৃতি জাতিসমূহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটবার আর কোন

অবকাশ থাকা সম্ভবপর নয়।

সুতরাং : ঐ জাতি-বৈরিতা বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, যার থেকে না-কি মহিষমর্দিনী মীথের সৃষ্টি হয়েছে, তার সময়কাল অন্তত পৌনে চার হাজার বছর আগের হতে হয়। অথচ, প্রকৃত মূর্তিতে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর প্রাচীনতম যে সব প্রত্ন-নিদর্শন পাচ্ছি আমরা, তাদের কারুরই বয়স দেড় হাজার বছরের ওপারে যায় না। তাহলে মধ্যের এই সওয়া দুই বা আড়াই হাজার বছর ধরে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের "দেবী ভাগবত" অংশে অবলম্বিত যে মীথ্‌টি গড়ে উঠেছিল, তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক রূপায়ণ পাওয়া গেল না—এ কেমন করে সম্ভব?

পক্ষান্তরে কোন এক স্ত্রী-দেবতা কর্তৃক মহিষবধের প্রত্ননিদর্শ খৃষ্টপূর্ব কালের সুমেরিয়া থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই দেবী হলেন ধরিত্রী-দেবী নিন্‌-হুর-স্যাগ, তাঁর সামনে মহিষ বধ করা হচ্ছে এমন একটি সীলমোহর বৃটিশ মিউ-জিয়ামে রয়েছে, যার বয়স প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর।

শক্তি দেবীর সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মাতৃকা দেবীর সম্পর্কটা খুব দূরান্বয়ী নয়। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে প্রাচীন সিন্ধুরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ও অন্যবিধ যোগসূত্র যে একটা ছিলই, সে সত্য প্রশ্নাতীত। মধ্যপ্রাচ্যের পর্বত-বাসিনী সিংহবাহিনী সিবিলী দেবীর সঙ্গে উমা হৈমবতীর ভাবগত মিলটুকুর কথা বহু ঐতিহাসিকই বলেছেন। 'উমা' শব্দটির উৎসেও ব্যাবিলনীয় 'উম্মু' বা 'উম্ম' শব্দের সঙ্গে আত্মীয়তা ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। একালে লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে একদেশের ধর্ম-বিশ্বাস, পুরাণকথা, দেবমূর্তিকল্পনা অন্য দেশেও বিস্তৃত হতে পারে। সুতরাং সিংহ-বাহিনী সিবিলী দেবী, যিনি ছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলনের মানুষদের 'উম্মু' বা মা, তথা মাতৃকা দেবী, তাঁরই অনুরূপ কোন দেবী প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রে অপ্রত্যাশিতা নন।

কিন্তু সিংহবাহিনী কোন দেবীর মূর্তির সন্ধান কি মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা বা অন্য কোন সিন্ধু নগরীর প্রত্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার আগে একটি তথ্য আগেই মনে রাখা দরকার: সিন্ধু-মোহরে যত ধরনের প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা আছে, তাদের মধ্যে আছে হাতী, গণ্ডার, মহিষ, ষাঁড়, কুমীর, সাপ, হরিণ, খরগোস, মাছ, মায় 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপ' ধরনের একাধিক প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্নিবিষ্ট অদ্ভুতদর্শন মূর্তি অবধি, কিন্তু সিংহ? নৈব নৈব চ! বরঞ্চ, মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত গিলগামেশের মীথের

একটি উৎকীর্ণ ছবিতে গিলগামেশের সঙ্গে দুটি সিংহের লড়াইয়ের যে দৃশ্য দেখা যায় হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া দু-একটি সীলে হুবহু সেইএকই দৃশ্য দেখি, তফাৎ শুধু দুটি সিংহের বদলে সেখানে রয়েছে দুটি বাঘ !

হয়ত এইটাই স্বাভাবিক ; কেন না সাড়ে চার পাঁচ হাজার বছর আগের মহেঞ্জোদড়ো অঞ্চল যে ঘন জলা-জঙ্গলে আকীর্ণ একটি স্থান ছিল, একথা মোটামুটিভাবে এখন বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীকৃত। জলা-জঙ্গলের প্রাণী—হাতী, গণ্ডার, মহিষ, বাঘ, কুমীর, সাপ প্রভৃতির তাই সেখানকার শিল্পীদের চিত্রের উপজীব্য হওয়া স্বাভাবিক, মরুবাসী প্রাণী সিংহের নয়। মেসোপটেমিয়ার সিংহ-সম্পৃক্ত গল্প তাই স্বভাবতই সিন্ধুরাষ্ট্রের শিল্পীর হাতে বাঘের গল্পে পরিণতি পেয়েছে।

এই পরিবেশে ওখানকার ধর্মবিশ্বাস, দেবমূর্তিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়েও বাঘের একটা ভূমিকা থাকা সম্ভব। একটি সীলমোহর পাওয়া গেছে, যেখানে এক দেবী এবং একটি বাঘের সমন্বিত একটি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। স্পষ্টতই ইনি কোন ব্যাঘ্রদেবী যাঁকে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রের কিছু মানুষ উপাসনা করত। যে সমস্ত প্রাণীর মূর্তি বিভিন্ন মোহরে উৎকীর্ণ দেখা যায়, তাদের সবগুলিই কোন—না-কোনভাবে ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মোহরগুলিতে খোদাই করা পবিত্রতাসূচক বিশিষ্ট চিহ্নই তার প্রমাণ।

পশু-সম্পৃক্ত এইসব ধর্মবিধি ও বিশ্বাস, এগুলি আদিম টোটেম-বিশ্বাসের ধারাকে বহন করে এনেছিল প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্ট্রে। এক-একটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে এক একটি প্রাণীর উত্তরপুরুষ বলে যে কল্পনা আদিমকালে করত, তারই ধারানুসরণ ঘটে গিয়ে উত্তরকালে সেইসব প্রাণীরা তাদের কাছে গোষ্ঠী-প্রতীকী 'পবিত্র পশু' বা টোটেম এ-পরিণত হত।

অর্থাৎ, এক-একটি পশুকে অবলম্বন করে এক-একটি ধর্মীয় ধারা বা কাল্‌ট গড়ে উঠত ব্যাঘ্র-কাল্‌ট, হস্তী-কাল্‌ট, মহিষ-কাল্‌ট, বৃষ-কাল্‌ট ইত্যাদি। অবলম্বন করে যে কাল্‌ট গড়ে উঠেছিল, তারই অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল প্রাচীন সিন্ধুরাষ্ট্রে এমন সিদ্ধান্ত স্বচ্ছন্দেই করা যেতে পারে।

বাঘকে নিয়ে সৈন্ধবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল্‌ট যেমন গড়েউঠেছিল, তেমনই আরও একটি কাল্‌ট গড়ে উঠেছিল মহিষকে অবলম্বন করে, মহিষ-মূর্তির লাঞ্ছন-সংবলিত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সীলমোহরই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এখানে একটি কথা তলিয়ে বুঝবার আছে। বাঘকে অবলম্বন করে গড়ে-

ওঠা কাল্‌ট ছিল যে গোষ্ঠীর, তাঁরা মাতৃকাদেবীর উপাসক, বলে ছিলেন তাঁদের টোটেম-ধারানুসারে বাঘের দেহে অধিষ্ঠাত্রী অলৌকিক সত্তার কল্পনা করেছিলেন দেবীরূপে। কালক্রমে ইনিই ব্যাঘ্রবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; সে কথায় পরে আসছি। পক্ষান্তরে, মহিষ-কাল্‌ট যাঁদের, তাঁরা ছিলেন পুরুষ দেবতার উপাসক—সিন্ধু মোহরে যতগুলি পুরুষ মূর্তি পাওয়া গেছে উপরে উল্লেখিত শিবমূর্তিটি সমেত তাদের মধ্যে অনেকগুলিই মহিষ-শৃঙ্গধারী। স্পষ্টতই ঐ শৃঙ্গধারী পুরুষ-মূর্তিকে মনে করা যায়, মহিষ-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীর উপাস্য অধিদেবতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দু-একটি সীলমোহরে বাঘের মাথায় একজোড়া করে শিং খোদাই করা থাকলেও, সেগুলি মহিষের নয়, বৃষের। ব্যাঘ্র কাল্‌ট এবং বৃষ-কাল্‌ট (সিন্ধুরাষ্ট্রে তার অনুসারী একটি গোষ্ঠীও অতি অবশ্যই ছিল) অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে বা সহযোগিতা করে চলত, এটি তারই প্রমাণ।

কিন্তু মহিষ-কাল্‌ট-অনুগামীদের সঙ্গে ব্যাঘ্র-কাল্‌ট অনুগামীদের সম্পর্কটা সেই রকম সৌহার্দ্যময় ছিল না। সীলমোহরের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে কিন্তু সেই বিশেষ কথাটিই প্রতিভাত হয়। জোড়া বাঘের সঙ্গে সিন্ধুর 'গিলগামেশ'-এর লড়াইয়ের ছবিআঁকা একটি মোহর পাওয়া গেছে, সে কথা ওপরে বলেছি। মেসোপটেমিয়ার পুরাবৃত্তে গিলগামেশের সহচররূপে অর্ধপশু-অর্ধমানব যে এঙ্কিডুর উল্লেখ পাওয়া যায় তার মূর্তিও সিন্ধু রাজ্যের একটি তামার ফলকে খোদাই দেখি। উল্লেখযোগ্য এই যে মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া ঐ তাম্র ফলকে উৎকীর্ণ 'ভারতীয়' এঙ্কিডুর মাথায় একজোড়া মহিষ-শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে; মেসোপটেমিয়ার এঙ্কিডুর মতো বৃষ-শৃঙ্গ নয়। অর্থাৎ 'ভারতীয়' গিলগামেশ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত; এবং তার অনুচর এঙ্কিডু মহিষ-শৃঙ্গধারী। এটা যে দুই কাল্‌টের দ্বন্দ্বদ্যোতক, সে কথা বলাই বাহুল্যমাত্র।

আর একটি মোহরে দেখছি মহিষ শৃঙ্গধারী একটি পুরুষমূর্তি একটি বাঘের সঙ্গে লড়াই করছে। প্রখ্যাত ভারতবিদ্যাবিদ্ ডঃ হাইনৎস মোডে এই মোহরটিকে সিন্ধু রাষ্ট্রে প্রাপ্ত ছ'টি 'ব্যাঘ্রজাতক সীলমোহর'-এর অন্যতম বলে গণ্য করেছেন; তবুও বাঘ বনাম মহিষ-শৃঙ্গধারী পুরুষের লড়াইয়ের এই ছবির অন্যতম তাৎপর্যও আছে: তা হল দুই কাল্‌টের সংঘাত। মাতৃকা-উপাসক ব্যাঘ্র-কাল্‌টের মানুষদের সঙ্গে পিতৃদেবতা (শিব?) উপাসক মহিষ-কাল্‌টের মানুষদের যে সংঘর্ষের প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যা 'গিলগামেশ' ও 'এঙ্কিডু'-র মোহর দুটির মাধ্যমে এখনি করা হল,

তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই মোহরটিতে।

দেবী-ব্যাঘ্র সমন্বিত মূর্তিতে দেবীকে যে বিশেষ ভূষণে, কেশবিন্যাসে আমরা দেখেছি, ঠিক সেই বিশেষ ভূষণ এবং কেশ-বিন্যাস সমৃদ্ধ কয়েকটি নারী-মূর্তির (দেবী?) সঙ্গে প্রবলভাবে সংগ্রামরত একটি ক্রুদ্ধ মহিষকে দেখা যাচ্ছে; আর একটি সীলমোহরে মহিষের আক্রমণে এই দেবী—তথা-নারীরা বিপর্যস্তা। ঐ দেবীরা ঐ বিশেষ ধাঁচের বসন-ভূষণের কারণে ব্যাঘ্র-কাল্‌টের সঙ্গেই সম্পৃক্তা ছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে নির্দ্বিধায়; অতএব এই মোহরটিকেও দুই কাল্‌টে সংগ্রামের সূচক বলে মনে করতে পারি অনায়াসেই। এর পরবর্তী ছবিতে তীক্ষ্ণাগ্র বল্লমের আঘাতে মহিষকে বধ করা হচ্ছে: স্মরণযোগ্য যে, পরবর্তী-কালের মূর্তি-কল্পনাতেও দেবী মহিষাসুরকে বধ করছেন ভল্ল বা ত্রিশূলের আঘাতে, এই রকমই দেখা যায়!

তাহলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সীলমোহরগুলিকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু রাষ্ট্রের দুই পরস্পর বিরোধী টোটেম-অবলম্বী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বই কালক্রমে ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী কর্তৃক মহিষরূপী দেবতার হত্যার মীথে পরিণত হয়েছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ-প্রথিত মহিষাসুর-মর্দিনী মীথের আদি উৎস ঐ খানেই:

কিন্তু কথা ফুরিয়েও ফুরোয় না। মহিষ-মর্দিনী প্রচলিত ধারণায় ব্যাঘ্র-বাহিনী নন, সিংহবাহিনী। পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতিতে সিংহ, ব্যাঘ্রকে পশ্চাদ্‌পটে সরিয়ে দিলেও, সিংহবাহিনীর মতো ব্যাঘ্রাসনা দেবীর মূর্তিরও অপ্রচলন ঘটে নি। এমন কি ব্যাঘ্রবাহিনী চণ্ডিকার মূর্তিও আছে। মহারাষ্ট্রের তুলজাপুরে, গুজরাটের জুনাগড়ে এবং দুই বাংলার অনেক অঞ্চলেই চণ্ডী হলেন ব্যাঘ্রাসীনা। পাঞ্জাবে প্রচলিত লৌকিক চণ্ডীকথার দেবী বাঘের পিঠে চড়ে অসুর নিধন করছেন, এই রকম প্রচলিত আছে। সুতরাং সিংহবাহিনী যে আদিতে ব্যাঘ্রবাহিনীই ছিলেন এই রকম মনে করা যায়।

মেসোপটেমিয়া থেকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত যে মহামাতৃকা দেবীর আরাধনা করা হতো ইতিহাস-পূর্বকালে, তিনি বহুরূপে কল্পিতা হয়েছিলেন—কখনো সিংহবাহিনী সিবিলী, কখনো ব্যাঘ্রবাহিনী সৈন্ধবী দেবী (কি তাঁর নাম ছিল? উম্মু? উমা?), কখনো বা আর কিছু। বাঘ-সওয়ারী দেবী পরে আবার বহু ক্ষেত্রেই সিংহ-সওয়ারী হয়েছেন, যখন আর্যভাষী বৈদিকরা নিজেদের দেবকুলকে সিন্ধুজলে বিসর্জন দিয়ে পরাভূত সৈন্ধবীদের দেব-দেবীদেরই শিরোধার্য করে নিয়ে হিন্দু-

ধর্মের ( 'সিন্ধু' ধর্মের ? ) প্রবর্তন করলেন। সিন্ধুর মাতৃকাদেবীর মতো, সিন্ধুর আদি শিবও তাঁদের প্রধানতম দেবতা হলেন: দেবাদিদেব, মহেশ্বর ( মহিষ-ঈশ্বর ? )। মহিষ-শৃঙ্গধারী সৈন্ধবী শিবমূর্তি বিবর্তিত হল মহিষ-শৃঙ্গতুল্য চাঁদের ফালির শিরোভূষণ-সম্পন্ন 'হিন্দু' শিবের রূপে। কালিকা-পুরাণ মতে, শিবই যে মহিষাসুররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কাহিনীর উৎসেও কি মহিষ-কাল্‌টের সঙ্গে শিবের সংযোগ আছে? চণ্ডীর পদতলে মহিষাসুরের পড়ে থাকার আরেক রূপই কি কালিকার পদতলে শিবের পড়ে থাকা? ভূমধ্যসাগরীয় জাতি ( নৃতত্ত্বমতে আদি-দ্রাবিড়রা এর অন্তর্গত ) মন-খ্‌মের জাতি ( আদি-অস্ট্রিকরা যার অন্যতম ) পরাস্ত ও পদানত করেছে, মহিষাসুর-মর্দিনীর কাহিনী সেই ইতিহাসই সূচিত করেছে, এতখানি বলার মতো 'পাথুরে' প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেল না ঠিকই। কিন্তু প্রাচীন সিন্ধু রাষ্ট্রের ব্যাঘ্র-কাল্‌ট-অনুসারী মাতৃকা উপাসকরা মহিষ-কাল্‌ট-অনুসারী পিতৃদেবতা পূজকদের পরাস্ত করেছিল সে সিদ্ধান্ত এখন আর মানতে আপত্তি কি? দেবীর পদতলে মহিষাসুর ( তথা শিব ) পড়ে আছেন এই ভাব-কল্পনা ঐ জয়-পরাজয়েরই দ্যোতনা বহন করেছে উত্তরকালে। এ জিনিষ প্রাচীন পৃথিবীর অন্যত্রও ঘটেছে। মিশরবিদ্যাবিদ্ মবেট এবং ডেভি দেখিয়েছেন কেমন করে বাজপাখি-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক অন্যান্য টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীকে পরাভূত করার ইতিহাস ব্যঞ্জিত হয়েছে, বাজ-পাখির পায়ের তলায় আর সব প্রাণী পড়ে আছে এই রকম খোদাই মূর্তিতে, যা প্রাচীন মিশরের প্রত্ননিদর্শের মধ্যে বহুল সংখ্যাতেই পাওয়া গেছে। মরেট এবং ডেভি বাজপাখির প্রতীকে হোরাস দেবতা-পূজকদের বিজয় কাহিনীর সাক্ষ্য হিশেবেই সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন। হোরাস-উপাসক রাজা মেনেসের বিজয়কথা সেগুলি।

মহিষাসুর-মর্দিনীর মীথের অন্তরালে যে কাল্‌ট-দ্বন্দ্ব লুকিয়ে ছিল, পরবর্তী সময়ে তাই শাক্ত বনাম শৈবদের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে, এই সূত্রে যে সিদ্ধান্তেও পৌছন চলে। আরও একটি আকর্ষণীয় তথ্য এই যে, বহুভুজা দুর্গামূর্তি ( আট, দশ, বার এমন কি আঠারটি হাত আছে এমন মূর্তিও দেখা যায় )—যা উত্তর-কালে উপাসিত হচ্ছে, তারও আদি উৎস সিন্ধুর মোহরে: অন্তত চতুর্ভুজা দেবীর মূর্তি সেখানে খোদিত হয়েছে বেশ কটি সীলমোহরের উপর। মহিষাসুর-মর্দিনীর আদি রূপ মহেঞ্জোদড়ো-হরাপ্পার সংস্কৃতিতে এই যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারও একটা আদিতর রূপ নিশ্চয়ই ছিল; তারই সন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে পরের অধ্যায়ে।

## চৌদ্দ ॥ দুর্গার বিবর্তন : অরণ্যদেবী থেকে শস্যদায়িনী

যদিও প্রচলিত দুর্গাপূজার সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী চণ্ডিকাকে এক করে দেখা হয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মহলে তবু এই দেবী যে প্রধানতই প্রাক্-আর্যভাষী দ্রাবিড় অথবা অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর উপাসিতা এক প্রধান মাতৃকাদেবতা, যিনি শস্য, বিত্ত, সন্তান, সাফল্য ইত্যাদি দান করতেন বলে মনে করা হত, সেই কথা এখন সমাজবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন। অর্থাৎ, এঁর উৎস খুঁজতে হবে পৌরাণিক নয়, লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে।

সমস্ত প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যেই ধরিত্রী এবং নারীকে প্রধানত এক বলেই গণ্য করা হয়েছে। শস্য এবং সন্তান, প্রাচীন মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রার্থনার ও কামনার এই দুটি জিনিস যাদের থেকে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক ভাবেই সেই পৃথিবী এবং রমণী অভিন্ন এবং একে অন্যের সঙ্গে তুলনীয়া বলেই মনে করা হতো। প্রাচীন মিশরের আইসিস, মেসোপটেমিয়ার ইস্তার, গ্রীসের দিমিতর প্রমুখ সমস্ত সংস্কৃতির প্রধান মাতৃকাদেবীরাই সেজন্য শস্যদায়িনী-রূপেও পরিচিতা ছিলেন। পৃথিবীর আদিবাসীদের বিভিন্ন সমাজের মধ্যেও ঐ চিন্তারই প্রকাশ এখনো দেখা যায়। এই বিশ্বজনীন সূত্রের ব্যতিক্রম দুর্গার ক্ষেত্রেও ঘটেনি। আদিম মাতৃকা-উপাসনার ধারা যখন কৃষিপূর্ব কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে প্রাচীন কালে এসে শস্য-কামনার ধর্মাচারে সঙ্গে মিলে গেল, তারপরেই দুর্গার পৌরাণিক রূপের উদ্ভব। ঐ মার্কণ্ডেয় পুরাণেই দেখা যাচ্ছে যে, দেবী স্বয়ং নিজেকে 'শাকম্ভরী' রূপে পরিচিতা করছেন। ঐ পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' অংশে তিনি 'নিজের দেহ থেকে সৃষ্ট শাকপত্রাদি (অর্থাৎ, ফল, মূল, শাক, শস্য সবই) দ্বারা জগৎকে পালন করার' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, পুরাণকারেরাও এই দেবীকে মূলত 'শস্যদেবী' রূপেই কল্পনা করেছেন।

আর্যভাষী ঋক্‌বৈদিকদের দেবতা সম্পর্কে কল্পনা ছিল পুরুষ-প্রধান। পক্ষান্তরে, যে সিন্ধু সভ্যতা তারা ধ্বংস করেছিল তা ছিল একই সঙ্গে মাতৃকা দেবতা এবং পিতৃ-দেবতা পূজায় বিশ্বাসী। মহিষাসুরমর্দিনীর যেমন আদিরূপ সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরে পাওয়া গেছে, তেমনই পাওয়া গেছে আদিশিবের

মূর্তিও ( শিব ও শিবরাত্রি প্রসঙ্গে সেই আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য )। ঐ রকম একটি সীলমোহরেই একটি ছবি যাতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাদিতোরু এক নারীর জরায়ু থেকে একটি শস্যের গুচ্ছ বেরিয়ে এসেছে। বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই সীলমোহর থেকে বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবতাও শস্যদায়িনী রূপেই স্বীকৃতা ছিলেন ; অর্থাৎ ঐ শাকম্ভরীই। বৃক্ষারূঢ়া এক দেবীর উপাসনার ছবিও সিন্ধুর মোহরে দেখা যাচ্ছে।

এই কল্পনার সূত্র ধরেই দুর্গার দশ হাতে দশ রকমের 'শাক' ( ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে শব্দটি ; কারণ শুধু পাতা নয়, গাছের বিভিন্ন অংশই এখানে শাক হিসেবে গৃহীত হয়েছে ) থাকার ধারণাও গড়ে উঠেছে : পত্র, মূল, করীর ( এক ধরনের মরুভূমির-গাছ ), অগ্র, ফল, কাণ্ড, অস্থিরুঢ়ক, ত্বক, ফুল এবং কবক—এই দশটি 'শাক' দুর্গামূর্তির দশ হাতে রাখার মধ্যেই তাঁকে যে আদিতে শস্যদেবী রূপে কল্পনা করা হতো, তার সূত্র নিহিত।

॥ ২ ॥

দুর্গার আরাধনা একদা হতো বসন্তকালে, শীতের শেষে নতুন ফুল-ফল-পাতা জন্মানোর ঋতুতে। এখন প্রচলিত অকালবোধন শরতের শেষে, বর্ষান্তে আবার গাছপালা সতেজ হয়ে ওঠার এবং কৃষিজাত ফসল প্রায় ঘরে তোলার সময়ে। ১২ শতাব্দীতে জীমূতবাহন 'কালবিবেক' গ্রন্থে এই পূজাকে শবরদের ( অরণ্য প্রান্তবাসী আদিম জাতি বলে পুরাণে গণ্য ) উৎসব বলে উল্লেখ করেছেন। সারা গায়ে লতাপাতা জড়িয়ে কাদা মেখে নাকি প্রাচীনকালে এই পূজার উৎসব হতো, তিনি বলেছেন। জয়দুর্গা, বনদুর্গা প্রভৃতি লৌকিক দুর্গার পূজারীতির সঙ্গে এই আরণ্যক জীবনের দেবতা-ভাবনার মিলটা এখনো দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে দুর্গার 'শাকম্ভরী' মূর্তিকল্পনার কথা কিংবা তাঁর পূজা উপলক্ষে নবপত্রিকার পূজা, এই দেবী আদিতে যে আরণ্যক অর্থনীতির পরিবেশেই গড়ে উঠেছিলেন, তারই হদিশ দেয়। ফল-মূল-শাক-পাতা-কন্দ-ছাল-শাঁস-ইত্যাদি সংগ্রহ ছিল আদিম পিতামহদের জীবিকার বিষয় ; পশুবলির ব্যাপারটিও সেই সময়ের শিকারীজীবনের সূত্র বহন করেছে। স্বয়ং দেবীই শিকারী-নারী-মূর্তিতে মহিষরূপী এক অসুরকে বধ-করছেন, এমন কল্পনা তারই বাস্তব প্রকাশ। তাই আদিম মানুষ বসন্তকালে নতুন ফুল-ফল-পাতা গজানো এবং শীতের শেষে পশুপাখির সুলভ্যতা উপলক্ষে যে ধর্মাচার পালন করত, হাজার-হাজার

বছরের পথ পেরিয়ে তা-ই এসে বর্ষাতে শস্য সংগ্রহের প্রাক্কালের অকাল বোধনের মাধ্যমে দেবীর পূজায় পরিণতি পেয়েছে। বিভিন্ন আদিম গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধতা সূচিত হয়েছে তাদের কুলপ্রতীক ( টোটেম )-সূচক পশু-পাখি এবং গাছপালা-কেন্দ্রিক পরিবেশ এই দেবীমূর্তির উপলক্ষে সমন্বিত হওয়ার ভিতর : সিংহ ( বা বাঘ ), হাতী ( গণেশের মুণ্ডে), সাপ ( শিবের জটায় ), পেঁচা, হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর, পদ্ম, ধানের ছড়া, কলা গাছ, নবপত্রিকা ইত্যাদিতে। ফলমূল সংগ্রহ, শিকার থেকে শুরু করে কৃষিশস্য উৎপাদন অবধি একই জীবন সংগ্রামের বিচিত্র সমন্বিত রূপ তাই দুর্গার মূর্তিতে বিধৃত।

দুর্গার অবলীন যে আরণ্যক আদিম দেবীর হদিশ মিলছে, তিনি তাহলে কে ? প্রাগার্য অস্ট্রিক আদি জাতিদের ওরাওঁ কোমের কোনো-কোনো শাখায় চাণ্ডী বা চান্দী নামে এক দেবীর পূজার প্রচলন এখনও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গ আগেও উল্লেখিত হয়েছে পূর্বের একটি অধ্যায়ে। বাংলার মঙ্গলচণ্ডী এঁর থেকেই রূপান্তরিতা হয়ে এসেছেন এমন সিদ্ধান্ত কেউ-কেউ করেছেন। ইনি গোধিকা-অর্থাৎ-গোসাপে অধিরূঢ়া ; চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-কাহিনীতে দেবীর গোসাপ-মূর্তি ধারণ ঐ টোটেম-বিশ্বাসেরই একটি অপ্রচ্ছন্ন রূপ। অরণ্যচর ব্যাধ কালকেতুর মাধ্যমেই যে দেবীর পূজা নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই ঘটনার অন্তর্কাঠামোও ঐ কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মাতৃকাদেবী হিশেবে পরে ঘটপ্রতীকে ঐ চান্দী-তথা-তাঁর জানপদ-রূপ-মঙ্গলচণ্ডী উপাসিতা হতে আরম্ভ করেন এটাই, তাহলে স্বাভাবিক। চণ্ডীমঙ্গলের গল্পে, অরণ্যচর ব্যাধ ঐ দেবীর দাক্ষিণ্যে শিকার সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে, আবার 'নগর' পত্তনের পর 'বুলান মণ্ডল'-ও চাষবাস শুরু করছে তাঁর কৃপায়। একই সঙ্গে শিকার ও শস্য এদুয়ের অধিষ্ঠাত্রী চাণ্ডী-তথা-চণ্ডী এই বিবর্তনের পথ ধরেই দুর্গার সঙ্গে অভিন্না হয়েছেন উত্তরকালে।

## পনেরো ॥ লক্ষ্মীর বিচিত্র কথা : ধর্মে, পুরাণে, ইতিহাসে

কোজাগরী পূর্ণিমায় যে লক্ষ্মীর আরাধনা হয় বাঙালীর ঘরে, পৌরাণিক লক্ষ্মীর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাঁর মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। ঋক্, শুক্লযজুঃ এবং অথর্ববেদে লক্ষ্মী এবং শ্রী নামে দুই দেবী কল্পিতা হয়েছেন, যাঁরা সৌন্দর্য এবং সম্পদদায়িনী। বিভিন্ন পুরাণে এঁরা ক্রমে-ক্রমে মিলে গেছেন এবং ভৃগুমুনি ও খ্যাতির কন্যা বলে পরিচিতা হয়েছেন তার পরে। বৈদিক বিষ্ণু এবং সূর্যদেবতা যখন পরবর্তী সময়ে এক বলে কল্পিত হয়েছেন, তখন সরস্বতী-উষা-লক্ষ্মী-শ্রী এঁরাও মিশে গেছেন এবং লক্ষ্মীও বিষ্ণুপত্নী হয়েছেন। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার তাৎপর্যও এটিই। সে-কথা, পরে বিস্তারিত ভাবে বলা হবে।

বাঙালীর ঘরের লক্ষ্মী, শিব-দুর্গার কন্যা ; সরস্বতী তাঁর ভগ্নী, কার্তিক-গণেশ দুই ভ্রাতা। কিন্তু পুরাণের মতে লক্ষ্মী দেবসেনা রূপে যখন জন্মান, তখন তিনি স্কন্দ ওরফে কার্তিকের পত্নী ; 'মন্ত্রমহোদধি' গ্রন্থে তাঁকে গণেশপত্নী হিশেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে পদ্মফুল এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তাঁর অন্য নাম পদ্মা ( বা কমলা ) ; আবার মনসা, পদ্মা নামে শিবকন্যারূপে বাঙালীর লৌকিক সংস্কৃতিতে কল্পিত, নামসাদৃশ্যেই সম্ভবত এই পদ্মাও শিবকন্যা হয়ে উঠেছেন। এসব প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি অবশ্য। কিন্তু লক্ষ্মীর সঙ্গে পদ্মের যোগাযোগটা ঘটেছে কেন ? সূর্য পদ্মকে বিকশিত করে, এই অভিজ্ঞতারই ধর্মীয় ব্যাখ্যা হল, বিষ্ণুরূপী সূর্যের শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী এবং পদ্মকে অভিন্ন বলে মনে করা এবং পুরাণবৃত্ত গড়া।

বৈদিক লক্ষ্মী শস্য সম্পদের দেবী নন ; নদীরূপিণী সরস্বতী সেখানে উর্বর পলিজমির উৎস বলে শস্যদাত্রী দেবী হিশেবে গণ্য। এ কিন্তু ঋক্‌বেদের অর্বাচীন অংশের কথা, যখন বৈদিক আর্যভাষীরা চাষবাস শিখেছেন প্রাগার্য ভারতীয়দের কাছ থেকে। লক্ষ্মী, সরস্বতীর সঙ্গে সম্মিলিত হবার পর স্বাভাবিক ভাবেই শস্যদেবী হিশেবেও গণ্যা হলেন।

এইখানেই লক্ষ্মী এবং পৃথিবী-দেবীও অভিন্না হতে শুরু করলেন। বিষ্ণু-পুরাণে আছে বরাহ-অবতার রূপে বিষ্ণু বসুমতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন।

অতএব শস্যদায়িনী ধরিত্রী এবং শস্যদেবী লক্ষ্মী উভয়েই যখন বিষ্ণুপত্নী, তখন দুয়ে মিলেই এক হয়ে গেলেন। এই ধারণাটা বিবর্তিত হয়েছে মহাযানী বৌদ্ধদের বসুধারা-লক্ষ্মীমূর্তিতেও, পূর্ণঘট মাতৃদেবতার বিশ্বজনীন প্রতীক এবং ধানের মঞ্জরী তাঁর হাতে। বাঙালীর লক্ষ্মী-কল্পনাও মোটামুটি এরই অনুরূপ।

॥ ২ ॥

লক্ষ্মীই যদি বসুন্ধরা দেবী হন, তাহলে আদিম মানুষ সমুদ্র থেকে মৃত্তিকার জন্মের যে-কল্পনা করে এসেছে সারা পৃথিবীতে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়েই পুরাণ-বৃত্ত গড়ে উঠতে বাধ্য অবশ্যই। সৃষ্টি হল সমুদ্র-মন্থনের পুরাণ-কথা। ইন্দ্রের ঐরাবত দুর্বাসার-দেওয়া-মালা ছিঁড়ে ফেললে মুনির শাপে ইন্দ্রদেব হলেন লক্ষ্মী-পরিত্যক্ত; দেবী আশ্রয় নিলেন সমুদ্রতলে। বিশ্বচরাচরের শস্য-বৃক্ষ-পুষ্প গেল শুখিয়ে—দেবতারা অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে এবং অবশেষে তাদের প্রতারিত করে বাসুকী নাগ এবং মন্দার পর্বতের সাহায্যে সমুদ্র-মন্থন করে অমৃতভাণ্ড-সহ দেবীকে সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সমুদ্রকন্যা ধনদেবী লক্ষ্মীর, অর্থাৎ বিত্তের প্রতীক হিশেবে সমুদ্রজাত কড়িরও অর্থরূপে ব্যবহৃত হবার সূত্রপাত এখানেই। কড়ির দুই পিঠেরই বিশেষ আকৃতিও মাতৃকাদেবীর সূচক।

এইখানে লক্ষ্মী, ইস্তার এবং ভেনাস—এই দুই দেবীর সঙ্গে তুলনীয়া: বরাহের আক্রমণে ইস্তারের প্রেমিক তম্মুজ নিহত হলে, দেবী তাঁকে খুঁজতে-খুঁজতে পাতালপুরীতে গেলেন; প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার পুরাণে বলে, এরপর শস্যদায়িনী ঐ দেবীকে দেব-নর নির্বিশেষে আরাধনা করে ফিরিয়ে আনেন। এই দেবীই গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতিতে ভেনাসের (ইস্তার=স্টার=শুকতারা= ভেনাস, এইভাবে বিবর্তিত) রূপে, বিবসনা মূর্তিতে শ্রী ও সম্পদ দান করতে ঝিনুকের ভেলায় ভেসে পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে পুরাণ-কথা আছে। দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ সবাই তাঁকে বন্দনা করেছিলেন নাকি তখন। এ প্রসঙ্গে বত্তি-চেল্লীর 'বার্থ অব ভেনাস' ছবিটিতে এই দৃশ্য বিধৃত থাকার কথা মনে পড়বে নিশ্চয়ই! লক্ষ্মীর সমুদ্র থেকে উঠে আসার ভারতীয় পুরাণ কথার সঙ্গে ঐ গ্রীকো-রোমক পুরাবৃত্তের এই মিলটা লক্ষণীয়। মহাবলীপুরমের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণা সমুদ্রোত্থিতা সামান্যলক্ষ্মীদেবীকেও অনুরূপভাবে বিবসনা দেখি;

ভেনাসের মতো তিনিও দ্বিভুজা। এই নগ্নতা, শস্য উৎপাদন-কেন্দ্রিক উর্বরতার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক লেন-দেন ছিল। একের কাহিনী থেকে অন্যে প্রেরণা পেতে পারে। আবার উত্তরকালে গ্রীকো-রোমক এবং পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতিও একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইস্তার-ভেনাস-লক্ষ্মী এর ফলে দেবকল্পনায় খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন। আদিতে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ছিল না, গ্রীক বিত্তদেবী এথেনার পেঁচাই সম্ভবত লক্ষ্মীর পেঁচায় পরিণত হয়েছে। হিন্দু সংস্কারানুযায়ী অতঃপর তাকে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের অবতংসে বলে মানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

॥ ৩ ॥

তাহলে লক্ষ্মীর বাহন ( বা লক্ষ্মী-উপাসকদের কুলকেতু-ওরফে-টোটেম ) কি ছিল? সমুদ্র-মন্থনের মিথে দিক্‌নাগ ( হাতী )-কর্তৃক দেবী বন্দনার বিবরণটা তাঁকে কালক্রমে হস্তীবাহনা গজলক্ষ্মীতে পরিণত করেছে; কমলেকামিনী রূপে বাঙালীর ঘরে ইনি পরিচিতা। তাঁর গণেশপত্নী হবার বিস্মৃত-কাহিনীর উৎস হয়ত সেটিই। ভাইবোনে বিয়ে হওয়া 'ট্যাবু' হবার ফলশ্রুতিতে ঐ গল্প বিস্মৃতি-বিলীন হয়েছে। কুনিন্দ-রাজাদের মুদ্রায় তাঁকে হরিণসহ কিংবা সিংহবাহনা রূপে দেখি; এর থেকে তাঁকে দুর্গার কন্যারূপে কল্পনা করা সহজ হয়েছে। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় লক্ষ্মী সিংহ-এবং-ময়ূর-আরূঢ়া; কার্তিক-পত্নী হিশেবে তাঁকে ভাবা হত কেন, এ থেকে বোঝা যায়। শশাঙ্কের মুদ্রায় লক্ষ্মী হংসবাহিনী; অর্থাৎ, সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর অভিন্নতার কল্পনা আছে এর পিছনে। নেপালের পটচিত্রে তিনি কচ্ছপবাহিনী; সাঁওতালী পুরাণ-বৃত্তের কচ্ছপের পিঠে পৃথিবীর মাটি সমুদ্রের জল থেকে উঠে-আসার সেই কাহিনী এর উৎসে থাকতে পারে। পেঁচা এসেছে এর পরে। রাতজাগা এই পাখিই শস্যক্ষেত্রের এবং ধন-সম্পত্তির উপযুক্ত প্রহরী বলে মনে করা হয়েছে যেহেতু। কোজাগরীও, ঐ শস্য পাহারাই!

স্পষ্টতই, লক্ষ্মীদেবীর উৎস এবং বিবর্তনকাহিনী আকর্ষণীয় রকমের বিচিত্র। প্রাচীন অবৈদিক লক্ষ্মী, যিনি ধন ও শস্যদেবী ছিলেন তাঁর অনেক কিছুই পরবর্তীকালের পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির লক্ষ্মীর মধ্যে গৃহীত হলেও—আলপনার পদচিহ্ন, পদ্ম ইত্যাদি, ( যেগুলি বিশ্বজনীন ভাবে অতি আদিম কাল থেকেই শুভদ্যোতক বলে গৃহীত, নৃতত্ত্ববিদরা এমনই মনে করেন—) অনেক কিছুই আবার

গ্রহণ করা হয়ও নি। কোজাগরী লক্ষ্মীর ব্রতকথায় ঐ দুই 'লক্ষ্মী'র দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। বাঙালীর লক্ষ্মীপূজোয় বরাহদন্ত,কুবেরের মুণ্ড—ইত্যাদির প্রতীক ব্যবহার আদিমতর এক সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বহন করে—যা ভারতের অন্যত্র নেই। খোড়ের নৌকা তৈরী এই উপলক্ষে একই সঙ্গে আমন ধান ওঠার আগে বাণিজ্য-প্রস্তুতি এবং বৃক্ষপূজার আদিম স্মৃতির ঐতিহ্য-সমন্বয়। এর সঙ্গে আর্য ভারতের লক্ষ্মী-উপাসনার বিরোধ রয়েছে। সমুদ্র-মন্থনের মিথে, লক্ষ্মীর অর্থাৎ বিত্তের আবির্ভাবের ফলশ্রুতিতে 'শ্রমজীবী' অসুরদের 'বুদ্ধিজীবী' দেবকুল কর্তৃক প্রতারিত হয়ে অমৃতবঞ্চিত হবার পিছনে যে সামাজিক দ্বন্দ্বের অবচেতন চিন্তা সক্রিয় ছিল, তারই ভিন্নতর রূপ বলে এই বিরোধকে গণ্য করা যায়।

লক্ষ্মী মূলত বিত্ত-সম্পদের দেবী বলেই, শ্রেণী-সমাজের কল্পনায় তিনি ওপর-তলার বিত্তবান্‌দের স্বার্থকে রক্ষা করেছেন। তাঁর প্রতিশক্তি রূপে অলক্ষ্মীকে কল্পনা করা হয়েছে 'অনার্য' দেবীরূপেই। তাই অলক্ষ্মীকে বিদায় করা এবং লক্ষ্মীকে বরণ করার রেওয়াজ ওপরসিঁড়ির সমাজপতিরা চাপিয়ে দিয়েছেন। তৈরী হয়েছে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর নানান্ ব্রত কথা—যাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিকগুলি এই বইয়ের প্রথম পর্যায়ের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কৃষি-বিত্ত এবং বাণিজ্য-সম্পদ যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেছেন লক্ষ্মী তাঁদেরই দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আর সাধারণ মানুষ তাঁর আরাধনা করেছেন এই আকাঙ্ক্ষায়, যাতে তাঁরাও তাঁর প্রসাদে সেইরকম বিত্তাধিকারী হতে পারেন। অর্থাৎ, লক্ষ্মী হলেন এক অর্থে আকাঙ্ক্ষার অধিদেবী, ভক্তি বা ভয়ের নন! এরকমটি কিন্তু সচরাচর দেখাই যায় না দেব-কল্পনায়।

## ষোল ॥ দীপাবলী ও কালীপূজা : প্রাগিতিহাসের উত্তরাধিকার

পাল-পার্বণ-কেন্দ্রিক আর পাঁচটা ব্যাপকভাবে-পালিত উৎসবের চেয়ে দীপাবলী তথা দেওয়ালীর কয়েকটি বিশেষ ধরণের নিজস্বতা আছে, যেগুলিকে সমাজতত্ত্বের অভিনিবিষ্ট ছাত্রের চোখ দিয়ে বিচার করলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিছু-কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় ; সংস্কৃতির ইতিহাসের বহু ফেলে-আসা পর্বের স্মৃতি লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে।

প্রথম কথা, বড উৎসবগুলির মধ্যে এইটিই বোধহয় একমাত্র, যা ভরা-অমাবস্যায় পালিত হয়। মানুষের সাংস্কৃতিক উদ্বর্তনের যাত্রাপথে সূর্যপূজা-ওরফে-দিনের আরাধনা এবং চন্দ্রপূজা-ওরফে-আলোকিত রাত্রির উপাসনা প্রায় বিশ্বজনীন হলেও, অন্ধকার রাত্রির মধ্যপ্রহরে মৃত্যুরূপা কোনো দেবীর এইভাবে পূজা করা বাস্তবিকই তুলনারহিত।

দীপাবলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা বা কালীর প্রসঙ্গটিই প্রথমে বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। যেখানে পরিশীলিত সংস্কৃতিতে উপাসিতা সমস্ত মাতৃকাদেবীই বহু আবরণে-আভরণে সন্ত্রান্তভাবে সুসজ্জিতা, সেখানে এই বিশেষ দেবী নগ্না কেন ? প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ন-প্রস্তর যুগের 'ভেনাস ফিগারাইন'-গুলি যদি তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গেই সম্পর্কিত হয়, তাহলে এই নগ্ন-প্রতিমার হয়ত প্রাথমিক একটা উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পরিদৃষ্ট কালিকার 'ধ্যানমূর্তি' বিষয়ে ভাববাদী আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত ভক্ত-সমাজে যে-প্রত্যয় এবং আস্থাই থাকুক না-কেন, সংস্কৃতিতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেই একথা জানেন যে, ধর্ম যেমন, ধর্মের উপজীব্য কোনো দেবমূর্তিও তেমনই—কতকগুলি বাস্তব এবং ব্যবহারিক কার্যকারণের সূত্রে বিশেষ কোনো একটা রূপে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। সুতরাং অন্য সমস্ত মাতৃকাদেবীর মতো বসনাবৃতা হয়ে উপাসিতা হন না যেহেতু এই দেবী, তাই এঁর এই মূর্তিভাবনার পিছনে নগ্ননারীমূর্তি-কেন্দ্রিক আদিম কোনো ধর্মধারা ( বা কাল্ট ) যে অবলীন হয়ে আছে, সেটা মেনেই নেওয়া যায়।

কালিকা যে মূলত আদিমকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই ধারায় অনুবর্তন

করে একাল পর্যন্ত এসেছেন, এমন বক্তব্যের সমর্থনে বাস্তব তথ্যের কিছু সন্নিবেশন অবশ্যই দরকার। কালিকার বিভিন্ন নামান্তরের মধ্যে তার কিছু হদিশ মেলে। কাত্যায়নী ( কাত্য+অয়ন+ঈপ্ ; কাত্য প্রাচীন ভারতের একটি আরণ্যক জাতি, শবরদের শাখা বলে কেউ-কেউ মনে করেছেন ), কৌশিকী ( কুশিক অর্থে পেঁচা ; কুশিক জাতির টোটেম বা কুলপ্রতীকী প্রাণী ; এই কুশিকরাও প্রাচীন ভারতের অন্যতম আদিবাসী গোষ্ঠী ; এঁদেরই উপাস্যা দেবী ইনি ), পর্ণশবরী ( স্পষ্টতই, আরণ্যক শবর জাতির সঙ্গে সম্পর্কিতা ) ইত্যাদি নাম আদিম প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতার সঙ্গে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিজড়িত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এই দেবীর যোগটিকেই সূচিত করে।

যে কোনো মাতৃকাদেবীকেই যে হিন্দু ধর্মনির্ভর সংস্কৃতিতে 'ভগবতী' বলে উল্লেখ করা হয়, তার মূলগত তাৎপর্য সম্ভবত কালিকামূর্তির মধ্যেই পরিপূর্ণ ভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রত্ন-প্রস্তর পর্বের নগ্না 'ভেনাস' মূর্তিগুলিকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিদ্বানের এক ধরনের উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারার উপজীব্য বলে মনে করেন। এই জন্যে ঐ সব 'ফিগারাইন'-গুলিতে নারীত্বসূচক দেহচিহ্নগুলি অত্যন্তই প্রকট করে দেখানো হত। নগ্নিকা মূর্তি ছাড়া ঐ ধরনের চিহ্নগুলি ( 'ভগ'-তথা-যোনি-ইত্যাদি) সুস্পষ্ট করে দেখানো অসুবিধা ; অতএব 'ভগবতী' নামের মূল উৎস ধরে কালিকামূর্তির আদিমতম প্রকরণটি কি-ধরনের ধর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেটি সহজেই বোঝা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

পরবর্তীকালে অবশ্য কালিকাদেবীর ঐ আদি রূপ ( আর্কিটাইপ ) যে-ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তাতে অবশ্য উর্বরতাকেন্দ্রিত চরিত্রটি রূপান্তরিত হয়ে দেখা যাচ্ছে। মাতৃকা দেবীদের মধ্যে দুর্গা 'শাকম্ভরী' রূপে যে ভাবে উর্বরতাতন্ত্রের ঐতিহ্যকে বহন করেছেন, তেমনটি কালিকার ক্ষেত্রে হয়নি। কালী, পরে যে-ভাবেই হোক ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় অনুভাবিত হতে শুরু করেছেন।

প্রাগিতিহাসের পর্ব পেরিয়ে, প্রাচীন ইতিহাসের সময়কালে কালিকামূর্তির সমতুল্যা রূপধারিণী এক দেবীর উল্লেখ দেখি শতপথ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে : নির্ঋতি। সম্ভবত, নৈর্ঋত কোণ ( দক্ষিণ-পশ্চিম ) এঁরই নামানুসারে, যেমন ঈশান কোণের ( উত্তর-পূর্ব ) অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হলেন ঈশানী। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে পৌঁছে ইনি দিক্‌দেবীরূপে গণ্যা হয়েছেন। খুব সম্ভবত তখন থেকেই

রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী এক দেবী হিশেবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ; সূর্য-তথা-দিবার অধিষ্ঠাতা দেবতার উপাসক ধর্মধারা সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়েই। আলোকিত রাত্রি উপাসনার একটি ধারা চন্দ্রপূজায় পরিণতি পেয়েছে আর নিশ্চন্দ্র রাত্রের আরাধনার উপজীব্য যে দেবী, তিনিই দিক্‌দেবী নির্ঋতি তথা কালিকা।

এই রাত্রি-তথা-কালিকা উপাসনায় প্রদীপ জ্বালানোর প্রথার দুটি তাৎপর্য নির্দেশ করা যেতে পারে : নিশ্চন্দ্র অমাবস্যার রাত্রে আকাশের অগণ্য তারার অনুকৃতি হিশেবে এই প্রদীপ জ্বালানোর রীতির উদ্বর্তন হতে পারে রাত্রিপূজার অনুষঙ্গ রূপে ; আর, আদিমতর কালে—যখন মানুষ আগুনকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিল, তখন থেকেই যে গুহামুখে আগুন জ্বালিয়ে হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের যেমন ঠেকাত, তেমনি ভূত-প্রেত অশরীরী সত্তাদেরও ঐ আগুনের মাধ্যমে তাড়ানো সম্ভব বলে কল্পনা করত। তাই কালীকে যখন মৃত্যুদেবী রূপে কল্পনা করে পূজা করতে শুরু করেছিলেন আমাদের প্রাচীন প্রপিতামহের দল, তখন থেকেই আদিমতর অগ্নি প্রজ্জ্বালনের সংস্কার এই দীপ জ্বালানোর মধ্যে অনুবৃত্ত হয়ে এল ধীরে-ধীরে।

কালীর এই মৃত্যুরূপা চরিত্র কল্পনার সূত্রেই সম্ভবত পদতলে শবদেহের (যা পরে কালক্রমে শিবরূপে কল্পিত) অবস্থানও ঘটেছে। প্রেত, মৃত্যু, নরক ইত্যাদির কল্পনা ও ধারণা যে কালীপূজার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত সেকথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা : পূজার আগের রাত্রি যে ভূতচতুর্দশী, নরক চতুর্দশী ইত্যাদি নামে উল্লেখিত হয়, সে ঐ বিশেষ কারণেই।

'পরলোক'-গত স্বজন এবং বন্ধুরা যে ঐ সব 'ভয়ঙ্কর এবং অন্ধকার' রাত্রে (চতুর্দশী এবং অমাবস্যায়) নিরাপদে গন্তব্য স্থলে যেতে পারে, তার সুবিধার জন্য ঐ দুই রাতে নদীর জলে জলন্ত প্রদীপ ভাসানোর রেওয়াজ পূর্ববঙ্গের কোনো-কোনো জায়গায় আছে। আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা কার্তিক মাসের রাত্রে যে আকাশ-প্রদীপ জ্বালানো হয়, সেও অনেকটা ঐ একই কল্পনার অনুসূত্র হিশেবে। চতুর্দশী এবং অমাবস্যা তিথিতে এই ধরনের পরিশীলিত চিন্তার ভিন্নতর একটি প্রকাশ দেখি বাজি পোড়ানোয়। বারুদের ব্যাপারটা অবশ্য বহু পরে এসেছে, কিন্তু 'ভূত-প্রেত' ইত্যাদিকে নানা ধরনের আওয়াজের মাধ্যমে তাড়াতে চাওয়ার মানসিকতা ঐ গুহাবাসের আদিম যুগ থেকে বহমান। কাঠকুটো জ্বালিয়ে আলো আর আগুন তৈরী করা এবং পাথর-

টাথর ফেলে দল বেঁধে চেঁচামেচি করে বিকট সব শব্দ-করা—এই দুই আদিম-কালীন আত্মরক্ষার পদ্ধতিই পরিশীলিত হয়ে হয়ত বহু সহস্র বছর অতিক্রম করে সমাবৃত হয়েছে কালীপূজার (এবং চতুর্দশীর রাত্রে) আতসবাজি পোড়ানোতে।

দীপাবলী উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো কিছু সংস্কার এবং বিধিও এখানে প্রাসঙ্গিক ভাবে বিশ্লেষণ করে নেওয়া উচিত। ধরুন, ভূত চতুর্দশীতে 'চৌদ্দ শাক' সংগ্রহ করে করে খাওয়ার রীতিটি। 'শাকম্ভরী'-ওরফে-দুর্গার পূজার সময়েও কিন্তু এই প্রথা পালিত হয় না, যা হয় কালীপূজার উপলক্ষে। বর্তমানে প্রচলিত রূপে অবশ্য কালীপূজা বাঙালীর সংস্কৃতিতে দুর্গাপূজার চেয়ে অর্বাচীন, কিন্তু তারই আদি রূপটি যে প্রাচীনতর কালের সংস্কারবাহী, সে ত আমরা দেখেইছি ওপরের আলোচনায়। এই শাক সংগ্রহের ব্যাপারটি প্রাগৈতিহাসিক শিকারী-ও-সংগ্রহজীবী পর্বের ক্ষীণ এবং আবছায়া একটি স্মৃতিকে বহন করে, এ কথা বলা চলে। বলির ব্যাপারটাও পশু শিকার করে আগে উপাস্য রূপে কল্পিত দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করার ঐতিহ্যানুগত রূপান্তরণ বলতে পারি। দুর্গামূর্তির সামনে বলিদানের উৎসও ঐ একই জায়গায় নিহিত। সে কথা আগেই বলেছি।

॥ ৩ ॥

এত আদিমতা প্রকট থাকা সত্ত্বেও, একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশে বর্তমান রূপে কালীপূজার বয়স, দুর্গাপূজার চেয়ে অর্বাচীন। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে, দুর্গাপূজার হদিশ যেখানে ১২ শ শতকেই মিলছে, কালীপূজা সেখানে আরও শ-চারেক বছর পরের ব্যাপার। তার পরবর্তী চার শতাব্দীর মধ্যে অবশ্য কালী এবং চণ্ডী বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সবচেয়ে ব্যাপকভাবে আরাধ্যা দেবীতে পরিণত হয়েছেন, শিব যেমন হয়েছেন সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা। বাংলার অধিকাংশ গ্রামদেবতাই কোনো-না-কোনো ভাবে শিবের রূপান্তর—এবং সব গ্রামদেবীই প্রায় শক্তি-তথা-কালী / চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না—এইটেই আমরা দেখি।

ভারতের অন্যত্র কালিকা আরাধনার কথা সরাসরি কবে থেকে দেখি আমরা? শতপথ এবং ঐতরেয়তে উল্লেখিত নির্ঋতি দেবীর কথা বাদ দিলে, কালিকার প্রথম উল্লেখ্য বিবরণ মেলে 'খিল হরিবংশে': মদ্য-মাংস-প্রিয়া এই

দেবী শবর-বর্বর-পুলিন্দদের আরাধ্যা বলে বর্ণিতা সেখানে। 'কুমারসম্ভবে'ও কালী খুব প্রধানা কোনো দেবী বলে গণ্যা নন। বাক্‌পতির 'গৌড়বহো'-তে উল্লেখিতা পর্ণশবরী এবং ভবভূতির 'মালতীমাধবে' বর্ণিতা করালা দেবীরাও কালীরই নামান্তরিত রূপ।

আসল কথা সুপ্রাচীন লোকায়ত মাতৃকা সাধনা একদিকে যেমন পরিশীলিত সংস্কৃতিতে মহাদেবী-উপাসনায় বিবর্তিত হল, অন্যদিকে, তন্ত্রের বিশেষ প্রভাব যখন থেকে পুনরুজ্জীবিত হল, তখন থেকে তেমনি ভাবেই কালিকা সাধনারও একটা ধারার নতুন অভ্যুদয় ঘটল ; অন্তত বাংলা দেশে।

বিক্রম সংবৎ প্রবর্তিত হয়েছিল কার্তিকের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে বছরের প্রথম দিন ধরে। অর্থাৎ ভূতচতুর্দশী থেকে বছর শুরু করেই। তবে বিক্রমাব্দ তেমনভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়নি, যদিও কালীপূজার মূল উৎসব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে এ তথ্যও প্রাসঙ্গিক।

কালীপূজার তিথিতে অলক্ষ্মী পূজার ব্যাপারটাও প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয় একটু ; কেননা, প্রাগিতিহাসের ছিন্নসূত্রের অবশেষ তার মধ্যেও আছে। গোবর দিয়ে তৈরী অলক্ষ্মীর মূর্তি তৈরী করে, কলার পেটোয় বসিয়ে পুজো করে, তারপর কুলোয় চাপিয়ে বাড়ির চৌহদ্দীর বাইরে ফেলে দিয়ে এসে, তারপরে পিটুলির লক্ষ্মী-নারায়ণ-কুবের মূর্তির পূজার এই রীতির মধ্যে—কৃষিপূর্ব এবং তার পরবর্তী দুই পর্বের সংস্কারই বিমিশ্রিত হয়ে গেছে। পশুর দেহাবর্জনার মধ্যে অশুভ শক্তি লুকিয়ে থাকার সংস্কার প্রাক্-কৃষি পর্বের, যখন ঐ বস্তুর ফসল-বৃদ্ধিকারী ক্ষমতার পরিচয় মানুষ পায়নি, তখনকার। পিটুলি-তথা-শস্য দিয়ে তৈরী মূর্তিকে ধন ও সমৃদ্ধি বলে পূজা করার সংস্কার যে উত্তর-কৃষি পর্যায়ের, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু দেওয়ালীর সন্ধ্যায় এই রীতি পালিত হবার তাৎপর্য কি? কালী-পূজার রাত্রে অশুভ অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহকে বিতাড়নের অন্যান্য সে-সব কল্পনার কথা ওপরে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে অলক্ষ্মী বিতাড়নের ব্যাপারটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। লক্ষ্মী-কুবের ইত্যাদির আরাধনা অশুভের বিতাড়নের পর শুভের আবাহন-দ্যোতক। পূজার জায়গায় সারা রাত প্রদীপ জ্বালানোর তাৎপর্য, আগে বলা হয়েছে। এই শুভ সময়ের সূত্রপাতের কল্পনা, বিক্রম সংবৎ—তথা, নতুন বছর প্রবর্তনার যে মানসিকতা ঐ তিথিতে ছিল, তার সঙ্গে সুসমঞ্জস্য। আলোক-উৎসব সে কারণেও কিছুটা হয়ত।

এই আলোক-উৎসব প্রায় সর্বদেশেই কোনো-না-কোনো ভাবে আছে। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, আয়ারল্যাণ্ডে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, চীনে, জাপানে, থাইল্যাণ্ডে—কোথায় না? কোথাও আসন্ন বিপদ (কল্পিত, অবশ্যই!) ঠেকাতে, কোথাও ডাইনী-প্রেত ইত্যাদিকে তাড়াতে, কোথাও নতুন বছরের শুভ সূচনা ঘোষণা করতে, কোথাও আবার পূর্বপিতামহদের পথ চেনাতে!…অর্থাৎ, দীপাবলীর আলোকসজ্জার এবং শব্দমুখরতার পিছনে যে আদিম মন সক্রিয়—তা প্রায় বিশ্বজনীন!

কে বলতে পারে ক্রিসমাস ট্রির গায়ে যে আলো ঝোলানোর প্রথা আছে, দীপাবলীর মতোই আদিম অরণ্যের অন্ধকার দূর করার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের ফসিল তার মধ্যেও লুকিয়ে আছে কি-না!

## সতেরো ॥ ভাইফোঁটার ইতিহাস

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বাঙালী হিন্দুর ঘরে-ঘরে অনুষ্ঠিত ভাইফোঁটার উৎসব সবারই পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে সেটি এখন একান্ত-ভাবেই লোকাচার রূপে প্রতিষ্ঠিত। কতদিন থেকে যে এই প্রথা বাঙালীর ঘরে প্রচলিত হয়েছে তার স্পষ্ট কোনো হদিশ না পাওয়া গেলেও, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সূত্রের সাহায্যে তার চেষ্টা করা চলে। এ প্রসঙ্গে প্রাচীনতম উল্লেখ যা পাওয়া যায়, তা কিন্তু ভারতের অন্য প্রান্তে বোম্বাইয়ের অনহিলবাড় পাটনে পাওয়া একটি তালপাতার পুঁথিতে মিলেছে। সর্বানন্দসূরি নামে এক প্রাচীন আচার্য তাঁর 'দীপোৎসবকল্প' বইতে (১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধ) লিখেছেন যে, মহাবীরের জীবনাবসান হলে রাজা নন্দিবর্ধনের বোন ভাইয়ের শোক নিবারণ করতে এই তিথিতে তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে অন্নগ্রহণ করান এবং সেই থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালনের প্রথা চালু হয়েছে। এই বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি যদি থাকে, তাহলে খৃঃ পূঃ ৫২৭ সাল থেকেই এই প্রথার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে: শুধুমাত্র বাঙালীর ঘরেই বা এর প্রচলন কেন এবং এর সঙ্গে ফোঁটা দেওয়ার রীতি আর যম-যমুনা সম্পর্কিত মন্ত্রই বা কি করে গড়ে উঠল? দ্বিতীয় সমস্যাটিরই আগে বিচার করা যেতে পারে হয়ত।

যম এবং তাঁর ভগ্নী যমীর উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সেখানে যমী যমকে বিয়ে করতে চাইলে যম তাঁকে নিবৃত্ত করছেন এর অসঙ্গতি বুঝিয়ে, এমন বর্ণনা আছে। যম যমীকে সেখানে বলছেন যে, অতি আদিম কালে ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ হত বটে, কিন্তু পরে এই রীতি অনুচিত বলে গণ্য হয়েছে। দেবতারা যমীর এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানলে ক্রুদ্ধ হবেন, অতএব যমী যেন অন্য পতি সন্ধান করেন।

পরবর্তীকালে হিন্দু পুরাণে যমীকে আর বিশেষ দেখা যায় না। শুধু মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে যে, তিনি মত্ত বলরামের স্নানের আহ্বানে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক হলে তাঁর হলের প্রবল আকর্ষণে যত্রতত্র গমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন থেকে নাকি তাঁর যমুনা নদী রূপে পরিচয়। স্পষ্টতই এই বিবরণ নদী সেচ ব্যবস্থা কৃষি এবং শস্য উৎপাদন সম্পৃক্ত আচার হিশেবে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন

ইত্যাদির ইঙ্গিতবাহী রূপক। আবার ভ্রাতার পরিবর্তে অন্য পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করার যে সামাজিক প্রথার কৃষির পত্তনের আগেই সূত্রপাত হয়েছিল, তারও হদিশ আবার ঐ বৈদিক বিবরণের মধ্যেই দেখি।

তাহলে, যমী (বা যমুনা) কর্তৃক যমকে পতিরূপে বরণ করতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাতা হবার পরিণতিতে তিনি বলরামের সহগামিনী হন এমন সংস্কারই প্রাচীন পুরাণে প্রতিফলিত হয়েছে। কালক্রমে জনমানসে এই বৈদিক এবং পৌরাণিক কারণটা বিস্মৃত হয়ে পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোতে বোন-কর্তৃক ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় কপালে ফোঁটা দেওয়ার রীতি রইল অব্যাহত।

॥ ২ ॥

স্বভাবতই, এই ফোঁটা দেওয়া এবং মন্ত্রপাঠের মধ্যে একটা আদিম জাদু-বিশ্বাসের ধারানুসরণ দেখা যায় বলে মনে করতে পারি। ভাইয়ের আয়ু কামনার মাধ্যমে মৃত্যুদেবতাকে প্রতিরোধ করার এই জাদু-বিশ্বাস-সম্পৃক্ত আচার স্বাভাবিকভাবেই যম এবং তার সূত্র ধরে যমী-তথা-যমুনাকে, এই প্রথার পালনীয়তার কারণ-হিশেবে-গড়ে তোলা লৌকিক কাহিনীর মধ্যে নতুন করে ও নতুন তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত করল। আবার হেমন্তের মুখপাতে ফসল তোলার প্রাক্কালে বোন তার ভাইকে আয়ু ও সমৃদ্ধি কামনা করে বরণ করছে, কৃষিকেন্দ্রিত সমাজে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা প্রথা।

কার্তিক মাসে যম পূজার যে লৌকিক প্রথা 'যমপুকুর ব্রত' বলে পরিচিত —এ প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ করা দরকার। সেখানেও যমরাজা-যমরাণীকে সাক্ষী রেখে বাপ এবং ভাইয়ের 'লক্ষেশ্বর' হবার মন্ত্র পড়া হয় অর্থাৎ মৃত্যুদেবতাকে পূজার মাধ্যমে তুষ্ট রেখে ভাইয়ের হিতকামনা করার এই ব্রতাচার মূলত ভাই ফোঁটারই সমগোত্রীয়। আবার যমপুকুর ব্রত সুপ্রসব কামনায় করা হয় যেহেতু, তাই এটি উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মাচার বলেও গণ্য হবে সমাজবিজ্ঞানীর কাছে। সুতরাং এর সঙ্গে শস্য উৎপাদক সমাজের সম্পর্কটাও নিবিড়।

কার্তিকের অমাবস্যায় দীপাবলী উৎসবের মাধ্যমে প্রেতবিতাড়নের আদিম সংস্কার প্রতিফলিত হয়, তারপরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পালন—সেটাও মূলত মৃত্যুরোধক সংস্কারজাত। ফোঁটা দিয়ে যমের 'দুয়ারে কাঁটা' পড়ানোর জন্যে জাদুকেন্দ্রিক মন্ত্র উচ্চারণ প্রাগৈতিহাসিক সূত্রবাহী সন্দেহ নেই। ফসলীঋতুর সূত্রপাতে এটি পালন করা প্রাচীন ইতিহাসের অনুষঙ্গকে এনেছে; কিন্তু এখন এর প্রচলনের

মধ্যে আর কোনো আদিম বা প্রাচীন ধর্মচিন্তা প্রবল নয়—একটা সুন্দর সামাজিক প্রথা হিশেবেই এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যমোপসানার ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তাটুকু বিলীয়মান যমপুকুর ব্রত পালনের মধ্যে গেছে থেকে।

এইজন্যেই স্মৃতিশাস্ত্র যে হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত একদা, সেখানে ভাইদ্বিতীয়া উপলক্ষে যে স্মার্ত মন্ত্র তৈরী হয়েছিল 'যমরাজের, বিশেষত যমুনার, প্রীতির জন্য আমার ভাইকে এই অন্ন গ্রহণ করালাম'—এই মর্মে, সেটিও অপ্রচলিত হয়ে গেছে। বাংলা মন্ত্রে আর যমকে 'প্রীত' করার আকাঙ্ক্ষা নেই; বরং তার 'দুয়ারে কাঁটা' দিয়ে একটা লড়াইয়ের মনোভাবই দেখা যায়!

এর মধ্যেই সম্ভবত লুকিয়ে আছে ভাইদ্বিতীয়ার একান্তভাবে বাঙালীয়ানার বিষয়টি। বাঙালীর লৌকিক ধর্ম এবং আচারবিধি মূলতই প্রাগার্য প্রত্ন-অস্ট্রিক প্রত্ন-দ্রাবিড সংস্কৃতির ধারাকে ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে বলে স্মৃতিশাস্ত্র সেখানে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারেনি। এইজন্য এখানে ভাইফোঁটাও একটি ব্রতধর্মী পার্বণে পরিণত হয়েছে। ভারতের অন্যত্র, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের আর্য সংস্কৃতির বলয়ে স্মৃতির বিধান অনুযায়ী এই তিথি পালিত হয় দীপাবলী উৎসবের অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে। যম-যমুনার সঙ্গে চিত্রগুপ্তের পূজোও হয় সেখানে কেন, তা সহজবোধ্য। ভাইয়াদুজ অথবা যমদ্বিতীয়া নামে পরিচিত এই দিনের উৎসব বাঙালী বোনেদের মতো যমের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি! পক্ষান্তরে পশ্চিম ভারতে এইদিন নববর্ষ; হিন্দীভাষী বলয়ে দোয়াত-কলম পুজো ইত্যাদি নানা উপলক্ষে লৌকিক উৎসব প্রচলিত হলেও, মূলত শাস্ত্রীয় মন্ত্র-বিধান ইত্যাদির মাধ্যমেই সেগুলি পালিত হয়। কিন্তু বাঙালীর ঐতিহ্যের যে একটি নিজস্বতা আছে, ভাইফোঁটার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধান করলে সেটি নিশ্চিন্তভাবেই বোঝা যায়।

## আঠারো ॥ শিব ঠাকুরের গোড়ার কথা

মহেঞ্জোদড়োতে তিনমাথাওয়ালা কোনো এক দেবতার চিত্রসম্বলিত একাধিক মোহর পাওয়া যাওয়ার পর হরাপ্পাবিদ্যার প্রথম আচার্য স্যর জন মার্শাল তাঁকে পৌরাণিক শিবদেবতার আদিরূপ বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। হরাপ্পা-সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক না কেন, অন্তত এই বিষয়ে একটি আজ অবধি দ্বিমত পোষণ করেননি কেউই। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যে শিবের যে বহুবিচিত্র নাম এবং বর্ণনা আছে, তাদের অনেকগুলির সঙ্গেই এই দেবমূর্তির রেখা এবং প্রকরণগত সাদৃশ্য অনস্বীকার্য।

মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহরের ছবিতে সেই 'আদি শিব' দেবতা যোগ-সাধনায় যাকে কূর্মাসন বলে, অবিকল তেমন ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট; দুই হাতে অনেকগুলি বালা বা কঙ্কণজাতীয় অলঙ্কার, গলায় কয়েকটি হার (কোনো-কোনো উৎসাহী বিশেষজ্ঞের মতে সাপ), তিনমাথার উপরে মহিষের জোড়া শিং-বসানো মুকুট। এই দেবতার পরিধানে কিছু নেই এবং পুরুষাঙ্গটি ঊর্ধ্বমুখ। এঁকে বেষ্টন করে আছে: একটি করে গণ্ডার, মহিষ, বাঘ, হাতী, এবং মানুষ; আর আসনের তলায় রয়েছে দুটি ভেড়া। এই একই দেবমূর্তি-খোদাইকরা অন্যান্য কিছুসংখ্যক মোহরে অবশ্য এই পশুমূর্তিগুলি গরহাজির এবং সেই সব মোহরগুলির ওপরে উৎকীর্ণ হরফগুলিও কিছু পরিমাণে পৃথক।

পরবর্তীকালে মহাভারতে শিবকে যে সমস্ত নাম ও অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে, তার কয়েকটি হল: 'ত্রিশীর্ষ' 'ত্রিবক্ত্র' 'যোগাধ্যক্ষ' 'ঊর্ধ্বলিঙ্গ' 'শার্দুলরূপ' 'নাগচর্মোত্তরচ্ছদ' 'গণ্ডলিন' 'পশুপতি' এবং 'দিগ্‌বাস'। এরমধ্যে 'পশুপতি' অভিধাটির ওপরই মার্শাল গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী করে; কিন্তু স্পষ্টতই অন্য অভিধা কটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

আরও পরবর্তীকালের 'শিবাষ্টক' শ্লোকে শিবকে বলা হয়েছে 'করিচর্মাগ', 'কৃত্তিপট', 'আজিবিষাণধর' এবং 'বৃষরাজ-নিকেতন।' 'করি' এবং 'কৃত্তি' শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন; 'আজিবিষাণ' হল গণ্ডার-শৃঙ্গ এবং 'বৃষরাজ-নিকেতন'

অর্থে 'মহাবৃষ-দেশবাসী।' মহাবৃষ ছিল সৌবীর সিন্ধু এবং আরট্ট ভূমির মধ্যবর্তী দেশ, অর্থাৎ এখনকার পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল। স্পষ্টতই সিন্ধুসভ্যতা বিকশিত হয়েছিল যে ভূখণ্ডে, সেখানকার দেবতা বলেই গণ্য করা হয়েছে শিবকে।

কিন্তু আদিতে এই দেবতা অভিহিত হতেন কোন্ নামে? প্রাগার্য যে জনগোষ্ঠী সিন্ধু-সংস্কৃতির ধারক ছিলেন, তাঁদের লিপিমালা আজো অপঠিত থাকায়, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হাজির করা সম্ভব নয়। অতএব পরোক্ষ সূত্র অনুসন্ধান না করলে আর এক পা-ও এগোনো যায় না। সিন্ধু-সংস্কৃতি যাদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল বলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই অভিমত দিয়েছেন, সেই আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর সাহিত্য তথা সংহিতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে হবে অতএব: অর্থাৎ ঋগ্বেদের শ্লোকের অরণ্যে। অথর্ববেদের মধ্যেও প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়, যদিও তার কতখানি আর্য-প্রভাবিত আর কতটা নয়, সেটা বিতর্কিত।

ঋগ্বেদে এক ত্রিশীর্ষ দেবতার উল্লেখ আছে:

ক আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিলেন। সপ্তরশ্মি **ত্রিশিরাকে** বধ করিলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভী সমস্ত অপহরণ করিলেন॥

খ শিষ্টপালনকর্তা ইন্দ্র অভিমানী ও সর্বব্যাপী তেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে ত্বষ্টার পুত্র **বিশ্বরূপের তিন মস্তক** ছেদন করিলেন॥

গ. সেই প্রভু ইন্দ্র বহুসঞ্চিৎকারী **দাস** জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, **মস্তক-ত্রয়বিশিষ্ট ষট্‌চক্ষু** শত্রুকে দমন করিয়াছেন। ত্রিত ইহার তেজে তেজস্বী হইয়া লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করিয়াছেন॥

এই শেষ শ্লোকটির পরের অংশে ইন্দ্র-কর্তৃক শত্রুপুরীর ধ্বংসসাধনের, শুষ্ণ নামক 'দাস'-এর হত্যাসাধনের এবং শতদ্বারবিশিষ্ট শত্রুপুরী থেকে সম্পদ হরণের উল্লেখ আছে। অন্যত্র শুষ্ণ নামক 'দাস'-কে শৃঙ্গবিশিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন বৈদিক ঋষি। এছাড়া 'বৃষশিপ্র' 'বৃষাণিন' প্রভৃতি শৃঙ্গসজ্জিত শিরোভূষণধারী 'দাস' বা দস্যু জাতীয়দের উল্লেখও দেখি।

সুতরাং ত্রিমস্তক, ষট্‌চক্ষু এবং বৃষ (বা মহিষ)-শৃঙ্গধারী 'দাস' বিশ্বরূপ ত্বষ্টার বৈদিক বর্ণনার সঙ্গে মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত 'শিব'-মূর্তি-অঙ্কিত সীলমোহর-

গুলির আবয়বিক সাদৃশ্য অবশ্যই নূতন কিছু চিন্তার উদ্রেক করে। ঋগ্বেদ-রচয়িতা আর্যভাষীগোষ্ঠীর বাহিনী ইন্দ্র নামক অধিনায়কের ( পরবর্তীকালে যিনি দেবতা রূপে গৃহীত ) নেতৃত্বে 'দাস' বা 'দস্যু' নামক জনগোষ্ঠীর নগরগুলি বিধ্বস্ত করেছিল আনুমানিক চার থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কোনো সময়ে, ঋগ্বেদের মধ্যে উল্লেখিত নক্ষত্রসংস্থানের গাণিতিক বিশ্লেষণ করে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সে কথা প্রমাণ করেছেন। এই দাস বা দস্যু (বা অসুর বা অহি ) রূপে সাধারণভাবে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার ধারক জনগোষ্ঠীকেই গণ্য করা হয়ে থাকে হরাপ্পা-তত্ত্ববিদ্‌দের মহলে। কাজে-কাজেই ঐ মোহর-লাঞ্ছিত সিন্ধু-দেবমূর্তিই পরবর্তীকালে ঋগ্বেদ-সূক্তগুলি সঙ্কলিত হবার সময়ে ইন্দ্রশত্রু ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপ ত্বষ্টা রূপে আখ্যাত হয়েছে, এমন ভাবলে ভুল হবে না।

ত্বষ্টা বা ত্বষ্টৃর পুত্র এই বিশ্বরূপের পরিচয় কি? ঋগ্বেদে না পেলেও পরবর্তী সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণে এবং দেবী ভাগবতে সে বিষয়ে একটি হদিশ পাওয়া গেছে: ত্বষ্টৃর পুত্ররূপে সেখানে বৃত্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রচলিত হিন্দু পুরাণের ধারণায় বৃত্র আবার বিশ্বরূপের অনুজরূপে কথিত। কিন্তু এটা পরবর্তী সংযোজন। ইন্দ্র-বৃত্র সংঘাতের মীথ ঋগ্বেদে একটি প্রধান কাহিনী-উপজীব্য, এ কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বৃত্রনিধনের গল্পটি আর্যভাষী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এমনভাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, বৈদিক আর্যদের বিরোধী আবেস্তা-অনুগামী ইরাণীয় আর্যদের পুরাকাহিনীর মধ্যেও তার সুবিস্তৃত উল্লেখ দেখি। মীথোলজির কল্পকাহিনীর অ-বাস্তব অংশটুকুকে বাদ দিয়েও, তাহলে এইটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, বৃত্র নামধারী কোনো দাস ( বা অহি )-বংশীয় অধিপতি আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর ইন্দ্র ( ঋগ্বেদ-অনুসারে ) কিংবা থ্রৈতেয়ন ( আবেস্তা-অনুসারে )-নামক নায়কের হাতে নিহত হয়েছিলেন, এটা ইতিহাসের সত্য। উল্লেখযোগ্য যে, বৃত্র আবেস্তায় বেরেথ্র বলে কথিত এবং তাঁরও তিনটি মাথা ( 'রামাযস্ত', জেন্দ্ আবেস্তা )। থ্রৈতেয়ন অবশ্যই ঋক্‌সূক্তে কথিত ত্রিত। বৃত্র তথা বেরেথ্র হলেন অহি ওরফে অজি।

ত্রিমস্তক-এবং-ষট্‌চক্ষু-সম্পন্ন বেরেথ কে আবেস্তায় 'দ্রুজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে একাধিক জায়গায়। 'দ্রুজ' সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় জাতি 'দ্রুহ্য'-এর সঙ্গে একই অর্থ বহন করে। সেক্ষেত্রে প্রচলিত পৌরাণিক সংস্কার অনুযায়ী বৃত্রকেও আর্যজনসম্ভূত হতে হয়, যদিচ ঐ পৌরাণিক সংস্কার-অনুযায়ীই, দ্রুহ্যবংশীয়রা শর্মিষ্ঠার সন্তান বলে মাতুলকুলাগত প্রাগার্য অসুররক্তেরও অংশী-

দার। পৌরাণিক রূপক বাদ দিলেও, এটুকু মনে করা চলে যে প্রাগৈতিহাসিক দ্রুহ্যবংশীয়দের সঙ্গে আর্য-নয়, এমন জনকোমের রক্ত সম্পর্ক ছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই দ্রুহ্যদেরকে 'দ্রাবিড়' বলেও মনে করেছেন কেউ-কেউ। সেক্ষেত্রে, আদি-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষরাই সিন্ধু সংস্কৃতির স্রষ্টা ছিলেন, এমন মতাবলম্বীরাও একটা ভাল নজীর পেতে পারেন নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে। অবশ্য সে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধের যে মিথ ঋগ্বেদের বিভিন্ন শ্লোকে ছড়িয়ে রয়েছে; শ্লোকগুলিকে সংশ্লেষণ ও বিন্যাস করলে যা দাঁড়ায়, তা হল এই: দনুর পুত্র অহি বা দাসবংশীয় বৃত্র সপ্তনদী (সিন্ধু) র জল রুদ্ধ করে রেখেছিল (সম্ভবত বাঁধ বেঁধে)। আর্যভাষী একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নায়ক ইন্দ্র অন্যান্য 'দস্যু'-অধিপতিদের মতো বৃত্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করে। বৃত্র মায়াবলে মেঘ সৃষ্টি করে সূর্য আচ্ছাদন করে পৃথিবী অন্ধকার করে দিলে, ইন্দ্র বজ্র নামক ভীষণ অস্ত্রের সাহায্যে মেঘ বিদীর্ণ করে এবং সেই অস্ত্র নিয়েই বৃত্রকে আক্রমণ করে। আহত বৃত্র জলের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে তার মা দনু সন্তানকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বজ্রাস্ত্রে বৃত্রের নিধন ঘটিয়ে ইন্দ্র বন্দী জলধারা মুক্ত করে বৃত্রপুরী প্লাবিত করে দেয় এবং সেখানকার ধনরত্ন এবং গাভী লুণ্ঠন করে এবং পুরনারীদের ধর্ষণ করে সদলবলে; যে সব অপকর্মে 'দাস'-বংশীয় কিছু বিভীষণও যোগ দেয়।

স্পষ্টতই শত্রুকবলিত মহেঞ্জোদড়ো নগরীর শেষলগ্নের ইতিহাস এবং এই কাহিনীর সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়। হত্যা, লুণ্ঠন এবং জলপ্লাবনের প্রত্নিদর্শন মহেঞ্জোদড়োতে এমন ভাবেই পাওয়া গেছে যে, ঐ নগরীর পরিসমাপ্তি কি ভাবে ঘটেছিল সেটা প্রশ্নাতীত।

সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের পূর্বকালীন বৈদিক গবেষণায় অবশ্য ইন্দ্র ও বৃত্রের এই সংঘাতকে একটি নেচার-মীথ হিশেবে গণ্য করা হতো। বৃত্র জলনিরুদ্ধকারী মেঘের রূপক এবং ইন্দ্র বজ্র-বিদ্যুতের। উভয়ের সংঘর্ষে মেঘ বিদীর্ণ হয়ে জলের বন্দীত্ব ঘুচে গেল। স্বাভাবিকভাবেই, অন্তরীক্ষ-দেবোপাসক ঋগ্বেদীয় এবং আবেস্তীয় আর্যদের কাহিনীতে এই নেচার-মীথ সৃষ্টি হয়েছিল—এমন ভেবে নিলে ভুল হবার কিছু হেতু নেই। কিন্তু একালীন লোকবৃত্ত-গবেষণায় নেচার-মীথ বিশ্লেষণ করার পদ্ধতির মধ্যে ইতিহাসের বস্তু-উপাদান বিচার করার রীতি এমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে যে, আজকে আর শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সংঘটনের একটি রূপক বলেই একে গণ্য করা চলে না; বিশেষত যখন ইতিহাসের

উপকরণ এর থেকে খুঁজে বার করা অসম্ভব কিছু একটা ব্যাপার নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোনো কাহিনী মীথ থেকে লিজেণ্ডে বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয় কোনো-না-কোনো বাস্তব ঘটনার সূত্র ধরেই, তার ওপর কল্পনার রং ধরাতে-ধরাতেই।

ঠিক একই নেচার-মিথ আবেস্তার মধ্যেও আছে, আলাদা ভাবে ইন্দ্র-বৃত্র ওরফে থ্রেতেয়ন তথা বেরেথ্রঘ্ন-বেরেথ্র-মীথ থাকা সত্ত্বেও। ঐ নেচার-মীথে-তিশ্‌তার হল জলদানকারী দেবদূত এবং অপ্‌ওশা হল জলরোধকারী দৈত্য। তিশ্‌তারের হাতে অবশেষে জলের অপহারক অপ্‌ওশার মৃত্যু হয় এবং নিরুদ্ধ জলরাশির মুক্তিলাভ ঘটে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আদি-আর্যভাষীদের লোকপুরাণে এই জলরোধকারী শক্তি এবং জলরাশির মুক্তিদানকারী শক্তির সংঘাতের একটা কাহিনী প্রচলিত ছিলই—যা ইরাণীয় আর্যভাষী এবং ভারতীয় আর্যভাষীদের মধ্যে দুভাবে কল্পিত হয়েছে: তিশ্‌তার বনাম অপ্‌ওশা এবং ইন্দ্র বনাম বৃত্র। আবার ইন্দ্র-বৃত্র কাহিনীটি আবেস্তায় নূতন ভাবে সংযোজিত হয়েছে বেরেথ্রঘ্ন বনাম বেরেথ্র সংঘর্ষের বিবরণী সমেত। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল সেই সুদূর প্রাক্-ইতিহাসের যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে দাস/অহিনায়ক বৃত্র এবং আর্যনায়ক ইন্দ্রের সংঘর্ষ হয়েছিল বলে এবং কালক্রমে সে কাহিনীর বিবরণী লিজেণ্ডের স্বরূপ ধারণ করেছিল বলে। মহেঞ্জোদড়োর পতন থেকে ঋগ্বেদের সূক্ত সংকলনের মধ্যে প্রায় পাঁচশ বছরের দূরত্ব, যে সময়কালের মধ্যে বাস্তব ঘটনার ওপর কল্পনা, পুরাকাহিনী এবং অলৌকিক-সংঘটনে-সার্বিক-বিশ্বাসের রং জমতে-জমতে সেটি লিজেণ্ডে পরিণতি লাভ করতে পারে স্বচ্ছন্দেই। আর তারই ফলে বিশ্বরূপ স্রষ্টার ত্রিশীর্ষমূর্তি-উপাসক সিন্ধুরাষ্ট্রনায়ক বৃত্র অহি ঋগ্বেদে এবং আরও পরবর্তীকালে শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত হচ্ছেন, স্বয়ং ত্রিশীর্ষ এবং ষট্‌চক্ষুষ্মান্ হিসেবে। প্রতিবেশী আবেস্তানুসারক-ইরাণীয় আর্যভাষীরাও সেই কাহিনীকে নিজেদের সংহিতার মধ্যে আত্মস্থ করেছেন স্বাভাবিকভাবেই।

বিশ্বরূপ স্রষ্টা (সিন্ধুজনকৌমভাষায় কি তাঁর নাম ছিল কে জানে!) বৃত্রে রূপান্তরিত হলেন কিভাবে, সেটা না-হয় যা-হোক একটি কারণ-শৃঙ্খলার মাধ্যমে বোঝা গেল। কিন্তু বৃত্রের 'শিব'রূপে বিবর্তন ঘটল কেমন করে? 'শিব' নামের আবির্ভাব হল কি করে পৌরাণিক যুগে, এবং কি করেই বা তিনি আর্যদের প্রধান দেবতায় পরিণতি লাভ করলেন এবং বৃত্রহন্তা আর্যমহানায়ক ইন্দ্র

দেবতারাজরূপে স্বীকৃতি পেলেও, শিবের তুলনায় তাঁর মাহাত্ম্য হল খর্ব, সে সব প্রশ্নের জবাবও প্রাসঙ্গিকভাবে দিতে হবে তার সূত্রে।

বৃত্র-হত্যা এবং দাসরাজ শম্বরের নিরানব্বইটি পুরের ধ্বংস-সাধনের পর ইন্দ্র-বাহিনী 'বৃত্রপত্নী' তথা দাসনারীদের মুক্ত জলধারার মতোই বার করে নিয়ে এসেছিল, এবং অভিলাষিণী স্ত্রীর মতো পৃথিবী ইন্দ্রের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করেছিল এ বিবরণ স্বয়ং বৈদিক কবিরাই দিয়েছেন এবং তাঁরাই ইন্দ্রকে অন্যত্র অভিহিত করেছেন 'ধর্ষণকারী' রূপে। অর্থাৎ দাসবংশীয়া সিন্ধু-জন-কোমের নারীরা বিজেতা আর্যভাষীদের উপপত্নী হয়ে তাদের অন্দরমহলে ঢুকতে বাধ্য হলেন ; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিয়ে এলেন নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, আচরণবিধি এবং দেবকল্পনাকেও ; আর্যশিবিরের তাঁবুতে-তাঁবুতে ঢুকিয়ে দিতে পারলেন সেই সবকিছুকে নিজেদের সম্ভ্রমের অবমাননার প্রতিশোধক হিশেবে। এঁদের সন্ততি-প্রসন্ততিরা ধীরে ধীরে মাতুলকুলের ধর্মবিধি পালন এবং দেবতার পূজার্চনা কালক্রমে ব্যাপক এবং প্রকাশ্যভাবে করতে লাগল। মূর্তিহীন মূরদেবা: নিন্দক আর্যদের কল্পনার মধ্যে আবির্ভাব ঘটল মূর্তিধারী দেবতাদের। শিশ্নদেবা: দাসদের যে কোনোকালে তারা ঘৃণা করত, তা প্রায় ভুলেই গেল শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্ট-উপাসক পৌরাণিক আর্যধর্মীয়রা, সিন্ধুজনের পশু-উপাসনা রূপান্তরিত হল আর্যদের দেবদেবীর বাহন-কল্পনায়, অথর্বীয় মন্ত্র-তন্ত্র অভিচার মায়া ইত্যাদি গ্রাস করল আর্যমানসকে। বিজয়ী জনগোষ্ঠীর এতবড় আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক পরাভবের নিদর্শন ইতিহাসে আর খুব বেশি নেই।

পাকিস্থানী প্রত্নবিৎ পণ্ডিত এ. এইচ. দানী সিন্ধু বালুচিস্তান অঞ্চলের 'শিবি' নামধারী একটি জাতির সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন একটি নিবন্ধে। শেওহান এবং শিবিপুরা নামে দুটি জাতিগোষ্ঠীরও ঐ অঞ্চলে একদা অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন নৃতত্ত্ববিদরা কেউ-কেউ। বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার কিছু দূরে শিবিস্থান নামে একটি ছোট কিন্তু সুপ্রাচীন শহরের অস্তিত্ব এখনো রয়েছে। চিতোরগড় অঞ্চলে একটি খননকার্যের সময় 'মঝ্‌ঝিমিকায় শিবি জনপদ'-এর উল্লেখসহ একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে কয়েকবছর আগে।

শিবিজাতি, শিবি জনপদ ইত্যাদির প্রত্ন-ইতিহাসকালে উপাসিত দেবতা ( ত্বষ্টাবৃত্র )-ই কি কালক্রমে শিবে রূপান্তরিত হয়েছেন? এবং আর্যভাষীদের সঙ্গে প্রাগার্য এই সব জাতির সংমিশ্রণের ফলশ্রুতিতে তিনি উত্তরকালের হিন্দু বিশ্বাসের সর্বপ্রধান তিন দেবতার একজন হিশেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন? এ

কথার সমর্থনে পূর্ণায়ত যুক্তির প্রতিষ্ঠা করা এখন অসম্ভব বললেই চলে, কারণ যে অঞ্চল এবং যে জাতিগোষ্ঠীর কথা এখানে বলছি, সেখানে এবং তাঁদের মধ্যে এখন সার্বিক ভাবে মুসলিম ধর্মেরই ব্যাপ্তি। নৃতনতর কোনো প্রত্ননিদর্শ যদি মেলে, কিংবা তাঁদের মধ্যে প্রচলিত লোককথা ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে যদি এ সম্পর্কে স্বীকার্য এবং গ্রহণীয় কিছু তথ্য বা তথ্যের উপাদান পাওয়া যায়, তবেই এই অনুমানের বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো দুটি কথা বিচার্য। মহেঞ্জোদড়ো এবং হরাপ্পা এই শহরদুটির নামের তাৎপর্য কি? এখন না হয় 'মহেঞ্জোদড়ো' অর্থে সিন্ধি ভাষায় 'মৃতের পুরী'—কিন্তু যখন সে নগরী পাঁচ হাজার বছর এবং তার তারও আগে 'জীবন্তের পুরী' ছিল তখনও কি ঐ শব্দের ঐ অর্থ ছিল? অবশ্যই সম্ভবপর নয় সেটি। তাহলে কি এমন ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে যে, সিন্ধু-জনকোমগুলি মহেঞ্জোদড়োকে যে নামে উল্লেখ করত আর্যদের ভাষায় সেটি অনূদিত হয়ে এবং কালপরম্পরায় প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে আধুনিক সিন্ধি ভাষায় মহেঞ্জোদড়োতে পরিণত হয়েছে? মহেন্দ্র (শিব)-দৃঢ় (দুর্গপুরী) —মহেঞ্জোদড়ো, এই ভাষাগত বিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। স্মরণযোগ্য, ঋগ্বেদের ইন্দ্র হলেন 'দৃঢ়হা'। হরাপ্পা নামটিও এভাবে বিশ্লেষণ করা আদৌ অসম্ভব নয়: 'হর' (শিব) শব্দের উত্তরপদ হিসেবে 'আপ্পা' থেকে গেছে; সিন্ধুজনপদ-বাসীরা এই শহরকেও সম্ভবত শিব (তদানীন্তন ভাষায় তাঁরা তাঁকে যা বলতেন সেইরূপে) নামাঙ্কিত করেছিলেন। 'আপ্পা'-বাচক দ্রাবিড প্রত্যয় আমাদের অপরিচিত নয়, সম্ভবত আদি-দ্রাবিড ভাষাতেও তা বিদ্যমান ছিল এবং সেটিই এখনো টিঁকে আছে। ইরাবতীর নিকটবর্তী হরাপ্পাকে যজ্ঞাবতীতীরস্থ 'হরিযূপীয়া' রূপে ঋগ্বেদে অবশ্য একবার উল্লেখ করাও হয়েছে; সম্ভবত ভাষাগত মিশ্রণের অস্থিরপর্বটি তখনো অনতিক্রান্ত ছিল।

যাঁদেরকে ঋগ্বেদে 'বিষাণিন' 'বৃষশিপ্র' মহাভারতে 'শৃঙ্গিন' বিষ্ণুপুরাণে 'শৃঙ্গল' ইত্যাদি রূপে অভিহিত করা হয়েছে, তাঁদের-কল্পিত দেবতার মাথাতেও বৃষ বা মহিষশৃঙ্গ সমন্বিত মুকুট বা শিরোভূষণ থাকবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। উত্তরকালে শিবের প্রতিমূর্তিতে মাথায় যে বঙ্কিম চন্দ্রকলা দেখা যেতে আরম্ভ করল, সেটা সম্ভবত ঐ শৃঙ্গমুকুটেরই রৈখিক বিবর্তন। আদি শিবের পশু প্রতীক হিসেবেই হয়ত মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা এবং চন্হুদড়োর বিখ্যাত 'সিন্ধু-বণ্ড' অঙ্কিত মূর্তিসহ মোহরগুলি প্রচলিত ছিল ছিল। শিবের বাহন হিশেবে উত্তর-

কালের হিন্দুধর্মের আসরে তারাই আসর জাঁকিয়েছে। ত্বষ্টা-তথা-বৃত্র-তথা-শিবের শত্রু ইন্দ্র এই বৃষ-ও-মহিষকুলকে ভোজন করে নিঃশেষ করতে চাইলেও (বৈদিক শ্লোকের সাক্ষ্যানুযায়ী) পরিণামে তিনি নিজেই গ্রস্ত হয়ে গেছেন বৃষপতি মহেন্দ্রের (শিবের) দ্বারা! পরাভূত প্রাগার্য দেবতা অপহৃতা সিন্ধু-জনপদবালাদের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রেখে কালক্রমে প্রধানতম হিন্দু দেবতা শিব মহেশ্বর (=মহিষ-ঈশ্বর?) রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বৈদিক রুদ্রদেবতা তাঁব মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আর বিজয়ী ইন্দ্র পৌরাণিক সাহিত্যে দেবরাজ রূপে প্রতিভাত হলেও, উত্তরকালে নগণ্য লৌকিক দেবতা 'ইদে' পরিণতি পেয়েছেন। ইন্দ্রের দ্বাবা নিহত হয়েও বৃত্র তাই জয়ী! শিবরূপে তাঁর অনড প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

এ অধ্যায়ের শেষে শিব দেবতার ব্যাপকভাবে প্রচলিত প্রতীক মূর্তিটির প্রসঙ্গেও কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন, কেন না আদিরূপে সেটিও হরাপ্পা সংস্কৃতিরই বস্তু। 'শিশ্নদেবাঃ'-তথা-যৌনপ্রতীক উপাসকদের সম্পর্কে ঋগ্বৈদিক আর্যভাষীরা যে কটু-কাটব্য করেছেন. তার পবিপ্রেক্ষিতে হরাপ্পা প্রভৃতি নগরে সুপ্রচুর ভাবে পাওয়া বর্তুলাকার প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট-করানো নীতিদীর্ঘ মসৃণ আরেকটি পাথর-সংবলিত প্রতীকমূর্তিকে, ঐ সংস্কৃতিতে শিশ্নদেবতার সার্বজনিকভাবে গৃহীত রূপ বলে গণ্য করা চলে। পিতৃদেবতা এবং মাতৃকাদেবী—দুয়েরই ব্যাপক প্রচলন যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐ সভ্যতায় বজায় ছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই পিতৃদেবতার প্রতীক পুরুষচিহ্ন-দ্যোতক নীতিদীর্ঘ প্রস্তব খণ্ড এবং মাতৃদেবতার প্রতীকচিহ্ন বর্তুলাকার আংটির মতো আর একটি প্রস্তর খণ্ডের সংলগ্নরূপটির মাধ্যমে ঐ দুই ধর্মধারারার সমন্বয় যে ঘটেছিল সেখানে, সেটি বোঝা কিছু কঠিন নয়, বা ভাবাটুকু দূরান্বয়ী নয়। আদি-শিব এবং আদি-দুর্গার দুয়েরই হদিশ যখন হরাপ্পা-সংস্কৃতিতে মিলছে, তখন শিবলিঙ্গ এবং গৌরীপট্টের সমন্বিত আদি রূপটিও যে সেখানে পাওয়া যাবে, তার আর আশ্চর্য কি। অর্বাচীন কালে 'লিঙ্গপুরাণ' মারফৎ, কামনার্ত শিব কর্তৃক বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করতে উদ্যত হবার প্রাক্কালে সুদর্শন চক্রের সাহায্যে বিষ্ণুকর্তৃক তাঁর শিশ্নচ্ছেদন করা এবং ঐ প্রত্যঙ্গের খণ্ডাংশ গৌরী-কর্তৃক যথাস্থানে সন্নদ্ধ করার যে-গল্প প্রচলিত হয়েছে, সেটা প্রাচীনতর পূজাবিধিরই পরবর্তীকালীন ব্যাখ্যা দেওয়া মাত্র।

## উনিশ ।। শিবরাত্রি : সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায়

একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত কিছু কিছু অঞ্চলের কথা বাদ দিলে, বাঙালীর সমাজ এবং সংস্কৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ-দেবতা হলেন শিব। এই শিবের যে রূপ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-নির্ভর পুরাণে দেখি, বাঙালীর শিব তার থেকে নিঃসন্দেহে আলাদা। এঁকে উপলক্ষ করে যে শিবরাত্রির অনুষ্ঠান তাও, বলাই বাহুল্য, পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ভাবাদর্শসঞ্জাত নয়।

শিব প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের উদ্ভবের আগের দেবতা। ঋগ্বৈদিক আর্যভাষীরা যে সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস করেছিল, শিব আদিতে ছিলেন সেখানকার উপাস্য প্রধান পুরুষ দেবতা। আগের অধ্যায়ের সে কথা বিশ্লেষিত হয়েছে। এই আদি শিব পরবর্তীকালে বৈদিক রুদ্র দেবতার সঙ্গেও অভিন্নরূপে কল্পিত হয়েছেন : আরও পরে যখন প্রাগার্য আদি-ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঋগ্বৈদিক আর্য সংস্কৃতির বিমিশ্রণ ঘটে হিন্দুধর্মের পত্তন হয় যখন, তখন শিবই হলেন তার প্রধান তিন পুরুষ দেবতার অন্যতম, প্রধানতমই, আর প্রাগার্য মাতৃকা দেবীই পরিণতি পেলেন মহাদেবী বা শক্তিতে।

শিব ও শক্তির সম্মিলিত রূপের প্রতীক হিশেবে গৌরীপট্ট-শিবলিঙ্গের যৌথ আরাধনার প্রবর্তন হরাপ্পা-সংস্কৃতি থেকেই। হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটলে শিবরাত্রি উপলক্ষে তার ওপর জল, দুধ ইত্যাদি ঢালা তাই আদিম যৌন প্রতীক পূজারই প্রবহমান ধারা। এই যৌন প্রতীক-উপাসকদের উদ্দেশে ঋগ্বেদে প্রচুর গালমন্দ করা হয়েছে আমরা দেখেছি ; তবু এই তিন সাড়ে-তিন হাজার বছর অবধি যে এ রীতির অস্তিত্ব বজায় আছে, এ থেকেই বোঝা যায় যে এর মধ্যে মৌলিকভাবে একটা সমাজমনের স্বীকৃতি আছে। কুমারী মেয়েদের শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবলিঙ্গ প্রতীকের মাথায় জল-দুধ ঢালার প্রথাটার তাৎপর্যও এরমধ্যেই নিহিত।

পরবর্তীকালে অবশ্য শিবরাত্রির জাগরণ, উপবাস এবং পূজা পদ্ধতিকে শাস্ত্রীয় ব্রতের আবরণ পরানো হয়েছে। সংযত মন্ত্রগুলি যে নেহাৎই স্মার্ত সংস্কৃতির প্রলেপ বুলোনোর জন্যে, তা এই ব্রতের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় : 'পবিত্র' বেলগাছের ওপর উঠে ক্লান্ত ব্যাধের রাত কাটানোর অবকাশে কখন

গাছের পাতা আর শিশিরের জল নিচের মাটিতে পোঁতা শিবরূপী প্রস্তর খণ্ডের উপর পড়লে আশুতোষ মহাদেবের বরে সে অজ্ঞাতেই মহাপুণ্যবান্ বলে গণ্য হল এবং তার মৃত্যুর পর শিবদূতেরা যমদূতদের পরাস্ত করে তাকে কৈলাসে নিয়ে হাজির করল যথাকালে।

স্পষ্টতই আদিমকালের প্রাগৈতিহাসিক শিকার-নির্ভর জীবনের পুরুষানুক্রমে প্রচলিত স্মৃতিকাহিনীই এই ব্রতকথার প্রথম অংশে প্রতিভাসিত। বৃক্ষবিশেষ পবিত্ররূপে গণ্য হচ্ছে, গাছের পাতা এবং শিশিরের জলের স্পর্শে প্রস্তরখণ্ডরূপী দেবতা পরিতুষ্ট হচ্ছেন এবং 'ইহলোকে' মৃত শিকারের অধিকার নিয়ে এই দুই প্রাগৈতিহাসিক মানব-গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের আদলে 'পরলোকে'র অতিলৌকিক আধিদৈবিক সত্তারাও মরা মানুষের দাবী নিয়ে যুদ্ধ করছে সেখানে।

ঐ আদিম মীথোলজি তথা লোকপুরাণের কাহিনীই এই ব্রতকথায় রূপান্তরিত হয়ে এসেছে, এইমাত্র। বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা, অচেতন বস্তুর মধ্যে চেতনাময় সত্তাকে কল্পনা করা, পশুপূজা ইত্যাদি সব প্রাগৈতিহাসিক সংস্কার আমাদের মধ্যে এখনও সক্রিয়। এই ব্রত কাহিনীর মধ্যে এর সব কিছুই যে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংস্থিত, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব এবং লোকসংস্কৃতির ছাত্র মাত্রেই সেটি জানেন। এরই সঙ্গে সঙ্গে যৌনপ্রতীকের আরাধনা—যার হদিশ সারা পৃথিবীর পর্বতগুহাগাত্রেই মেলে, পরবর্তীকালে যা শুধু আরো সংকেতায়িত হয়েছে কেবল-মাত্র—তাও এতে দেখি। শিব অতএব পশুপতি, ভূতনাথ, জন্মশক্তিপ্রদাতা, এবং আরো নানারকম বিশ্বাসে কল্পিত এখানে।

বস্তুতপক্ষে, বাঙালীর শিব তাঁর 'আর্য'ত্বের খোলস ছেড়ে নিজের স্বকীয় মূর্তিতেই স্বপ্রতিষ্ঠ বলেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এত কাছের মানুষ। প্রায় যে-কোনো গ্রামীণ-তথা-লৌকিক পুরুষ দেবতাই আমাদের বিচারে আঞ্চলিকভাবে শিবের রকমফের। শিব তাই বাঙালীর বিচারে চাষী হয়ে ধান বোনেন (নিঃসন্দেহে উত্তরকালের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অনুভাবনায়), নেশাখোর বৃদ্ধ হয়ে শ্মশানে-মশানে ঘোরেন ভাঙ-ধুতরো খেয়ে, দারিদ্র্যের মধ্যে পত্নী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করেন এবং অল্পে রুষ্ট ও আরো অল্পে তুষ্ট হন। স্বভাবতই এই রকম একটি 'সাধারণ' দেবতা—যিনি স্বভাবে এবং পরিচয়ে নিতান্তই কাছের মানুষ—তাঁকেই বর হিশেবে চাইবে সাধারণ বাঙালীর ঘরের সাধারণ মেয়েরা, এটিই ত স্বাভাবিক! 'শিবের মতন স্বামী' কথাটার তাৎপর্যও ত তাই-ই! অতএব শিবরাত্রি পালনের এত ব্যাপক প্রাবল্য বাঙালীর ঘরে যে দেখা যায়,

তার অবলীন সামাজিক মানসিকতাটির স্বরূপ যে কি, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না বোধকরি। শীতের শেষে বসন্তের সময় নতুন করে শিকার সন্ধানে বেরোবার সময় যে পশুদেবতাকে পরিতুষ্ট করার আদিম প্রথা শিবরাত্রির ব্রতকথার বিবৃত. ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে তাঁকেই বাঙালী-ঘরের মেয়ের আকাঙ্ক্ষিত বরের আদর্শে রূপান্তরিত হতে দেখি পরিবর্তিত সমাজ আর অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। আধুনিক নাগরিক জীবনেও সেই আকাঙ্ক্ষার অন্তর্কাঠামোটি অটুট রয়েছে যে, এটাই আকর্ষণীয় ব্যাপার! পুরুষ মানুষে কিংবা বিবাহিতা বা বিধবা নারীরাও শিবরাত্রি পালেন। কিন্তু সেটা পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্য সমাজের সংস্কারে—কিছুটা ইহবিমুখ বেদান্ত ধর্মের প্রভাবে—অর্থাৎ অক্ষয় পরলোকের প্রত্যাশায়। কিন্তু শিবরাত্রির পালার মূল গায়িকা আজো কুমারী বঙ্গ ললনারাই।

শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবলিঙ্গের মাথায় জল বা দুধ ঢালার রীতি যে আদিম যুগের শিশ্নপ্রতীক পূজারই অনবচ্ছিন্ন রূপ সে-প্রসঙ্গ ওপরে বলেছি। এভাবে বিচার করলে অবশ্য এই পার্বণের একটি নিজস্বতা আছে: প্রচ্ছন্নভাবে যৌন-প্রতীক উপাসনার রেওয়াজ অন্যান্য কোনো-কোনো পার্বণে বজায় থাকলেও, প্রত্যক্ষভাবে এমন ধরনের ব্যাপক শিশ্নপূজা আর কোথাও দেখা যায় না—মনসা বা ইঁদের প্রসঙ্গ মনে রেখেও এ কথা বলা চলে নির্দ্বিধায়। মূলত রক্ষণশীল বঙ্গসমাজে পিতৃদেবতা শিব যে এই রকম খোলাখুলিভাবে যৌন প্রতীকে পূজো পান জল ও দুধের (মনোবিজ্ঞানের পড়ুয়ারা এ-দুয়ের তাৎপর্য জানেন) ধারা-স্নানে, এটা আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ একটি চরিত্রকে সূচিত করে সন্দেহ নেই।

এই লিঙ্গপূজা অবশ্যই উর্বরতা-নির্ভর একটি কাল্টের পরিচয় দেয়। লাঙ্গল এবং লিঙ্গ উভয়েই, ভাষাগতভাবে সম-উৎসজাত। আগের একটি প্রসঙ্গে তা বলেওছি। সধবা ও কুমারী মেয়েরাই শিবপূজার প্রধান পূজারিণী—একথাও ওপরে বলেছি। উর্বরতা-ধর্মধারায় সেটিই স্বাভাবিক। বাঙালীর সংস্কৃতিতে শিবকে যে কৃষক রূপেও দেখা গেছে, সেটি সেই ধর্মধারার দ্বিতীয়তর প্রকাশ। এটাই এই সংস্কৃতির মাটির ফসল: 'লিঙ্গপুরাণ' ইত্যাদি মারফৎ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে অভিক্ষেপই ঐ লিঙ্গ-যোনি-সমন্বিত প্রতীক পূজার মধ্য আরোপ করা হোক না কেন, সেটা প্রক্ষিপ্ত বলেই বুঝতে হবে।

## কুড়ি ॥ সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী : সংস্কৃতি ভাবনার বিচিত্র সমাহার

সরস্বতীই সম্ভবত হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে একমাত্র, যাঁর উদ্ভব এবং স্বরূপ সম্বন্ধে এত অজস্র এবং এত পরস্পর-অসম্পৃক্ত তথ্য আছে বেদ-পুরাণ-উপনিষদ্ থেকে শুরু করে লোকপুরাণ এবং কিংবদন্তীর মধ্যে থরে-থরে, যা থেকে তাঁর সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা বিশেষ দুরূহ। হিন্দু পুরাণবৃত্তের বিভিন্ন পর্যায়ে এমনভাবে এই বিশেষ দেবীকে দেখা যায় যে, তাঁর সামগ্রিক একটি ভাবমূর্তি সেই জটিলতার জাল থেকে মুক্ত করে গড়ে তোলাও অপরিসীম কঠিন।

মূলত, সরস্বতী ধ্রুবপদী সংস্কৃতি বলয়ের মধ্যে এমনভাবেই সীমায়িতা যে তার থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর আদি রূপ ( বা আর্কিটাইপ যাকে বলতে পারেন ) কি ছিল সেটি নির্ণয় করাও দুরূহ কাজ। ধ্রুবপদী সংস্কৃতি-মণ্ডলের অন্তর্ভূতা এই দেবীর লোকায়ত ভিত্তিই বা-কি, তাও খুব সুস্পষ্ট নয়। অথচ সেই ভিত্তি না-থাকলে সরস্বতী পূজা এমন জনপ্রিয় একটি পার্বণে কখনোই পরিণতি পেত না যে, একথাও আবার বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

সচরাচর দেবতা, পার্বণ ইত্যাদির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আদিম রূপ ( প্রায়শই যা প্রাক্-ইতিহাসের অনুষঙ্গবহ ) এবং লোকায়ত রূপগুলির সূচকচিহ্ন সমূহকে আলোচনার মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করে, তবেই তাদের ধ্রুবপদী চরিত্র-লক্ষণগুলির বিবর্তন ধারাকে নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু সরস্বতী-ভাবনার মধ্যে যেসব জটিলতার অভিব্যক্তি পুরাণের মাধ্যমে প্রকট হয়েছে, তাদের কারণেই এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিপরীতমুখিন গতিতে অগ্রসর হতে হবে।

॥ ২ ॥

সরস্বতীকে বাক্ এবং শিল্প-কৃষ্টি-কলার দেবী রূপে যে-ভাবে কল্পনা করা হয়েছে, তাতে তাঁর বহুবিধ বৈশিষ্ট্য যে-সমস্ত দেবীকল্পনায় দেখা যায়, তাঁরা হলেন : বাক্, বিরাজ, ভারতী, ব্রাহ্মী, পুটকারী, সারদা, বাগীশ্বরী, বেদমাতা, শতরূপা, পৃথুদুক, মহাশ্বেতা, সর্বশুক্লা, এবং অবশ্যই সরস্বতী। তাঁকে নদীরূপে গণ্য করা

হয়েছে ঋগ্বেদে ; সাতটি পবিত্র নদীর তিনি অন্যতমা। নদীকে স্ত্রীদেবতার প্রতিভূ হিশেবে গণ্য করলে, তাঁকে সপ্তমাতৃকার অন্যতমা হিশেবেও ধরা যায়—সে ক্ষেত্রে তাঁর একটি উৎস হরাপ্পা সংস্কৃতির মধ্যেও প্রাপ্তব্য—চন্হুদড়োর একটি সীলমোহর ঐ সপ্ত দেবিকার মূর্তি খোদিত আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বৈদিক ব্রহ্মাবর্ত বা বর্তমান পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তর রাজপুতানা দেশে এই সরস্বতী অধিষ্ঠিতা ছিলেন বলে মনে করা হয়েছে। তিনি জ্যোতির্ময়ী এবং উর্বরতাদায়িনী। সরস্বান্ বা সূর্যের কন্যা এবং নদীর সমন্বিত রূপে তো তিনি অবশ্যই ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে ভাবগত রূপে সংযুক্তা : মাতৃকা দেবী রূপে সেটি স্বাভাবিকও বটে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থমালায়, বিশেষত শতপথ এবং গোপথে, সরস্বতী বাক্‌দেবী রূপে স্বীকৃতা। এর ব্যাখ্যা হিশেবেই সম্ভবত মহাভারতে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী নদীর কূলে বৈদিক মন্ত্র-ইত্যাদির যে-ব্যাপক আবৃত্তি ও উচ্চারণ ঘটত, তারই ফলে ঐ বেদধ্বনির উৎপত্তিস্থল নদীর উপকূলের অধিষ্ঠাত্রী নিসর্গ শক্তিই বাক-দেবীতে পরিণত হয়েছেন।

এই পর্যায় অবধি দেবীরূপে সরস্বতীর ভাবরূপটি দুরূহ বোধ্য নয়। জটিলতা এরপর থেকে। সরস্বতী কার কন্যা, কার পত্নী? সূর্যের দুহিতা রূপে তাঁকে দেখেছি ওপরের আলোচনায়। এ ব্যতিরেকে তাঁকে ব্রহ্মার কন্যা হিশেবে ভাবা হয়েছে বহু সময়েই—ভাগবতপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কাঠক উপনিষদ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ এই তত্ত্বের উৎস। অথর্ববেদের মতে তিনি কামের কন্যা বিরাজ রূপেই পরিগৃহীতা। পদ্মপুরাণে, সরস্বতী হলেন দক্ষকন্যা।

ব্রহ্ম থেকে সঞ্জাতা—এমন ভাবনা সত্ত্বেও প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁরই সহযোগে তিনি প্রজা সৃষ্টি করেছেন এমন বিবরণ বহু স্থানেই দেখি। ছায়াচ্ছন্ন প্রাগৈতি-হাসিক অজাচারী সমাজের স্মৃতির ভারানুষঙ্গবাহী বলে মনে করা যায় এসব বিবরণকে। দেবী ভাগবত, শতপথ ব্রাহ্মণে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ভাগবতপুরাণ-ইত্যাদিতে এসবের অজস্র বিবরণ আছে। শতপথে এবং অথর্ববেদে আবার এঁকে ইন্দ্রের (তথা সূর্য) শয়ন-সহচরী বলে গণ্য করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে তিনি কশ্যপপত্নী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তিনি আবার নারায়ণের পত্নী—বাংলার লৌকিক ভাবনাতেও তাই, সেখানে তিনি লক্ষ্মীর সপত্নী। পুরাণের অর্বাচীন পর্যায়ে রাজা মতিনারের যজ্ঞাগ্নি রূপে আবির্ভূতা হয়ে সরস্বতীকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গতা হবার ফলশ্রুতিতে তংসুর জননী রূপেও দেখি। আবার স্কন্দপুরাণে তিনি শিবের

প্রণয়ভাজন। শিবপুরাণেও তাই দেখি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—ত্রিদেবেরই তিনি নর্মসঙ্গিনী বলে স্বীকৃতা; আবার মনু এবং দধীচিও তাঁর স্বামিত্বের দাবীদার—পুরাণান্তরে যদিও আমরা ব্রহ্মার পুত্ররূপে স্বায়ম্ভুব মনুকে সরস্বতীর গর্ভে জন্মাতে দেখি।

ধ্রুবপদী হিন্দু সংস্কারে সরস্বতীকে অনেক সময়ে স্বয়ং 'পরমাত্মা'-র অন্যতমা শক্তিরূপিণী বলেও কল্পনা করা হয়েছে—রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী ও দুর্গা, এই চারজনের সঙ্গে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাঁকে কৃষ্ণ থেকে সম্ভূতা বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে তিনি কৃষ্ণকে বাসনায় আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যেই নাকি কৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দেন নারায়ণকে ভজনা করতে। এই পুরাণকাহিনী যখন তৈরী হয়েছে, স্পষ্টতই তখন অজাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক ট্যাবু বা নিষেধ গড়ে উঠেছে। নারায়ণের দুই পত্নী—শ্রী এবং লক্ষ্মীর মধ্যে তখন শ্রীকে বেছে নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে একীভূতা হয়ে যান। সম্ভবত শ্রীপঞ্চমী নামের উৎসমুখ এখানেই। আবার কৃষ্ণই নাকি তাঁর প্রথম উপাসক।

মৎস্যপুরাণ বলছে: পরমাত্মার মুখ থেকে নির্গত শক্তিদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, তাঁর রূপ দেবীর মতো হয়েও প্রাপনীয়ার মতো আকর্ষক, তিনি সর্বশুক্লা বা মহাশ্বেতা, বীণাধারিণী, কেশরাজিতে চন্দ্রশোভাময়ী, শ্রুতি-ও-শাস্ত্রে পারঙ্গমা এবং সৃজন-প্রেরণাদাত্রী ও পদ্মাসনা। সর্বশুক্লা বা মহাশ্বেতা কল্পনা করা হয়েছে সূর্যালোকের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর একত্রিতা হবার কল্পনার ফলশ্রুতিতে, চন্দ্র এবং পদ্ম তাঁর নারীত্বসূচক বাহিরঙ্গিক অস্তিত্বের দ্যোতক—পদ্ম চিরাচরিত ভাবে স্ত্রীচিহ্ন এবং চন্দ্র রমণীর পূর্ণত্বের পরিচায়ক ঋতুর ব্যঞ্জনাবহ। এগুলি থেকেও ফার্টিলিটি-কাল্টের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বোঝা যায়। শিল্প-এবং-জ্ঞান সম্পর্কে ক্রমে-ক্রমে মানুষের বোধ যখন থেকে একটা সুনির্দিষ্ট-আকার ধারণ করতে শুরু করল, তখন থেকে এসবের অধিষ্ঠাতৃর অতিলৌকিক শক্তির অস্তিত্বও সে কল্পনা করতে আরম্ভ করল; সেই 'দৈবী' শক্তির অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের সূত্র ধরেই যে দেবতার কল্পনা বিবর্তিত হতে লাগল শতাব্দীর পর শতাব্দী, তিনিই কালক্রমে সরস্বতীর সঙ্গে একত্রিতা হলেন। বীণা এবং শ্রুতি-ইত্যাদির প্রসঙ্গ তারই হদিশ দেয় এখানে। অথর্ব বেদ অবধি, বাক্ এবং সরস্বতী পৃথক; তার পর থেকেই দেখি তাঁরা অভিন্না। অথর্ব 'বেদ' প্রাক্-বৈদিক হরাপ্পার ধর্মবিশ্বাসের উপাদান নিজের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছে—বিশেষজ্ঞদের অনেকের এই অভিমত মেনে নিলে—পরবর্তীকালে অথর্বীয় বাক্ এবং ঋক্-সংহিতার সরস্বতীর এই

বিমিশ্রণ স্বাভাবিক বলেই মানা যায়—হরাপ্পীয় এবং বৈদিক সংস্কৃতির সংশ্লেষণেই যখন হিন্দু সভ্যতা গড়ে উঠেছে বেদোত্তর সময়কালে।

॥ ৩ ॥

সরস্বতীকে নিয়ে লৌকিক এবং ধ্রুবপদী যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলির উল্লেখও এখানে প্রাসঙ্গিক। একটি কাহিনী হল: সমুদ্র মন্থনের পর বাগ্‌দেবতা নারীর মোহনীয়া রূপ ধরে অসুরদেব ভুলিযে রেখে অমৃতের ভাণ্ডটি দেবতাদের হাতে তুলে দেন। তাঁব ঐ নারীমূর্তিই স্থাযী হয় দেবকুলের নির্বন্ধে: এঁরই নাম হয় সরস্বতী।

এই কাহিনীব সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য এবং সেটা কবতে হবে সবস্বতী-সম্পৃক্ত আর দুটি অনুরূপ কাহিনীর অনুষঙ্গেই। প্রথমটি হল: নিষাদ. শবর এবং পুলিন্দদেব স্নান-পানের জল থেকে বঞ্চিত কবাব জন্য দেবতাদেব নির্বন্ধে নদী-রূপিণী সবস্বতী মাটিব তলায় অনুপ্রবেশ কবে আবার বহু দূববর্তী এক স্থলে মৃত্তিকা ভেদ করে প্রবহমানা হন। তখন থেকে ঐ কারণেই তাঁব নাম হয় পৃথূদক। দ্বিতীয় কাহিনীতে আছে: গন্ধর্ববা দেবভোগ্য সোমরস অপহরণ করে নিয়ে গেলে সরস্বতী (তখন বাক্-বিরাজমূর্তিতে) মোহকারিণী রূপ ধারণ করে তাঁদের প্রত্যেকেব সঙ্গে ক্রমান্বযে সঙ্গতা হযে অবসন্ন কবে তোলেন সবাইকে এবং সেই অবকাশে বিনা বাধায আবার ফিরিয়ে আনেন সোমের ভাণ্ড (টিউটনীয় লোকপুরাণের ফ্রেইয়া দেবীকে নিয়ে প্রায় হুবহু একটি গল্প প্রচলিত আছে ঐ সাংস্কৃতিক বলয়ে)।

স্পষ্টতই, বুদ্ধিজীবী দেবকুল প্রতারণা এবং বঞ্চনা করে শ্রমজীবী অসুরকুলের (মূলত তাঁদের পরিশ্রমেই মন্থনশেষে অমৃতাভাণ্ড হাতে লক্ষ্মী উঠেছিলেন যে সমুদ্র থেকে, এ কথায় পুরাণবৃত্তের পাঠক মাত্রেই একমত হবেন নিশ্চয়ই) ন্যায্য প্রাপ্য দিল না—এই মর্মে যে কাহিনীর হদিশ মিলছে পুরাণবৃত্তে, তার কেন্দ্রে রয়েছেন জ্ঞানের দেবী। জ্ঞান এবং বিদ্যার সাহায্যেই বিদ্যাহীন বৃহত্তর শ্রমজীবী শ্রেণীকে প্রবঞ্চনা করে আসছে ওপরতলার মানুষ সভ্যতার গোড়া থেকেই, সেই বস্তুবাদী ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সত্যটি এর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ।

দ্বিতীয় কাহিনীতে এই অন্তর্কাঠামোটি (বা, ইনফ্রা-স্ট্রাকচার) আরও বেশি স্পষ্ট: সভ্যতার অমৃতরসের পরিবর্তে এখানে প্রাণস্বরূপ তৃষ্ণার জল থেকে বঞ্চিত করছেন অরণ্যচারী আদিবাসীদেরকে সুসভ্য 'আর্য'-তথা-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির'

কুলপতিরা—রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের অনুরূপ ঘটনা-পরম্পরা নিশ্চয়ই মনে পড়ছে! শোষক শ্রেণী, অন্যদের তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত শুষে নেয় তাদের উন্নততর প্রাযুক্তিক বিদ্যার বলে—কখনো জ্ঞানের দেবী নদীরূপা সরস্বতী যার প্রতীক, কখনো বা যন্ত্ররাজ বিভূতি।

তৃতীয় কাহিনীটি, প্রথমটিরই প্রায় অনুরূপই (সমাজবিজ্ঞানে যার নাম আইসোমর্ফিক বা অইকোটাইপ) বলা চলে। প্রথম এবং তৃতীয় কাহিনীতে সরস্বতী কর্তৃক যৌন-প্রলোভন দেখানোর ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করলে, শাসক শ্রেণীর কাছে বুদ্ধিজীবীর আত্মবিক্রয় বা প্রস্টিটিউশনের রূপক বলেও গণ্য করতে পারা যায় নিশ্চয়ই।

॥ ৪ ॥

সরস্বতীকে নিয়ে লৌকিক এবং ধ্রুবপদী পুরাণবৃত্তে আরও যে-সব কাহিনী প্রচলিত, উৎসাহী পাঠকের পক্ষে সেগুলিও যথেষ্টই আকর্ষণীয় বলে প্রতীত হবে এদেরই একটি : বিষ্ণুর তিন স্ত্রী—গঙ্গা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। বিদুষী ভার্যা সরস্বতী—রূপে মোহনীয়া হলেও, তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি স্বামীর পক্ষে বাঞ্ছনীয়া হলেন না, গঙ্গাও নারায়ণের হৃদয়েশ্বরী হননি, অতএব তিন সপত্নীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি সরস্বতীকে ব্রহ্মার এবং গঙ্গাকে শিবের মর্মসহচরীরূপে দান করলেন. শুধু ধনদায়িনী লক্ষ্মী রইলেন তাঁর সহচারিণী হয়ে. এই গল্প গড়ে-ওঠার পিছনে যে মানসিকতাগুলি সক্রিয় আছে, সেগুলি সমাজ-তত্ত্বের ছাত্রের পক্ষে অবশ্যই ভাবনার বিষয় : স্পষ্টতই, এই কাহিনী সমাজ-বিবর্তনের যে স্তরে গড়ে-উঠেছে, সেখানে নারীকে (দেবী-বা-মানবী যাই হন না কেন) এক ধরনের হস্তান্তরযোগ্যা ভোগ্যপণ্য (বা ট্র্যান্সফারেবল কমোডিটি) রূপেই দেখা হয়। নিজের সুবিধা-অসুবিধার জন্য পত্নীকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার কাহিনীর মধ্যে সেই মানসিকতারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। শ্রেণীসমাজের নীতিবোধের এলাকায় এ জিনিষ কিছুই অভাবনীয় নয়! দ্বিতীয়ত, নারীর পবিত্রতা (গঙ্গা যদি তার প্রতীকরূপা হন) এবং প্রজ্ঞা (সরস্বতী যার প্রতিভূ) এই শ্রেণীভিত্তিক পুরুষশাসিত সমাজে অর্থ-সম্পদের (লক্ষ্মী যার প্রতীক) কাছে যে খুবই তুচ্ছ, সে-ও এই কাহিনীর মধ্যে উদ্ভাসিত।

ব্রহ্মা-সরস্বতীর অজাচার-ভিত্তিক পুরাণবৃত্তান্তের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ওপরে করেছি : এখানে তার বিশ্লেষণটুকুও করা দরকার। পুরাণে বলা হয়েছে :

ব্রহ্মা নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে অতঃপর ধ্যানস্থ হলেন যখন, তখন তাঁর দেহের ক্রমবর্ধনশীল সত্বগুণ তেজরূপে রসনা দিয়ে নির্গত হয়ে আসে বাক্ বা সরস্বতীর মূর্তিতে। আত্মজার রূপ ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ করল—অনিচ্ছুক সরস্বতী তাঁর সম্মুখ থেকে পিছনে, তারপর উভয় পার্শ্বে, অতঃপর আকাশে সরে যেতে লাগলেন তৃষিত দৃষ্টির লেহন থেকে নিজেকে বাঁচাতে। তিনি যেদিকেই যান, সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি করে মুখ সৃষ্টি হয়—এইভাবে তিনি পঞ্চমুখ হলেন। অবশেষে বাক্‌দেবী তাঁর স্রষ্টাকে এড়াতে পারলেন না—এবং তার ফলশ্রুতিতেই নাকি মনু স্বায়ম্ভুব আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই কাহিনীর পাঠান্তর হিশেবে যা প্রচলিত সেখানে সরস্বতী হরিণীর রূপ ধরে অরণ্যে পালালে ব্রহ্মাও হরিণমূর্তিতে তাঁকে অধিকার এবং গ্রহণ করেন। রাজহংসী এবং রাজহংস প্রতীকেও তাঁদের মিলন ঘটেছিল বলে পুরাণবৃত্তে প্রচলিত আছে। সরস্বতীর এখনকার মূর্তিতে রাজহংস-বাহনের উৎস সম্ভবত এই গল্পই। আকাশে-পলায়নপরা সরস্বতীই আকাশগঙ্গা (বা ছায়াপথ)-রূপে গণ্যা হন পরবর্তীকালের দেবকল্পনায়; আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অন্তত সেই ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন।

হরিণ-মিথুন এবং রাজহংস-মিথুনের মধ্যে দেবকল্পনা আদিম টোটেম-ভাবনার অনুবৃত্ত সন্দেহ নেই। ময়ূরবাসীনা এবং সিংহাসীনা সরস্বতীমূর্তি পশ্চিমভারতে যা দেখা যায় তার উৎসেও ঐ যে টোটেম-কল্পনা বলাই বাহুল্য। ছায়াপথকে দেবী রূপে কল্পনা করাও সুদূর অতীতের উত্তরাধিকার। অজাচারের ব্যাপারটা হয়ত আরও পুরোনো সময়কালের স্মৃতিবাহী। কন্যারূপিণী সরস্বতীর সলজ্জ পলায়নের প্রয়াসের বর্ণনাটুকুতে পরবর্তী সময়ের অভিক্ষেপ পড়েছে।

॥ ৫ ॥

সরস্বতী প্রসঙ্গে যত ধরণের কাহিনী প্রচলিত আছে, তাদের প্রায় কোনোটির মধ্যেই তাঁকে চারিত্রিক বিশুদ্ধির প্রতিমূর্তিস্বরূপা—এমন ভাবার অবকাশ বিশেষ নেই। এই প্রসঙ্গটি একটু বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। পুরুষ-দেবতাদের মধ্যে অনেকেই স্খলচরিত্ররূপে চিত্রিত হলেও—ইন্দ্র, শিব-প্রমুখ স্মরণযোগ্য—স্ত্রীদেবীদের মধ্যে আর কারুকেই এভাবে কল্পিতা হতে দেখিনা। একই দেবীকে এতজনের পত্নীরূপে কল্পনা করা হচ্ছে—পিতা-কন্যা এবং মাতা-পুত্রের অজাচার (ব্রহ্মা-সরস্বতী, শিব-সরস্বতী এবং মনু-সরস্বতী প্রসঙ্গ যথাক্রমে বিচার্য) তাঁকে উপলক্ষ করে ঘটছে, স্বগোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থে তিনি নিজের

পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করছেন বহুচারিণী হয়ে ( অসুর-ও-গন্ধর্বকুলের প্রসঙ্গ স্মরণযোগ্য ) ইত্যাদি বিষয় তাকে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানান্‌সই করেনি—এদিক থেকে তিনি গ্রীক এবং টিউটনীয় পুরাণবৃত্তের দেবীদের সঙ্গে তুলনীয়া ( ফ্রেইয়া দেবীর কথা ত ওপরে তুলনামূলকভাবে বলেছি)। ভারতীয় পুরাণবৃত্তের মাতৃকাদেবতাদের স্বাভাবিক যে ভাবমূর্তি অন্যত্র দেখি, সরস্বতী তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

যদি উর্বরতাকেন্দ্রিক-ধর্মধারার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যই সরস্বতীকে এভাবে কল্পনা করা হয়েছে মনে করা হয়, তাহলেও সেই ব্যাখ্যাও ত সম্পূর্ণাঙ্গ হবে না, তার কারণ হল এই যে, ফার্টিলিটি কাল্‌টের সঙ্গে অন্যান্য যে দেবীরা যুক্ত আছেন বলে মনে করা হয়, তাঁদের কারুকেই পৌরাণিক সরস্বতীর মতো শিথিলচরিত্রা কিংবা 'কলঙ্কিতা'-রূপে দেখি না, সে ক্ষেত্রে সরস্বতীর প্রসঙ্গেই বা এই ব্যতিক্রমী ভাবনা সঞ্জাত হয়েছে কেন।

এই নিবন্ধের শুরুতে যে বিপরীতমুখিন বিশ্লেষণের কথা বলেছি, এখানে সেটিকে অবলম্বন করেই সম্ভবত এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রাথমিক পর্যায়ে, নদীনিসর্গের দেবী ( ছায়াপথের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও তার সঙ্গে সন্নিবিষ্টা হয়ে থাকতে পারেন ) রূপেই তিনি অনুভাবিতা হয়েছেন; মাতৃকা দেবতাদের সাধারণ লক্ষণ অনুসারেই ফার্টিলিটি-কাল্‌টের সঙ্গে তাঁর সংযোগটা তখন থেকেই। এরপর তিনি কিভাবে জ্ঞান এবং বিদ্যা এবং শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রীতে রূপান্তরিতা হলেন—সে-কথা ওপরে আলোচিত হয়েছে।

এরই সূত্র ধরে সরস্বতী শ্রেণীকেন্দ্রিক সমাজের 'ওপরতলার দেবী'তে পরিণতি পান। বিদ্যার চর্চা যেহেতু ওপরতলার চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমায়িত ( নিষাদ-শবরদের জন্য নদীর জল মাটির মধ্যে বিলীন হওয়া যার প্রতীক ), তাই ওপরতলার সমস্ত প্রধান দেবতারই তাঁর ওপর অধিকার সাব্যস্ত হল: প্রকারান্তরে তিনি দেবকুলের বসন্তসেনা-কল্পা হলেন! বসন্তসেনার উল্লেখ এই কারণে করছি যে, শূদ্রক যে সামাজিক কাঠামোয় তাঁর নাটক রচনা করেছিলেন, মোটামুটিভাবে সেটি হল ব্রাহ্মণ্য-স্মার্ত ঐতিহ্যবাহী সমাজশক্তির অভ্যুদয়ের যুগ। অতএব দেবতা-কল্পনার অভিব্যক্তিতেও যে সেই সমাজেরই ভাবধারার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছায়াপাত ঘটবে, সে তো বোঝাই যায়। বিদ্যা-প্রজ্ঞা-শিল্প-ললিতকলা ইত্যাদির ধারিকা এবং বাহিকা হিশেবে সে-সময়ে—ইতিহাসে যাকে 'ক্লাসিক্যাল এজ' বলা হয়েছে—ঐ বসন্তসেনারাই অগ্রগণ্যা ছিলেন। সুতরাং সেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যা এবং ললিতকলার

দেবীরও বসন্তসেনা-সুলভতা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষত, ঐ পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায়।

প্রশ্ন, তাহলে পরবর্তী সময়ে সরস্বতীপূজা জনজীবনে এভাবে পুনর্ব্যাপ্ত হল কি করে? উল্লেখযোগ্য যে, পার্বণেব সরস্বতী কিন্তু আবার সেই প্রাথমিক পর্যায়ের মাতৃকাদেবীর সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিতা হয়েছেন। এটাও স্বাভাবিক, কেন না, লোকায়ত জীবনের প্রেক্ষিতে কখনোই ওপরতলার মতো চিন্তার কলুষ একটা কোনোভাবমূর্তি ধারণ করেনা। তবেসাংস্কৃতিক প্রবহমানতার যে নিরবচ্ছিন্ন বলয়াবর্তন লোকসমাজ থেকে ওপরতলায়, আবার ওপরতলা থেকে লোকসমাজে ঘটে চলে—তাবই নিয়মে ওপরতলা থেকে জ্ঞান-বিদ্যা-শিল্প ললিতকলার দেবীও নীচের তলার জনজীবনকে অনুপ্রাণিত করেছেন—সরস্বতী পার্বণের দেবীতে পরিণতা হয়েছেন।

বাঙালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক-মানসলোকে তখন তাঁর পৌরাণিক আধ্যাত্মিকতার ভাবরূপ নির্মক্ষিত হয়ে লৌকিক একটি বসমূর্তি তৈরী হয়ে গেল. বাঙালীর নিজস্ব দেব-দেবী-রূপে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠ সেই শিব-দুর্গার কন্যারূপে তখন তাঁর সামগ্রিক পবিচয়। ঘবোয়া জীবনের লোকায়ত সত্তায় তখন সরস্বতী স্বাভাবিক মাতৃকামূর্তিতে সমাবৃতা। যেহেতু তিনি বাক্-তথা-ভাষারও দেবী, তাই তাঁর মধ্যে অনিবার্যভাবে সর্বজনীনতা তো আগে থেকেই ছিল, সুতবাং 'প্রত্ন-ঐতিহাসিক'—'ঐতিহাসিক'—'ধ্রুবপদী'—'লৌকিক'—এই ছক্ ধরে তাঁর লোকজীবনের মধ্যে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে অনায়াসে। গ্রীক পুরাণেব বিদ্যা-শিল্পের দেবী এথেনা ও বোমান পুরাণের অনুরূপ দেবী মিনার্ভার মতো তিনিও 'শ্রী'-দায়িনী রূপে গণ্যা—'শ্রী' দেবীর সঙ্গে তাঁর সংমিশ্রণ কিভাবে ঘটেছে, সে তো আমরা ওপরে দেখেইছি।

আলোচনা শেষ করার আগে, আরো দুটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হবে। প্রথমত, ঐ বিশেষ তিথিতেই বা কেন সরস্বতী-পূজার বিধান হয়েছে? এবং, দ্বিতীয়ত, পূজার পরের দিন পশ্চিমবঙ্গে যে 'শীতল'-খাবার রেওয়াজ আছে তারই বা তাৎপর্য কি? সরস্বতী যেহেতু সরস্বান্-তথা-সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই মাঘের উত্তরায়ণ যখন শুরু হয়েছে, তখন সরস্বতীর অর্চনা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ—সূর্যনির্ভর ধর্মধারার (সান্-কাল্ট) সঙ্গে। শুক্লাপঞ্চমী এই বিশেষ তিথিটি কেন? ....পুরাণ মতে 'শ্রী' দেবী মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে দেবসেনারূপে কার্ত্তিকেয় সঙ্গে পরিণীতা হন। শ্রী ও সরস্বতীর সমন্বিত হবার কথা ও ওপরে আলোচনা

করেইছি। অতএব শ্রী'-দেবীর শুভদিন এবং সূর্যকন্যা সরস্বতীর উপাসনাকাল একত্রে সমন্বিত হয়ে শ্রী-পঞ্চমী রূপে সুস্থিত হয়েছে।

শীতল-খাদ্য গ্রহণের যে প্রথা পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে প্রচলিত তার অন্তরালে হয়ত আঞ্চলিক কিছু শস্যকেন্দ্রিক-ধর্মধারার অবশেষ আছে। উর্বরতা-ভিত্তিক মাতৃকাদেবী রূপে যাঁর প্রাথমিক অভ্যুদয় ঘটেছিল—লোকজীবনে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর অর্চনাবিধির সঙ্গে এ-ধরনের প্রথা নূতন করে সংযুক্ত হয়ে যাওয়া তাই আদৌ কিছু অভাবনীয় বিষয় নয়, এটা খুবই স্বাভাবিক।

## একুশ ॥ হোলির উৎসব : সমন্বয়ের ঐতিহ্য

একই উৎসব সারা ভারতে প্রচলিত আছে এমন নমুনা মোটামুটি এই তিনটির বেশী নেই : 'দশেরা' 'দেওয়ালী' এবং 'দোল'। প্রথম দুটির মধ্যে ধর্মীয় অনুষঙ্গটুকু উৎসবমনস্কতার চেয়ে প্রবলতর, কিন্তু দোলে ধর্মানুষঙ্গটি প্রকৃতপক্ষে গৌণই হয়ে গেছে এর উৎসব-মুখরতার কাছে। সেদিক থেকে দেখলে এটিই হল একমাত্র সর্বজনীন সর্বভারতীয় উৎসব যাতে ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের বিভেদটা আবীরের রঙে ঢাকা পড়েছে।

এই এক উৎসবই অবশ্য বিভিন্ন নামে সারা ভারতে পরিচিত : বাংলায় যা 'দোলযাত্রা', উড়িষ্যায় তাই 'দোলোৎসব', উত্তর ও মধ্যভারতে তারই নাম 'হোলি' বা 'হোরি', গোয়া এবং কোঙ্কন অঞ্চলে তারই নাম 'শিমাগা', দক্ষিণ ভারতে এই উৎসবের নাম 'মদন দহন' বা 'কামায়ন'। নামের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন উৎসবের আঙ্গিকটা সর্বত্রই এক। আগুন জ্বালিয়ে কিছু পোড়ানো, রঙ মাখানো, নাচ-গানের সঙ্গে কিছু পরিমাণে বাধাহীন ঘনিষ্ঠতা নারী-পুরুষের মধ্যে—এইগুলি এই উৎসবের অনিবার্য উপকরণ হিশেবে সর্বত্রই স্বীকৃত। হোলি-পার্বণের ঐ কামায়ন ( কামের যাত্রা ), শিমাগা ( যৌবনোৎসব ), মদন দহন ( ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন ), দোলযাত্রা ( দোলায় 'গমন' বা মিলন ) প্রভৃতি নামগুলিই এই উৎসবের মূল চরিত্র নির্দেশক। এই সমস্ত দিকগুলি বিশ্লেষণ করলে আদিম কাল থেকে এই ধরনের বিভিন্ন যে সব উৎসবের প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে শারদোৎসব জাতীয় যে সব উপলক্ষের বিবরণ পাওয়া যায় দোলের মূল চরিত্রের সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য দেখিনা। ইউরোপের 'মে ফেয়ার', 'ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যাল' বা অতীতকালের ব্যাকানালিয়া প্রভৃতি উৎসবের কিংবা বড়দিনের উপলক্ষে 'কিসিং আণ্ডার মিস্‌ল্‌টো' প্রভৃতির কথা এই গ্রন্থের একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছি। এদের সবারই রেওয়াজও ঐ শারদোৎসব-দোল ইত্যাদির সমধর্মী।

ধর্মের ভাবনা সরিয়ে রেখে সমাজ বিজ্ঞানের চোখে দেখলে একে বসন্ত ঋতুর উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব বলেই গণ্য করতে হবে। শস্য-কেন্দ্রিক উৎসব বলেও

মনে করবার কারণ আছে একে। কোনো-কোনো পণ্ডিত হোলিকে নতুন বছরের সূচনা সম্পর্কিত উৎসব রূপেও গণ্য করেছেন। কেননা, ভবিষ্যপুরাণ মতে ফাল্গুন ছিল বছরের শেষ মাস। তবে এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে; কারণ মাঘের পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ শুরু হলে সেদিন থেকে নতুন বছর ধরার তাৎপর্য বোঝা যায়; সেদিক থেকে দেখলে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা হোলির দিনের ক্ষেত্রে ঐ রকম কিছু ভাবার কারণ নেই। হোলি উপলক্ষে আগুন জ্বালিয়ে 'বুড়ীর ঘর'—ওরফে 'মেড়ার ঘর'—পোড়ানর যে প্রথা রয়েছে, সেইটি অবলম্বন করেও কেউ-কেউ একে নববর্ষের মুখপাত বলেছেন। হিন্দীভাষী অঞ্চলে 'সংবৎ-জ্বালানা' বলে এই রীতিটি অনেক জায়গাতেই পরিচিত, তাও এঁদের স্বপক্ষে অন্যতম প্রামাণিক বক্তব্য।

কিন্তু সম্ভবত এইটা ফসল উৎসবেরও দ্যোতক। এই হোলির অগ্ন্যুৎসব-তথা-চাঁচর উপলক্ষে জীবন্ত মেড়া (ভেড়া) পোড়ানর রেওয়াজ বর্তমানে না থাকলেও, কলাগাছ কিংবা ভেরেণ্ডা গাছ পোড়ান এখনো উত্তর ভারতে প্রচলিত। আগে এগুলিকে যথারীতি পুজো করে তবেই ঐ দাহন কার্য সমাধা হয়। বাংলাদেশে চাঁচাড়ি এবং বাঁশের ঘর পুড়িয়ে ছাই করা প্রচলিত। এই সঙ্গে খড়ের ভেড়ার মূর্তি পোড়ান কিংবা জ্যান্ত ভেড়ার গায়ে আগুন ছুঁইয়ে তাকে প্রতীকীভাবে দগ্ধ করা ইত্যাদিও কম বেশি প্রচলিত। মানুষের কুশ-পুত্তলিও জ্বালান হয় সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে।

এই অগ্নিদাহনের তাৎপর্য কি? আসলে এটি ছিল একই সঙ্গে নববর্ষের উৎসব, মদনোৎসব এবং শস্যোৎসব। মানুষ এবং ভেড়ার প্রতীকী দাহন কিম্বা জ্যান্ত ভেড়া কি তাজা গাছ পোড়ান সম্ভবত শস্যদেবতার উদ্দেশ্যে বলি নিবেদনের আদিম প্রথার ধারাবাহী। ঐ আগুনে যে-সব ফলমূল ফুল ইত্যাদি ভুজ্যি চড়ান হয়, সেগুলি অর্ধদগ্ধ অবস্থায় তুলে নিয়ে শস্যক্ষেত্রে ছড়ান কিম্বা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করার রেওয়াজ দেখা যায়। ঐ ছাইয়ের কিছুটা ঘরে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রাখলে সারা বছর অন্নাভাব হয় না এমনও একটি সংস্কার রয়েছে। ছাই তুলে মাঠে-প্রান্তরে ছড়াতেও দেখা গেছে। স্পষ্টতই এই রীতি জুম্ চাষের ঐতিহ্যই স্মরণ করায়। পাহাড়-জঙ্গলে আগুন দিয়ে বন হাসিল করে সেই ছাইয়ের গাদার সার-জমা জমিতে খন্তা দিয়ে গর্ত করে বীজ ছড়িয়ে চাষ করার প্রথা কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুকাল আগেও ত চালু ছিল। বুড়ীর ঘরের আগুনের শিখার ঢাল্ দেখে, সেই দিকেই সে বছর ভাল ফসল ফলবে

এমন সংস্কার গড়ে ওঠার পিছনেও এই ধরনের তাৎপর্যই আছে। ঐ আগুনের ছাই ঘরে রাখলে চাষীর মঙ্গল হবে—অর্থাৎ ভাল ফসল ফলবে—ইত্যাদি সংস্কারও একই উৎসজাত। নববর্ষের উৎসব এবং শস্য-উৎসব একই সঙ্গে একে বলছি কেন, বোধহয় এর থেকেই তা স্পষ্ট হবে।

কৃষিকেন্দ্রিত সংস্কারের সঙ্গে উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মসংস্কারের অন্যতর দিকটিও বিদ্যমান, সন্তান-আকাঙ্ক্ষার কথা বলছি। হোলি উপলক্ষে যে-ধরনের সামাজিক ছাড়পত্র নারী-পুরুষের হাতে দু-একদিনের জন্য তুলে দিতে দেখা যায় নিতান্ত রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজেও, তাতে মনে করবার কারণ আছে যে, বসন্ত উৎসব উপলক্ষে নারী-পুরুষের অবাধ যে মেলামেশার রীতি সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত (ইউরোপের উৎসবের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি; এ জিনিষ সব দেশের সমস্ত পুরোনো সংস্কৃতিতেই আছে), সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এখানেও টিঁকে আছে। উত্তর ভারতের, বিশেষত বৃন্দাবন অঞ্চলের, কোনো-কোনো গ্রামে হোলি উপলক্ষে ভিন্ন গ্রামের নারী-পুরুষদের নকল মারপিট ও আসল মাতামাতির বেওয়াজ এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। অশালীন শব্দ ও অঙ্গভঙ্গী সহযোগে নাচ গানও হোলির আনুষঙ্গিক হিশেবে গণ্য ঐ সব অঞ্চলে। ঐ নকল যুদ্ধের শেষে 'সন্ধি'-র সর্তরূপে কিছুটা পরিমাণেও যৌন উচ্ছৃংখলতা গত শতকেও প্রচলিত ছিল। একে এজন্যেই মদনোৎসবও বলেছেন প্রাচীন পণ্ডিতরা।

এরই আর এক প্রকাশ ঐ চাঁচরের ছাই পরিষ্কার করে সেখানে পদ্ম আঁকা আল্পনা (সমাজবিজ্ঞানে নারীত্বসঙ্কেত বলে গণ্য যা) দেবার এবং ছাইমাটি দিয়ে 'গৌরী' (গৌরীপট্ট=নারীত্বসূচক প্রতীকী চিহ্ন) গড়ে পূজো করার আঞ্চলিক প্রথায়। দ্রাবিড় বলয়ে যে আগুন জ্বালিয়ে এই উৎসব হয় তার নাম 'কামায়ন' (কাম+অয়ন=মদনের যাত্রারম্ভ) বা 'মদন দহন' (কাম-নিবৃত্তি) এটাও প্রাসঙ্গিক-ভাবে স্মরণযোগ্য।

এই প্রসঙ্গেই আসে হোলির রঙ খেলার কথা: লাল ও সবুজ হোলির প্রধান দুটি রঙ—মূলত রক্ত এবং সবুজ বাসন্তিক পাতার বর্ণপ্রতীক। স্পষ্টতই তারুণ্যের এবং যৌবনোৎসবের দ্যোতনা বহন করছে এরা। মনোবিজ্ঞানীরা এই দুটি রঙকে যথাক্রমে কামনার ব্যঞ্জনাবাহী এবং যৌবনের অনুভূতিসঞ্চারী বলে গণ্য করেন। রঙ মাখানও এক ধরণের প্রচ্ছন্ন যৌনাচার হিশেবেই এজন্যে গণ্য হয়। সুতরাং হোলি যে আদিতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রবাসিক যৌনাচারভিত্তিক উৎসব, তথা মদনোৎসব এবং উর্বরতা-কেন্দ্রিত ধর্মধারার সমন্বিত বিবর্তন, তাতে

বোধ হয় সন্দেহ করার বিশেষ কিছু থাকে না।

বাংলা দেশে হোলি যে দোলে রূপান্তরিত হয়েছে তার পিছনেও এই ধারণাই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলশ্রুতিতে রাধা ও কৃষ্ণের বসন্ত রাসলীলা এবং হোলি এখানে সমন্বিত হয়ে গেছে। বাঙালীর যেহেতু 'কানু ছাড়া গীত নেই,' তাই তরুণ-তরুণীদের 'মদনোৎসব' স্বভাবতই রাধা কৃষ্ণের দোলের ব্যঞ্জনায় রক্ষণশীল বাঙালী সমাজমনে প্রতিভাসিত। কৃষ্ণ রাধার 'দোলায় গমন' কথাটি এখানে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ দোলা থেকেই দোল শব্দ।

এই বৈষ্ণব ভাবানুষঙ্গই হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী হোলিকা দানবীর অগ্নিদাহনের পুরাণবৃত্ত সৃষ্টি করেছে: প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে তাকে পুড়িয়ে মারতে গিয়ে হোলিকা নিজেই পুড়ে মরেছিল। চাঁচরের সঙ্গে এই গল্প খাপ খাইয়ে নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে অবশ্যই রাধাকৃষ্ণের দোললীলার প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে। হোলির অঙ্গস্বরূপ গালাগালিকে বৈষ্ণবমতে জল চল করতে কল্পনা করা হয়েছে আরেক রাক্ষসীর চুনটিকার। গালাগালির অশুচিতা নাকি তার আক্রমণ ঠেকাবে! স্পষ্টতই এ সব কাহিনী 'আই ওয়াশ' রূপেই ব্যবহৃত সামাজিক নীতির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। কিন্তু উৎসবটির মূল তাৎপর্য তাতে বিলুপ্ত হয় না।

মদন দহনের যে ভাবানুষঙ্গ দোলোৎসবের মধ্যে সুস্পষ্ট, ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যতে তার মধ্যে শিব-পার্বতীর মিলনও অভিব্যঞ্জিত। একই সঙ্গে বৈষ্ণবীয়, শৈব এবং শাক্ত—তিনটি প্রধান ধর্মধারা বা কাল্‌ট এর মধ্যে বিমিশ্রিত হয়ে গেছে। নতুন রবিশস্যের আসন্ন প্রত্যাশা, বাসন্তিক যৌবন-উৎসব এবং হয়ত নতুন বছরের আবাহন—এই সব কিছুই এই দোলযাত্রার মহোৎসবের মধ্যে সমারূঢ় হয়েছে।

## বাইশ ॥ চড়ক-গাজন ইত্যাদি : দরিদ্রের মহোৎসব

বাংলা পঞ্জিকাব মতে বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ মহাবিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলা দেশের গ্রামে-গঞ্জে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, নানান জায়গায় তা নানা নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গে এর নাম গম্ভীরা, রাঢ় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর পরিচয় গাজন বলে, পূর্ববঙ্গের বহু জায়গাতেই একে বলে চড়ক। এছাড়া, নীল, সাহীযাত্রা প্রভৃতি নামেও আঞ্চলিকভাবে এ উৎসব উল্লেখিত হয়। মূলত এই উৎসব শিবকে উপলক্ষ কবে পালিত হলেও, এই দিনে ঘবোয়াভাবে কয়েকটি মেয়েলি ব্রতেবও উদযাপন হয়, যাদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত হল এয়োসংক্রান্তি, পাঁচকুমার, ছাতুসংক্রান্তি, নিত্‌সিঁদুর, আদাহলুদ, রূপহলুদ, ফলগছানো, মধুসংক্রান্তি, গুপ্তধন, যাচা পান, আদব সিংহাসন ইত্যাদি-ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই বিশেষ দিনে গ্রামীণ বাঙালীব জীবনে ঘবে-বাইরে একই সঙ্গে বহুবিচিত্র উৎসবেব পালা চলে। এইসব উৎসবের পিছনে যে বয়েছে নানান্ আদিম বিশ্বাস আব সংস্কারেব প্রবহমান ধারা, সেকথা বলাই বাহুল্য। সামাজিকভাবে এই উৎসব ধারার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকেব কথা প্রাসঙ্গিক-ভাবে উল্লেখ্য : তথাকথিত 'নিম্নবর্ণীয়' বা 'অন্ত্যজ' শ্রেণীর মানুষেরাই এই সব উপলক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে থাকেন, যা আমাদের বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় অকল্পিত! ধরুন কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, বাণফোঁড়া, চড়কের গাছে চড়ে ঘুর্ণিপাকে ঘোরা ইত্যাদি প্রথা পালন কবতে সচরাচর তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দেরকে দেখা যায় না প্রায় কোনো অঞ্চলেই।

এ প্রসঙ্গে রাঢ় এলাকায় একটি গল্প আছে যা এক ধরনের পৌরাণিক 'মহিমা' অর্জন করেছে, এমনও বলতে পারেন। অন্ত্যজদের রাজা বাণের কন্যা উষার প্রেমিক ছিলেন কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। ক্রুদ্ধ বাণ রাজা অনিরুদ্ধকে হাতে-নাতে ধরে ফেলার পর যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন, সেই সময় বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রে বাণ রাজার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। মৃত্যুর আগে বাণ কৃষ্ণের কাছে এই মর্মে এক বর লাভ করেন যে, যেহেতু 'অন্ত্যজ'-কন্যা উষা কৃষ্ণের বংশধরদেব জননী হবেন, তাই বছরে একটি দিন 'অন্ত্যজ'-রা সকলেরই পূজ্য হবেন। সেদিনটিই হল গাজনের তিথি।

স্পষ্টতই বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণী-সমাজের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বকে সমন্বয়ে পরিণত করার জন্যই এই গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। আসল কথা, ঐ কাঁটাঝাঁপ, বাণফোঁড়া ইত্যাদি ভয়ঙ্কর প্রথাগুলি যদি পালন করতেই হয়—করতে হবেই কেননা আদিম সংস্কার এগুলির পিছনে প্রবল হয়ে রয়েছে—ত সেগুলো করুক তথাকথিত হীন-জন্মারাই—উচ্চবর্ণীয়রা থাকুক নিরাপদে। তার জন্যে একদিন যদি তাদের প্রণাম ইত্যাদি করতে হয়, ত তাতে ক্ষতি কি? বরং এই সামান্য উৎকোচেই তারা খুশী থাকবে। এই সামাজিক স্বার্থবুদ্ধিই গাজনের মূল সন্ন্যাসী, পাট ভক্ত্যা এবং বালার পদ সর্বদাই উন্মুক্ত রেখেছে ডোম, হাড়ি, চামার, কাহার প্রমুখ সমাজের নীচের সিঁড়ির মানুষদের জন্যে।

॥ ২ ॥

চড়কের 'গাছ' পোতা এবং আনুষ্ঠানিক প্রথাস্বরূপ দুরূহ সব শারীরিক কসরৎ ইত্যাদির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছুন যায় হয়ত। শাল বা গজারি বা গর্জন (নামের তাৎপর্যও এতে নিহিত) গাছের একটি খুঁটি বছরের-পর-বছর একটা কোনো পুকুরে ডোবানো থাকে। সংক্রান্তির আগের দিন ভক্তরা মিলে তাকে তুলে তেল মাখিয়ে মাটিতে শক্ত করে পোঁতেন। এর নাম গাছ জাগানো। এই থেকেই গাজনের শুরু হয়। পুরুলিয়ার পুয়াড়া, কাঁটাড়ি, খুঁকড়্যামুড়্যা প্রভৃতি গ্রামে দেখেছি এই প্রোথিত করার সময়ে সবাই একসঙ্গে জিগির তোলেন বারংবার: 'পার্বতী পরাণনাথ বহো।' স্পষ্টতই, গাছটি শিবপ্রতীক এবং পার্বতী এখানে হলেন পৃথিবী অর্থাৎ এই গাছ পোঁতার ব্যাপারটি এক ধরনের উর্বরতাকামনার ব্যঞ্জনা বহন করছে—একটা যৌনপ্রতীকী ধর্মধারা বা কাল্ট বলেও একে মনে করা যায়।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গো-অর্চনা বা আসামের 'গোরুবিহু' পূজা ছাড়াও উর্বরতা-ভিত্তিক কৃষি-সমাজের ধারাবাহী। 'গোরুবিহু'র পরদিন 'মানুষবিহু' উৎসবের সময় নারী-পুরুষের নির্বাধ মেলামেশার ছাড়পত্র ঐ বর্ষান্তিক একটি যৌনতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারা রূপেই গ্রাহ্য।

চড়কের গাছ পুঁতে তার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ভক্ত্যার দল যে ঐ দিন শূন্যে বৃত্তাকারে ঘোরেন—পণ্ডিতেরা অনেকেই সেটাকে বর্ষান্তের অবসরে সৌরচক্র সমাপ্তির প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। সেই ভাবে বিচার করলে ঐ পরবের মধ্যে একভাবে সূর্যপূজার ধারাও রয়েছে, এটা মানতেই হয়। অবশ্য সূর্য-কেন্দ্রিক-

উপাসনা এবং উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারা একে অন্যের সঙ্গে সমস্ত সংস্কৃতিতেই সংযুক্ত, এ কথা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে মনে রাখতেই হবে।

ডঃ দুলাল চৌধুরী বাণফোঁড়া, কাটারি ঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে তাঁর একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র-গবেষণা-সমীক্ষায় এক ধরনের আদিম শল্য চিকিৎসাবিধির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত প্রথা বছরের পর বছর-পালন করেন যে-সব 'সাময়িক' সন্ন্যাসীরা, তাঁরা বস্তুতপক্ষে অর্ধভুক্ত, শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ হলেও, বেশ কিছু গরীবী ব্যাধির থেকে মুক্ত থাকেন: যথা হাঁপানী, যক্ষ্মা ইত্যাদি। ভক্তরা একে শিবের মহিমা বলে গণ্য করলেও চৌধুরী এগুলিকে এক ধরনের রোগ নিবারক প্রক্রিয়া হিশেবেই গণ্য করেন, যা নাকি স্মরণাতীত কাল থেকে চালু রয়েছে।

এ নিয়ে শল্যবিদ্ এবং সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা একযোগে গবেষণা করলে নিশ্চয়ই আরও দৃঢ়ভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌছুনো সম্ভব হবে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা খুবই প্রাসঙ্গিক যে, এই ব্যাপারগুলির মধ্যে আদিম জাদু বিশ্বাসের একটি উত্তরসরণ রয়েছে। শারীর-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত যে বাস্তব কার্যকারণই এই সব কঠিনসাধ্য প্রয়াসগুলির অন্তর্লীন থাকুক না কেন, বৃহত্তর জনজীবনের যুগার্জিত সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব প্রথার পালন এক ধরনের অলৌকিক শক্তির অধিকারী করে তোলে ভক্ত্যা বা বালাদের, এইটাই ধরে নেওয়া হয়।

শুধু বাণফোঁড়া, কাঁটাঝাঁপ বা কাটারিঝাঁপই নয়, গাজন চড়ক ইত্যাদির সঙ্গে জাদু বিশ্বাসের উপকরণ অন্যত্রও মেলে। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে গাজনের 'সং' সেজে এসে নারদরূপী ভক্ত্যা শিব-দুর্গারূপী ভক্ত্যাদের ঝোলায় প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ির দোরের সামনের মাটি এক চিমটে করে তুলে দেয়, এও আদিম এক জাদু বিশ্বাসের লব্ধফল: ঘরের দোরের মাটির কিয়দংশ যে 'হরপার্বতী'র আওতায় রইল—এর ফলে আসন্ন নতুন বছরে সম্ভাব্য সব বিপদ আপদ থেকে ঐ বাড়িকে তাঁরাই বাঁচাবেন—সংস্কার হল এটাই।

আজরা (অর্থাৎ, প্রেত) পুজো, চিতা জাগানো ইত্যাদি আদিম অভিচারমূলক ব্যাপারগুলিও প্রেত-বিশ্বাস-কেন্দ্রিক জাদুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধূপচালনায় মন্ত্র পড়ে 'বাবা'-র 'ভর' করানো হয় কারুর ওপর। তার মাধ্যমে গ্রামান্তরের শ্মশানে পড়ে থাকা মৃতদেহের অংশ বিশেষ আনিয়ে নিয়ে পুজো করা ইত্যাদি ব্যাপারও যে চড়ক উৎসবের সঙ্গে বিজড়িত থাকে কোন কোন জায়গায় সেটাও স্মর্তব্য। এ আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

কিন্তু এই সব আদিমতাকে অতিক্রম করতে না পারলেও (কোন্ পূজার অবলীনেই তা পারার মতো উপাদান আছে!), এই চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবটির মধ্যে একটি সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় দিক আছে। বছরের মধ্যে অন্ততঃ একটি দিন তথাকথিত 'অন্'-জাতের হতভাগ্য মানুষগুলি 'ভদ্দর' ও 'শুদ্দুর'-দের সমকক্ষ বলে স্বীকৃত হয়। তথাকথিত হীনবর্ণজ 'পাটভক্ত্যা'-কেও সেদিন ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা প্রণাম করেন। সব বর্ণের ভক্ত্যা বা বালারাই একত্রে বসে অন্নগ্রহণ করেন। তাই চড়ক গাজন গম্ভীরা নীল এক অর্থে বাংলার দরিদ্রতম শ্রেণীর অবমানিত মানুষগুলির সামাজিক মহোৎসব—একদিক থেকে পিপলস' ফেস্টিভ্যাল বলেও হয়ত একে আখ্যা দেওয়া যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বিবিধ চৈত্রসংক্রান্তি ব্রতগুলির মধ্যে বিত্ত, গার্হস্থ্যসুখ, রূপ-যৌবন ইত্যাদির প্রার্থনা উদ্ভাসিত। কিন্তু শ্মশানচারী দরিদ্র ডোমের প্রতিভূ শিবকে উপলক্ষ করে এই যে উৎসব, শুধু এই মানুষগুলির বেঁচে থাকার অভীপ্সাটুকুই ব্যঞ্জিত করে মাত্র—তার বেশি কিছু চাইতেও যেন তাঁরা কুণ্ঠিত এই বর্ণ শ্রেণী-শোষিত সমাজে।

## তেইশ ॥ নানা পার্বণ : [১] ঝুলন, রাস ও রাখীবন্ধন

শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন যাত্রা এবং কার্তিক পূর্ণিমায় রাস যাত্রা বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে মূলত বৈষ্ণবীয় ভাবধারার বহুল ব্যাপ্তির ফলে। রাখীবন্ধন মূলত হিন্দীভাষী জনবলয়েই প্রচলিত বটে, কিন্তু ইদানীন্তন কালে বাঙালীর সাংস্কৃতিক অভ্যাসের মধ্যে এটির উপস্থিতি ঘটেছে। এর কোনোটিই শাস্ত্রীয় প্রথাবিহিত নয়; লৌকিক কিছু ভাবনা এবং সংস্কারের সমাহারে এরা গড়ে উঠেছে।

ঝুলন এবং রাস এক অর্থে নরনারীর মিলনোৎসব। 'যাত্রা' শব্দটির ব্যবহার এর হদিশ মেলায়: 'যাওয়া' নয়, 'রমণ'-অর্থে-'গমন'-ই এর তাৎপর্য নির্দেশ করে। রাধাকৃষ্ণকে এই সব উৎসবের মধ্যে সুস্থিত করা হয়েছে তারই প্রতীক-ব্যঞ্জনা প্রকাশের জন্য। বছরের কোনো-কোনো দিন অবাধ-মেলামেশার সুযোগ দেবার প্রথা বিশ্বজুড়ে সর্বত্রই, সব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই স্মরণপূর্বকাল থেকে প্রচলমান। এর বিস্তৃত উল্লেখ হোলি-উৎসবের প্রসঙ্গে করেছি। আমাদের দেশের বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের বহু উৎসব এখনো প্রচলিত। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলেই আদিবাসী-সমাজে নরনারীর অবাধ মিলনকে কেন্দ্র করে যে-সব উৎসবের উপলক্ষ আছে, সামাজিক উদ্বর্তনের পথ বেয়ে তারাই আবার এই দোল, মে-ফেয়ার, রাস, ব্যাকানালিয়া, ঝুলন, ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যাল-ইত্যাদিতে পরিণতি পেয়েছে। এদের মধ্যে যে-গুলি সুপরিশীলনের পালিশ পেয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের যৌনাচারটা প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে সামাজিক মেলামেশাটা; ঝুলন এবং রাস এর ভাল উদাহরণ। হোলিতে যেমন বিনা বাধায় সম্পূর্ণ অপরিচিতাকেও আবীর-কুমকুম মাখানো যায়, কি ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যালে তার গায়ে ফুল ছুঁড়ে মারা যায় নিশ্চিন্তে, বড়দিনের উৎসবে সাজানো মিস্‌লটোর নীচে এসে পড়লে নিঃসম্পর্কীয়াকেও চুম্বন করা চলে নির্ভয়ে, সে ধরনের আদিম আরণ্যক যৌনোৎসবের স্তর থেকে ঝুলন বা রাস বিবর্তিত হয়ে উঠে এসেছে। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত সহরাই উৎসবে স্ত্রী-পুরুষের নাচ-গান এবং তার পরে অরণ্যবিহার বা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী

সমাজে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত হুদুমদেও পূজা এবং পুরুষদের মধ্যে চালু মদনকাম-ওরফে-চাঁদ খেলা ইত্যাদির মধ্যে ঐ যৌনোৎসবধর্মিতা প্রকট হয়ে আছে যে-ভাবে, ঝুলন-রাস-ইত্যাদির মধ্যে তার কোনো আভাস নেই, এটা মানতেই হবে।

কিন্তু মূলত, এই দুটি উৎসবই যে পূর্ণিমার রাত্রে হয়ে থাকে এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়: প্রাথমিক কোনো পর্যায়ে এরা চন্দ্রোৎসবই ছিল সম্ভবত। পূর্ণজ্যোৎস্নায় মদনোৎসব—একটি বর্ষার অন্তে এবং অন্যটি হেমন্তের শুরুতে—অর্থাৎ ফসলের মুখপাত এবং পরিপূর্ণতা যখন-যখন ঘটছে, সেই উপলক্ষদুটিকে উৎসবের মধ্যে পালন করা হতো এ-দুয়ের আদি-পর্যায়ে। পূর্ণ চন্দ্রের রাত্রির পরিবেশটি সহজবোধ্য কারণেই নির্দিষ্ট হয়েছে: নারীর ঋতুচক্রের সঙ্গে চান্দ্র-মাসের হিশেবটা সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ করতে শিখেছে।

তাহলে ঝুলন এবং রাসকে তাদের আদিরূপে (আর্কিটাইপ) শস্যোৎসব বলা যায়; ঝুলনের তিথিতেই কেরল অঞ্চলে অন্নোৎসব ওনম্ পালিত হয়, এটাও প্রাসঙ্গিকভাবে স্মর্তব্য। উর্বরতাকেন্দ্রিক-ধর্মধারার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নারী-পুরুষের নির্বাধ মেলামেশাটা তার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ততাবেই এসেছে পরবর্তী-কালে। আরও পরে, সমাজের বাহিরঙ্গিক পরিশীলন যত ঘটেছে—ততই এই পর্বের উর্বরতাভিত্তিক যৌনচরিত্র আড়ালে চলে গেছে, শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে তার ব্যঞ্জনাটাই এদের মধ্যে বিদ্যমান।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় রাখীবন্ধন প্রসঙ্গে জৈন ধর্মগ্রন্থে সাতশ মুনির বিপন্মুক্তির একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। হিন্দীভাষী বলয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরস্পরকে রাখী পরানোর যে প্রথা আছে, তার উৎসে হয়ত বা ঐ কাহিনীর ভাবপ্রেরণা থাকতে পারে। তবে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে এটাই দেখা যায় যে, জীবনচর্যার ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে-সব রীতি বা সংস্কার তৈরী হয়, পরবর্তীকালে তাদেরকেই কোনো-না-কোনো একটা কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে রাখীপূর্ণিমায় দেখা যায় সচরাচর শুধু ভগ্নী-সম্পর্কীয়ারাই ভাইদের হাতে রাখী বেঁধে দেন। এটির উৎসে খুব সম্ভবত মধ্যযুগের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আছে: শোনা যায় কোনো এক রাজপুত-রাজকুমারী—কর্মবতী—সম্রাট হুমায়ুনকে ভাই বলে গণ্য করেছিলেন এবং সেই স্বীকৃতির সূচক হিশেবে তাঁকে রাখী পাঠিয়েছিলেন। হুমায়ুন বাদশাও এই রাখীর মর্যাদা দিয়ে কর্মবতীর রাজ্য

বাঁচাতে বাহাদুর শার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভাইবোনে রাখী বাঁধার এই পরবর্তীকালীন রেওয়াজ অবশ্যই প্রথম আমলে ছিল না। এই 'বন্ধন' নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে-মানসিকতা থেকে ঘটতে পারে, তার সুন্দর একটি অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায়: "কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখী পূর্ণিমায়?"

রাখীবন্ধন-বা রক্ষাবন্ধন সম্পর্কে যে পৌরাণিক কাহিনী আছে, সেটি বিচার করলেও ভাই-বোন-সম্পর্কের বদলে এই প্রথা যে স্বামী-স্ত্রী (বা প্রেমিক-প্রেমিকা) সম্পর্কের সঙ্গেই যুক্ত ছিল আদিকালে—এমনই দেখা যায়: অসুরদের হাতে স্বর্গপুরীর পতন ঘটলে, শচী শিবের আরাধনা করে স্বামীর বিঘ্ন-বিপদনাশী একটি কবচ লাভ করেন বর স্বরূপ। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের পথনির্দেশ পাবার জন্য ইন্দ্র বৃহস্পতির সঙ্গে আলোচনায় বসলে; শচী তখন ঐ কবচ তাঁর ডান হাতে বেঁধে দেন এবং ভরসা দেন যে এরই জোরে ইন্দ্র সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন এবং কর্মে সিদ্ধিলাভ—এক্ষেত্রে রাজ্য পুনরুদ্ধার—করতে পারবেন। এই রক্ষাবন্ধন ঘটেছিল শ্রাবণী পূর্ণিমায় এমনই সংস্কার আছে হিন্দুদের। উত্তর ভারতীয় কোনো-কোনো সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই তিথিতে নূতন উপবীত ধারণের মূলেও সম্ভবত এই সুপ্রাচীন জাদু-সংস্কার (যার ব্যাখ্যান রূপে ঐ পুরাণবৃত্তান্ত তৈরী হয়েছে) সক্রিয় আছে। সে যাই হোক না কেন, ইন্দ্র-শচীর কাহিনীটি যে-সামাজিক মানসিকতা থেকে সঞ্জাত, তার বিশেষ তাৎপর্যটি অনুধাবনীয়। ঝুলন পূর্ণিমার সামগ্রিক ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে রাখীবন্ধনের এই তাৎপর্যটিই সাযুজ্যপূর্ণ। বিয়ের সময় হাতে রঙিন্ সুতো বাঁধার বেওয়াজ প্রতীক-প্রতিষ্ঠার যে-মন থেকে তৈরী হয়েছে, রাখীর আদি উৎসও তাই-ই। রাখী, বিবাহকালীন রঙিন সুতো এবং আংটি—এ সব কিছুরই ব্যঞ্জনা এক: এরা এক ধরনের মিলনপ্রতীক বন্ধের পরিগণ্য। ভাই-বোনে রাখীবাঁধার প্রথাটি পরবর্তীকালের বিবর্তন।

## চব্বিশ ॥ নানা পার্বণ [২] : অম্বুবাচী, ইতু, নবান্ন, পৌষপার্বণ

এই চারটি উপলক্ষই সংশয়বিরহিত ভাবে শস্য উৎসব-ভিত্তিক ধর্মধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারায় নারী ও ধরিত্রী সমার্থবোধক বলে গণ্য হওয়ায়, যে-সব সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে, অম্বুবাচী তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখনীয়।

নতুন বর্ষার মুখপাতে পৃথিবী যখন প্রথম সিক্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে প্রথম-ঋতুমতী নারী রূপে গণ্য করার আদিম সংস্কারই অম্বুবাচীর উৎসে। ঋতুর ঠিক পরবর্তী দিনগুলি যেমন নারীর পক্ষে সন্তান-ধারণের জন্য প্রশস্ততম, ঠিক তেমনই অম্বুবাচীর পরবর্তী সময়টাই ফসল ফলানোর পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয় কাল বলে মনে করা হয়েছে। ওড়িশায় এই পার্বণকে তো স্পষ্টাস্পষ্টি রজোৎসব বলেই উল্লেখ করা হয়। আসামের কামাখ্যা মন্দিরেও এই উপলক্ষে দেবীর ঋতুকাল সমাগত মনে করে উৎসব পালন করা হয়।

সূর্যের দক্ষিণায়ণের দিন থেকে তিনদিন (আষাঢ়ের ৭-থেকে-১০-এর মধ্যে এর শুরু) এই পার্বণের পালনকাল। এই ক-টি দিন জমিতে লাঙল দেওয়া বা বীজ বোনা নিষেধ—ঋতুকালে নারীর পুরুষ-সংসর্গ নিষিদ্ধ যে জন্যে, ঠিক সেই কারণেই। (পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করা গেছে যে, ভাষাতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন পুরুষাঙ্গবাচক শব্দ 'লিঙ্গ' এবং কৃষিযন্ত্র ঐ 'লাঙ্গল' একই উৎসজ।) এই 'সংযম' পালনের সূত্রেই উপবাস এবং অরন্ধনের প্রথা আরোপিত হয়েছে পরে। বিধবার ক্ষেত্রে এই 'সংযম' পালনটা সেই সামাজিক-মানসিকতা থেকেই এসেছে, যার আর এক অভিব্যক্তি একাদশীতে। অম্বুবাচীর মূল উপলক্ষের সঙ্গে এসবের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং আসাম ও ওড়িশায় (সেখানে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন হয় এই পার্বণ) এই কদিন উৎসবের আবহাওয়াই থাকে।

নতুন ফসল ওঠার কালেও যে কতকগুলি কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব আছে তাদের মধ্যে ইতুব্রত ব্যাপকভাবে প্রচলিত, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে। ইতু হল 'ঋতু'র স্খলিত-উচ্চারণজাত রূপ। ইতুপুজোকে সূর্য-উপাসনা বলেন যদিও কেউ-কেউ, তবু সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেই এই পার্বণের রীতি-ও-

উপচার বিশ্লেষণ করে ইতুকে মাতৃকাদেবী রূপেই গণ্য করবেন। ঘটের গায়ে পুত্‌লি আঁকা এবং ভিতরে শস্যদানা ও তৃণগুচ্ছ রাখা একই সঙ্গে মাতৃপ্রতীক আর প্রতীকী শস্যক্ষেত্র (জেমস ফ্রেজার সারা পৃথিবীর শস্য-উৎসবেই এই ধরনের রীতি-এবং-উপচার দেখে একে 'গার্ডেন অব অ্যাডোনিস' নাম দিয়েছেন) স্বরূপ। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অঘ্রাণ-সংক্রান্তি—ফসলী ঋতুর ভরাভরন্ত সময়কাল—অবধি প্রতি রবিবার ঐ ঘটপূজা হয় যেহেতু—সেই জন্য 'রবি'-তথা-'সূর্য'-ই ইতু এমন ধারণা হয়েছে। ফার্টিলিটি কাল্‌টের সঙ্গে তো সূর্যের একটা যোগসূত্র আছেই। কিন্তু তাই বলে ইতুই সূর্য, এমন নয়। সূর্য-ওরফে-বৈদিক 'মিত্র' দেবতা উচ্চারণ অপভ্রংশে 'ইতু' হয়েছেন, এমন ভাবনা নেহাৎই দূরান্বয়ী। অগ্রহায়ণের শেষে ফসল ঘরে উঠে গেলে ইতুর ঘট ভাসিয়ে দেবার রীতি, তার মাতৃকারূপকেই সূচিত করে বেশি করে।

ইতুপূজো এবং নবান্ন উৎসব একই সময়ে হয়—এদের চরিত্রও যে মূলত একই তা 'নবান্ন' নামেই স্বপ্রকাশ। নতুন আমন ধান ওঠার পর তার থেকে পাওয়া চাল নিজেরা খাবার আগে পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশে রন্ধনশেষে নিবেদন করার প্রথা রয়েছে এই উপলক্ষে। এদিক থেকে দেখলে এটি মহালয়ায়ই সমধর্মী একটি পার্বণ। মনে করা হয় পিতৃপুরুষ কাকের রূপ ধরে এসে 'নবান্ন'-এর অংশ গ্রহণ করে যান; এই 'কাক' রূপধারী পূর্বপুরুষের কল্পনা এক ধরনের টোটেম ভাবনা নিঃসন্দেহে। শাঁখ বাজিয়ে পূর্বপুরুষের আত্মাকে আহ্বান করার প্রথা আছে এই উৎসবে।

নতুন ধান, নতুন গুড় এবং দুধ, নবান্নের নিবেদিত খাদ্যের প্রধান উপকরণ। নবান্ন উৎসব পালনের কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ বা তিথি নেই—ফসল গোলাজাত করার সময়ে যে-কোনো দিনই তা করা যেতে পারে, যদিও পাঁজির বিধানে 'শুভদিন' দেখেই মেয়েরা নবান্ন 'মাখেন'। প্রস্তুত খাদ্যটিকে সাধারণভাবে মেয়েরা খুবই পবিত্র বলে মনে করে থাকেন এবং এর মধ্যে খানিকটা দৈবীগুণও কল্পনা করেন তাঁরা। এজন্য স্নান সেরে শুচিস্নিগ্ধ অবস্থায় নবান্ন স্পর্শ করার লৌকিক বিধান আছে। বিশেষ-বিশেষ শারীরিক অবস্থায়, ঐ দৈবীপবিত্রতা আরোপ করার কারণে নবান্ন স্পর্শ করার ট্যাবু (নিষেধাত্মক ধর্মীয় সংস্কার) আছে। তবে অন্য কেউ হাতে তুলে দিলে নিজের জন্য গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

স্পষ্টতই, নবান্নকে খাদ্য-দেবতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষের আত্মা কাকরূপে নবান্ন গ্রহণ করে গেলে বাকি খাদ্যটা তাঁদের প্রসাদরূপেই গণ্য

হয়। পিতৃপুরুষের আত্মা সেখানে দেবকল্প। এখানে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার দেখা যাচ্ছে: নবান্ন একই সঙ্গে 'দেবতার' প্রসাদ এবং 'দেবতা'-কল্প। এ ধরনের সংস্কারের বিমিশ্রণ নিতান্তই দুর্লভ।

নবান্নে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের অংশটুকু ছাড়া অনুষ্ঠানের বাকিটা সবই প্রায় মেয়েদের করণীয়। এই শ্রাদ্ধও পুরোহিত ছাড়াই সচরাচর হয়ে থাকে; মহালয়ার তর্পণের সঙ্গে এদিক থেকেও ভাবসাযুজ্য রয়েছে। সারা বছর ধরে শস্যকে কেন্দ্র করে যত রকমের উপলক্ষ বাঙালী হিন্দুর সংসারে আবির্ভূত হয়, তাদের মধ্যে নবান্নের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে—যার অনুষঙ্গ ধরে এর কিছু পরেই আরেকটি উপলক্ষ উপস্থিত হয়: পৌষপার্বণ।

নতুন শস্য ঘরে উঠলে আনন্দোৎসবের রেওয়াজ বিশ্বজনীন এবং তার বয়সও অনেক হাজার বছর। কৃষির উদ্ভবের পর থেকেই এই শস্য-উৎসবের ধারা প্রচলিত হয়েছে সমস্ত দেশে এবং সমাজে। সেই বিশ্বজনীন ঐতিহ্যেরই ধারাবাহী আমাদের পৌষসংক্রান্তির বিভিন্ন উৎসব।

এই তিথিতে দক্ষিণভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পালিত হয় অন্নোৎসব পোঙ্গল। আসামের মাঘ-বিহু উৎসবেরও মুখবন্ধ এই দিন। গুজরাটে ঐ দিন শস্যোৎসব পালনের অনুষঙ্গ হিশেবে সূর্য পূজার দ্যোতক স্বরূপ ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতেই বা কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে—যে-যে জায়গায় প্রধান খাদ্যই হল ভাত—আনন্দের, উৎসবের প্রথার প্রচলন হয়েছে?

খুব সম্ভবত ঐ গুজরাটি রীতির মধ্যেই এর ঐতিহাসিক সূত্র মিলবে। এখন সূর্যের উত্তরায়ণ মাঘের শেষ সপ্তাহে ঘটলেও হাজার দুয়েক বছর আগে তার তারিখ ছিল পৌষের শেষেই। ঐ প্রাচীন আমল থেকেই কালচক্রের পরিবর্তনের পটভূমিতে এই উৎসব পালিত হতে শুরু হয়েছিল বোধহয় সেই সব অঞ্চলে, যেখানে আমন ধান ফলে এবং ততদিনে গোলায় ওঠে। সূর্যের ঐ কক্ষ-পরিবর্তনের উপলক্ষে তার উদ্দেশে প্রণতি নিবেদনের প্রতীক ছিল ঘুড়ি ওড়ানো, প্রাচীন বিশ্বাস-অনুযায়ী, যা মানুষের ভক্তির অর্ঘ্যকে তার কাছে পৌঁছে দেয়। সূর্যের সঙ্গে শস্যের সম্পর্কের কথা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভেবে এসেছে যেহেতু।

এই উত্তরায়ণ ওরফে মকরসংক্রান্তির উপলক্ষেই হয় গঙ্গাসাগরের মেলা। কপিল-মুনির পৌরাণিক গল্পের ভিত্তি যাই হোক না কেন—প্রাচীন হিন্দুরা, মকরবাহিনী

গঙ্গাকে ঐ তিথিতে ভগীরথ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন শিবের জটা থেকে মুক্ত করে, এমন কল্পনা করেই পুরাণ-বৃত্তান্ত গড়েছিলেন। 'মকর' নামটির ভাবানুষঙ্গেই এই ভাবনার উদ্ভব সন্দেহ নেই। এই তারিখে পূব-বাংলায় বাস্তুপূজার যে প্রথা আছে, সেখানে ( মকরের বিকল্পে ) মাটির কুমির বলি দেবার রীতিও সম্ভবত এই আদিম ভাবনার সূত্রবাহী।

শুধু কুমিরই বা কেন? বরিশাল অঞ্চলে এই পৌষপার্বণের দিন গৃহদেবতা-তথা-বাস্তুদেবের পূজা উপলক্ষে ব্যাঘ্রবাহিনী কুলাই দেবীর আরাধনার সময়ে দুটি করে মাটির কুমিরের সঙ্গে একটি বাঘের মূর্তিও থাকে। ছেলের দল একদা দল বেঁধে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বাঘের এবং ধান তোলার বিষয়ে ছড়া কেটে-কেটে খাবার-দাবার জোগাড় করত। পশ্চিম বাংলাতেও কিছু-কিছু এলাকায় একই ভাবে পৌষলা উৎসবের শেষ দিনে কুলুই ঠাকুরের পুজোয় ঐ রকম বাঘ ও ধান-সম্পৃক্ত ছড়া আওড়ানোর প্রথা আছে। মৈমনসিংহে এই ছড়ার আঞ্চলিক নাম 'বাঘাইয়ের বয়াৎ'। নদীয়া জেলায় অনুরূপ ছড়া ও গানকে বলে 'হোলবোল' কিংবা 'হলুই গান।' এই ধরনের প্রথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলেও আছে। রংপুরের ব্যাঘ্রবাহন জোড়া দেবতা 'সোনা-উপো' বা সোনা রায়-রূপা রায়েরও এই পৌষালী সংক্রান্তিতে পুজো উপলক্ষে বাঘের তুষ্টিবাচক কথাবার্তা বলে ছড়া কাটা হয়ে থাকে।

শস্য উৎসবের সঙ্গে পশুর এবং পশুর দেবতার এই যোগাযোগটা সারা বাংলা জুড়ে কেন যে হয়েছে, সেটা আকর্ষণীয় প্রশ্ন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফসল কাটবার সময় শস্যগুচ্ছ নানা ধরনের পশুরূপে কল্পিত হয় কৃষকদের আদিম সংস্কারানুযায়ী। সে না-হয় আদিমতর সংস্কারকে ( পশুই খাদ্য ছিল, এখন ফসল খাদ্য, সুতরাং পশু ও ফসল সমার্থক) অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে; কিন্তু এখানে? বাঘ বা কুমির ত খাদ্য ছিলনা, চিরকালই ত তারা খাদক! তবে?

সেই 'তবে'র হদিশ একটি প্রবাদে আছে: মাঘের শীতে বাঘে পালায়'। ফসলী ঋতু মানুষকে অন্ন দিলেও, নিরাপত্তা দেয় নি। সুতরাং, সাপ বাদে গ্রাম-বাংলার মানুষের আর যে দুটি প্রধান শত্রু—বাঘ ও কুমির—তাদের এবং তাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের তুষ্টি সাধনের জন্য এই সব প্রথার অভ্যুদয় হয়েছিল। দল বেঁধে হইচই করে বনভোজন এবং ছড়া-গানের মাধ্যমে বাঘ তাড়ানোটাও হয়ত উদ্দেশ্য ছিল একদা। মাঘের প্রাক্কালে বাঘ পালিয়ে যাবে এই ছিল কামনা। দল বেঁধে ফসল কাটার পটভূমিতে বাঘ গহীন বনে চলে যাচ্ছে—এমন ছবি

মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহরেব গায়ে খোদাই থাকতে দেখা গেছে। সেই ঐতিহ্যের অনুসরণই ঐ আদি-অস্ট্রিক-দ্রাবিডদের (যাঁরা ধানের সঞ্জাত খাদ্য খেতেন) বংশাবতংস এই আমাদের, বাঙালীদেব মধ্যে প্রবহমান। বাস্তুপুজো উপলক্ষে মাটির কুমির বলি দেওয়াটা আদিমতর ভাবনার ধারাবাহী: হিংস্র পশুকে বধ করে নিরাপদে থাকার জন্য আশ্রয় নেওয়া দেবতাব কাছে।

পৌষ সংক্রান্তির বিচিত্র ধবনের উৎসবের এ সব তো হল একটি দিকের কথা। অন্য দিকটির বৈচিত্র্যও বড কম নয়। পিঠে-পুলি-পায়েস ইত্যাদি অধুনা-দুর্লভ খাবাবগুলি তৈরি এবং বিতরণও এই পৌষালী উৎসবের অঙ্গ। পশ্চিমবাংলাব নানা জায়গায় মকর সংক্রান্তির আগের দিন আমনধানের কেটে-আনা গুছিকে পূজো করেন মেয়েরা, যাব নাম আওনি-বাঁওনি (আমনী-বাঁধনি)। গ্রাম বাংলায় আর একটি এ ধরনের উৎসব হল পৌষ-আগলানো। সর্বত্র আলপনা এঁকে গোবরের নাড়ু আব চালের গুঁড়ো পুজো করে সারারাত সেগুলো বিনিদ্রভাবে পাহারা দেওয়ার এই প্রথাও বিচিত্র প্রাচীন সংস্কারজাত। দুপুর বেলা কুনকের মধ্যে ধান ও ধানের ছড়া ভরে পূজো করে ধান্যলক্ষ্মীর বন্দনা পূব বাংলার বিরাট অংশ কুড়ে প্রচলিত।

তুষ-তুষ্‌লি ব্রতোদ্‌যাপনও এই দিন। শস্য উৎসব এবং সূর্যবন্দনা এর মধ্যে একত্রিত। রাঢ় বাংলার সুবিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচলিত টুসু বা তুষ্‌ দেবীর পূজাও এই তিথিতে সাঙ্গ হয়। টুসুকে পুরোপুরি শস্যদেবী বলা হবে কি-না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভিন্নমত। শস্যসম্ভারকে উপলক্ষ করেই যে টুসু পরব এবং পৌষ সংক্রান্তিতেই তার সমাপ্তি, এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে গোটা বঙ্গভূমি জুড়ে এই দিন যে-শস্য-কেন্দ্রিত উৎসব নানাভাবে পালিত হয়, এও তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। টুসুর সরা, আওনি-বাঁওনির এবং ধান্য লক্ষ্মীর কুনকে পৌষ-আগ্‌লানোর চালগুঁড়ো—গোবরের নাড়ু—এরা সবই সমান দ্যোতনা বহন করে: ফসল ক্ষেতের এই প্রতীকগুলি সংস্কৃতিবিজ্ঞানে গ্রীক শস্য-দেবতা অ্যাডোনিসের 'বাগান' বলেই যে পরিচিত তা ত এখনি বলেছি।

## পঁচিশ ॥ নানা পার্বণ [৩] : হুদুমদেও, গম্ভীরা, ভাদু, টুসু, ইঁদ পুজো

মূলত আঞ্চলিক চরিত্রের হলেও বাঙালীর কৃষ্টিবলয়ে এমন কতকগুলি পার্বণ আছে, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ছাত্রের কাছে যেগুলির গুরুত্ব বড় কম নয়। উত্তরবঙ্গের হুদুমদেও পুজোকে এবং রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের ইঁদ, ভাদু ও টুসু, আর মালদহের গম্ভীরাকে এদেরই মধ্যে খুব উল্লেখ্য বলে গণ্য করতে পারি।

হুদুমদেও-অর্থাৎ-নগ্নদেবতার পুজো উপলক্ষে যে উৎসব উত্তরবঙ্গের আদিবাসী এবং বাঙালী মহিলাকুল একত্রে পালন করে থাকেন, তার সময়কালে বৈশাখ থেকে আষাঢ়ের মধ্যে। বৃষ্টির প্রত্যাশায় পালিত এই উপলক্ষে আদিম জাদু-সংস্কার খুব প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। একদিক থেকে এটিকে উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারার অন্তর্গতও করা চলে।

কোনো একটি অমাবস্যার রাত্রে—অন্তত কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে—এই পরবের সময় স্থির করেন গ্রামের সমস্ত মহিলা : বারো থেকে বাহান্ন, যাই হোক না কেন তাঁদের বয়স। ঐ রাত্রে গ্রামের কোনো পুরুষের ঘর থেকে বেরোনো ট্যাবু—এমন কি ধর্মীয় সংস্কার এতই প্রবল যে হুদুমপুজোর রাত্রে চোর ডাকাত-লম্পটের উৎপাতও ঘটে না। কোনো মাঠের ধারের শাল বা কলাগাছকে দেবতার প্রতিভূরূপে গণ্য করে সমস্ত মহিলা তার সামনে নির্বসনা হন এবং কলার ছড়াকে পুজো করেন যৌনভাবাত্মক কথায় সাজানো মন্ত্রের মাধ্যমে। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরূপী দেবতার সঙ্গে তাঁরা প্রতীকী মিলনে আবদ্ধ হন এবং রাতভোর শালীনতাবর্জিত ভাষা এবং অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে গান ও নাচ চলে—যার মূল উদ্দেশ্য হুদুমদেও যাতে প্রলুব্ধ হয়ে তাঁদের সবাইকে সেই রাতের জন্য স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিতুষ্টির প্রকাশ-স্বরূপ বৃষ্টি মঞ্জুর করেন। অনাবৃষ্টি হলে বছরের অন্য সময়েও এই হুদুমের পুজো করা চলে।

মনোবিজ্ঞানীরা ত যে-কোনো গাছকেই পুরুষাঙ্গের প্রতীক রূপে গণ্য করেন। শালগাছের বা কলাগাছের ক্ষেত্রে এই ভাবনা তো আরও সুস্পষ্ট—বিশেষত কলাকে তার আকৃতি এবং সংখ্যাগত বহুত্বের জন্য প্রজনন-শক্তির আধারকল্প বলে মনে করা হয়ে থাকে। নারী এবং ধরিত্রী সমার্থক, এই আদিম ধারণা এই

উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল—তাই দেবতার সঙ্গে নারীর কল্পিত মিলনই হলো ধরিত্রীর বুকে বৃষ্টির আবির্ভাবের পূর্বসংকেতবাহী জাদুক্রিয়া, এই প্রত্যয়ই এ উৎসবে প্রকাশিত হয়। শালগাছ ইন্দ্র-তথা-বজ্রবৃষ্টির দেবতা-প্রতীক হিশেবে অন্যত্রও গণ্য হয়—রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের ইঁদপরব এবং ছাতাপরব প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণযোগ্য। এখানে বৃষ্টিদেবতা এবং বৃক্ষদেবতা এক হয়ে গেছে, এটাও উল্লেখ্য।

কুচবিহার থেকে নেমে এসে আঞ্চলিক পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপে যেটি নজরে পড়ে, তা হল মালদহের গম্ভীরা। নাচ এবং গান হিশেবে গম্ভীরার খ্যাতি বিস্তৃততর বটে, কিন্তু এর ধর্মানুষ্ঠানকেন্দ্রিত উৎসবের দিকটিও কিছু কম উল্লেখযোগ্য নয়।

চৈত্রসংক্রান্তির চারদিন আগে থেকেই এই পরব সচরাচর শুরু হয় যদিও, তবে বছরের অন্যান্য সময়েও এ উৎসব পালনের খবর মেলে কখনো-কখনো। গম্ভীরার প্রথম চারদিনের পর চৈত্র সংক্রান্তির তিথিতে হয় চড়কপূজা। মূলত শিবকে কেন্দ্র করেই এই উৎসব—যদিও ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ একে ধর্মঠাকুর পূজার থেকে উৎসারিত বলেছেন। যে-সব দেবতার সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর গড়ে উঠেছিলেন, শিবও তাঁদের মধ্যে কিন্তু অন্যতম। গম্ভীর শিবের একটি নামও বটে।

এই উৎসবের প্রথম দিনে ঘটে জলভরার ব্যাপারটিই মুখ্য। কোনো মাতৃদেবতা এই উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্তা না থাকায়, এই বিষয়টি যথেষ্টই কৌতূহলোদ্দীপক। পরের দিনের উৎসব 'ছোট তামাশা'য় একপায়ে লাফিয়ে শিব-বন্দনা করাব রীতিটিকে প্রাচীন জাদুক্রিয়ার জাতক বলে ধরতে পারেন। তৃতীয় দিনের 'বড় তামাশা'য় মুখোশ পরে নাচই মুখ্য—তার অবলীন উদ্দেশ্যও জাদুক্রিয়া। ঐ দিনের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আচার আছে, যেমন: ফুলভাঙা; কন্টিকারী/কণ্টকী গাছ আর সিদ্ধির গাছ বুকে নিয়ে ভক্ত্যাদের নাচের পর সেগুলি মূল ভক্ত্যার কাছে গচ্ছিত রেখে আবার খানিক পরে মুখোশ (এমন কি মড়ার খুলিও) মুখে বেঁধে ওগুলিকে ফেরৎ নিয়ে আবার নাচ হয় এই আচার পালনের সময়।

চতুর্থ দিনের উৎসবের শুরু মশান নাচে—বিকটদর্শনা প্রেতিনীর সাজে উদ্দাম এই নৃত্যও প্রেতাত্মা ও জাদুতে বিশ্বাসের লক্ষফল। 'মাশান' নামে এক প্রেতের অস্তিত্ব স্থানীয় বিভিন্ন আদিবাসীদের সংস্কারে আছে—এই নাচ তারই ধারানুষঙ্গ-বাহী অবশ্যই। ঐ দিন এর পরে, কচি বাঁশের গায়ে গর্ত-মোচা, আম, বেল এবং

নানারকম শস্য বেঁধে সেটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজার পর সর্বজনীন ভোজ হয়, সেই অনুষ্ঠানের নাম আহারা বা বোলাই। ঐ দিন সন্ধ্যায় নতুন গর্ত খুঁড়ে জলে ভরপুর করে তার মধ্যে একটি জীয়ন্ত শোল মাছ ছাড়া হতো এককালে (এখন এ প্রথা অবলুপ্তির মুখে কোনো অজ্ঞাত কারণে)। গর্তের দুদিক বোলাইয়ের দুটি বাঁশ গুণচিহ্নের মতো করে বেঁধে পোঁতা হতো এবং ঐ কন্টিকারী/কণ্টকী গাছ ও সিদ্ধিগাছের 'ফুল'-গুলি তার ওপর রেখে ধুনোর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে, ভক্ত্যারা আড়াআড়ি বাঁশে পা ঝুলিয়ে সাতবার দোল খেতেন। এর নাম ছিল আগুন ঝাঁপ বা পাটভাঙা। এও জাদু-ক্রিয়া অবশ্যই। আরেকটি বিলুপ্ত-প্রথারও হদিশ দিয়েছেন প্রদ্যোত ঘোষ: ঢেঁকি চুমানো। ঢেঁকির গায়ে সিঁদুর মাখিয়ে তার ওপর একজন নারদ সেজে বসলে, সবাই মিলে নারদশুদ্ধু ঢেঁকি গম্ভীরার প্রাঙ্গণে রেখে দেন। পরদিন চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব সঙ্গে হলে গম্ভীরা পার্বণেরও সমাপ্তি।

গম্ভীরা সমস্ত উৎসবটির মধ্যেই বহু আদিম এবং আপাত-অবোধ্য প্রথার অবশেষ প্রবলভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়। ঘটে জলভরা এবং গর্তে মাছ ছাড়া অবশ্যই মাতৃকাতন্ত্র-তথা-উর্বরতাতন্ত্রের স্মৃতিবাহী। ঘট-ভর্তি জলের তাৎপর্য গর্ভবতী নারীর দ্যোতক; গর্তের জলে মাছ ছাড়া এক ধরণের যৌনপ্রতীক। ঢেঁকির আবির্ভাবও শস্যভাবনাকেই সূচিত করে। কচি বাঁশ, গর্ভমোচা, আম, বেল, শস্য—সবই ঐ উর্বরতাতন্ত্রের সূচক। আবার কাঁটাগাছ, সিদ্ধিগাছ, মুখোশ, মড়ারখুলি, প্রেতিনী সাজা এসব হল আদিম কালের উত্তরাধিকার স্বরূপ ভূত-প্রেতে প্রত্যয়। একপায়ে লাফানো, মুখোশ নাচ, বাঁশে পা ঝুলিয়ে আগুনের ওপর দোল খাওয়া—ইত্যাদি জাদুপ্রক্রিয়া কাল-পরম্পরায় নানা প্রত্যাশায় সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকতে পারে গম্ভীরার মধ্যে। এমন বিচিত্র সব আদিমতার সঙ্গে গম্ভীরার গানের মাধ্যমে যে আধুনিক গণসংযোগী মনের সমন্বয় ঘটে এই উৎসবে, তার জন্য একে একটি অন্যরহিত লৌকিক পার্বণ বলতে পারি অবশ্যই।

মালদহ থেকে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে এলে রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের আঞ্চলিক পার্বণগুলির খোঁজ করলে খুব উল্লেখযোগ্য রূপে এইগুলিকে দেখি: ভাদু, টুসু, ইঁদ। এছাড়া বাঁধনা, করম, জাওয়া এবং সহরুল ইত্যাদি—মূলত আদিবাসীদের মধ্যেই প্রচলিত—পরবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাদু এবং টুসু প্রধানত শস্য-উৎসব।

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ার কিছু অংশে এবং পুরুলিয়া জেলার হুড়া-কাশীপুর অঞ্চলে ভাদুর উৎসব হয় সারা ভাদ্র মাস জুড়ে। ভাদুকে ঠিক দেবীরূপে গণ্য করা হয় না, যদিও ঘরে-ঘরে তাঁর মূর্তি নিয়ে এসে উৎসব করার একটা রেওয়াজ ব্যাপক ভাবেই আছে। ভাদু বা ভাদুলী বা ভাদলী আসলে এক মানবকন্যারই নাম—এই রকম কিংবদন্তী রয়েছে। পঞ্চকোটের রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীই কালক্রমে বৃহৎ এক এলাকার জনমানসে আরাধ্যা ভাদুতে পরিণত হয়েছেন, এই রকমই প্রচলিত বিশ্বাস।

এই ভদ্রেশ্বরীকে নিয়ে বেশ কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে, ভাদুব উৎসব প্রসঙ্গে যেগুলি অবশ্যই বিচার্য। প্রথম কাহিনী: ভাদুকুমারী বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠলেও বিয়েতে অমত প্রকাশ করে কৃষ্ণ-আরাধনাতে নিমগ্ন থাকতেন। একদিন মধ্যরাত্রে মেয়েকে প্রাসাদে না দেখে, রাজা সন্দিহান হয়ে মন্দিরের সামনে পৌঁছে শুনতে পেলেন মেয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। ক্রুদ্ধ রাজা দরজা ভেঙে ঢুকেই দেখলেন কৃষ্ণের মূর্তির পায়ের তলায় মেয়ের দেহ আছড়ে পড়ে প্রাণহীন হয়ে গেল। সেই থেকে দেবতার বিগ্রহের পাশে মেয়ের মূর্তিও স্থাপন করলেন রাজা এবং ভাদুর জন্মমাস জুড়ে তাঁর পূজা করারও প্রচলন হল সেই থেকে।

দ্বিতীয় কাহিনীতে শাক্ত ধর্মের ছায়াপাত ঘটেছে: হর-পার্বতীর মধ্যে একবার কলহ হলে, দেবী কৈলাস ছেড়ে মর্ত্যধামে এসে পঞ্চকোটে ভাদুরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। বিয়ের বয়স হলেও মেয়ে সংসারী হতে রাজি হন না কিছুতেই—এমন সময়ে নারদ এসে নিজের পরিচয় দিয়ে পার্বতীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। কন্যা-শোকাতুর পঞ্চকোট-রাজের নির্বন্ধে তখন থেকেই ভাদুর পুজো চালু হল দেশে।

তৃতীয় কাহিনীতে: রাজকন্যা ভাদু দেশের বাউরী-প্রমুখ উপেক্ষিত জন-গোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত মমতাশীলা ছিলেন এবং সর্বদাই তাঁদের দুঃখকষ্টের প্রতিবিধান করতে ব্রতিনী ছিলেন। কুমারী অবস্থাতেই নিজের জন্মমাস ভাদ্রে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। দেবীতুল্যা এই রাজকন্যার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিবশত ঐ দরিদ্র জনসাধারণ তখন থেকে ভাদুর মূর্তি গড়িয়ে তাঁর পূজার এবং সেই উপলক্ষে একটি স্মরণোৎসবের প্রচলন করল। চতুর্থ গল্পে আছে যে, ভাদুর বিয়ের দিন সকালে পঞ্চকোট রাজবাড়িতে খবর এল, ভাবী জামাতা পথে ডাকাতের হাতে খুন হয়েছেন। এই শুনে রাজকন্যা আত্মহত্যা করলেন। শোকাতুর রাজার আদেশে তখন থেকে ভাদুপূজার সূত্রপাত।

আগেই বলেছি যে, প্রচলিত অর্থে যাকে পুজো বলে ভাদুকে নিয়ে ঠিক সে-রকম কিছু করা হয় না। প্রচলিত সব গল্পগুলির মধ্যে তৃতীয়টিই মোটামুটি গ্রহণযোগ্য,কেন না জনসাধারণ স্বেচ্ছায় যেটা মেনে নেয়, সেইটিই সর্বজনীন ভাবে ব্যাপ্তি লাভ করে পরবর্তীকালে—ওপর থেকে চাপিয়ে দিলে ভাদু-উৎসব কখনো একটা পরবের রূপ ধরত না এমনভাবে।

পঞ্চকোটের রাজ পরিবার ধর্মবিশ্বাসে বৈষ্ণব ছিলেন বলে প্রথম কাহিনীটি গড়ে ওঠার অন্তর্লীন মানসিকতাটুকু সহজবোধ্য। শাক্ত-ভাবানুষঙ্গে তৈরী কাহিনীটি স্পষ্টতই অবিশ্বাস্য। এটি গড়ে তোলা হয়েছে ভাদুর মতো একটি ব্যাপকভাবে পালিত লৌকিক উৎসব বৈষ্ণবীয় ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাবার প্রতিস্পর্ধী একটি মানসিকতার পরিণতিতে। বিশেষত, শাক্ত সংস্কারে কুমারী পূজার একটি প্রথা যখন আছেই, তার সঙ্গে এই কুমারী কন্যার পূজাটাকে মিলিয়ে ফেলা খুবই সহজ। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কুমারী মেয়েরাই—যাঁরা শিবপূজারিণী স্বাভাবিকভাবেই—যেখানে ভাদুর মূল উপাসিকা, সেখানে তাঁকে শিবজায়ারূপে প্রতিপন্ন করতে চাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিকও নয়! রাজকন্যাকে পার্বতীর সঙ্গে সমীভূত করে দেবার পিছনে উচ্চকোটির শ্রেণী-মানসিকতাও সুস্পষ্ট। ভাদুকে ঘরের মেয়ে রূপে এবং জননীরূপে দেখার যেমন ঐ এলাকার মানুষের মধ্যে সক্রিয়, তাও শাক্ত ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এখানে প্রশ্ন, তাহলে বাউরী-প্রমুখ অবহেলিত জনসমাজ এই যে রাজ-কুমারীর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি পূজাধর্মী উৎসবের প্রচলন করলেন, এ কি একেবারেই পূর্বসূত্রবিহীন? না, পুরোনো কোনো উৎসবই এইভাবে রূপান্তরিত হল? সংস্কৃতিতত্ত্বের সব ছাত্রই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই সমর্থন করবেন।

স্থানীয় আদিবাসী সমাজে ঐ একই সময়কালে জাওয়া, করম ইত্যাদি যে-সব উৎসব স্মরণপূর্ব কাল থেকে চলে আসছে, তাঁদের সঙ্গে সামাজিক-আর্থনীতিকভাবে প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত এই বাউরী, বাগদী-প্রমুখ গোষ্ঠীর মধ্যেও অনুরূপ একটি উৎসব প্রচলিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। এটিই ভাদু-পরবের রূপ ধরেছে পরে: কিংবদন্তীগুলি তৈরী হয়েছে ঐ রূপান্তরণের উপাদান হিশেবে। দুটি করম বা কদম গাছকে সূর্য ও পৃথিবীর প্রতীক রূপে পাশাপাশি পুঁতে বেঁধে দিলে ফসল ভাল হবে এটাই হল করম-উৎসবের মূল আকাঙ্ক্ষা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যে এটি উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের অনুসৃতি। জাওয়া পরবও করমের মতোই উর্বরতাতন্ত্রের সূচক, অনুষ্ঠিত হয় মোটামুটি একই সময়ে।

করমপূজার তিথি ভাদ্রের শুক্লা একাদশী ; জাওয়া পরব শুরু হয় তার দু-সপ্তাহ আগে। নদী বা পুকুরের পাড়েব মাটি এনে সরায় রেখে নানা ধরনের শস্যবীজ তাতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অংকুর বেরোলে ঐ ডালি নিয়ে ঘুরে-ঘুরে গান করেন মেয়েরা, তারপর করম পূজোর 'থানে' ঐটি রাখা হয় করম ডালের পাশেই। 'গার্ডেন অব অ্যাডোনিস'-র সুন্দর নমুনা জাওয়া ডালি।

ঐ দুটি উপলক্ষের সঙ্গে যদি ভাদুকে মেলাতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকেও শস্য-উৎসবের ধারাবাহী বলে গণ্য করতে হয়। সনৎকুমার মিত্র-প্রমুখ লোকসংস্কৃতিব কোনো-কোনো বিশিষ্ট গবেষক ঐ ব্যাপারে অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন ; আবার শস্যোৎসব বলেও ভাদুকে গণ্য করেছেন কেউ-কেউ। শস্যের কামনা করে যে লোক-উৎসব পালিত হয়, তার সঙ্গে কুমারী কন্যার আরাধনা সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া অবশ্য খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কুমারীর মাতৃত্ব-তৃষ্ণা এবং ফসলের আকাঙ্ক্ষা মানসিক প্রবণতার স্তরে অনুরূপ বলেই পরিগণ্য। সেদিক থেকে দেখলে করম-জাওয়া-জাতীয় উৎসবের রূপান্তর হিশেবে ভাদু উৎসব নিজস্ব মূর্তিতে গড়ে উঠলেও, তার অন্তর্লীন উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারাটাকে উপলব্ধি করতেই হয়। ঠিক পুজো না-হলেও, ভাদুর হরিদ্রাভ মূর্তির কাছে ফুল দিয়ে, নানা সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা গানে-গানে বলার মধ্যে এক ধরনের হৃদয়ার্তিই ফুটে বেবোয়। শস্যোৎসব হোক, আর না-ই হোক—এই জিনিষটিই ভাদুর পরম বৈশিষ্ট্য।

টুসু পরব একদিক থেকে ভাদুরই সমধর্মী। ভাদু যেমন আউশ ধানের মরশুমের উৎসব, টুসু তেমনি আমনে ঋতুর পরব। অঘ্রান সংক্রান্তি থেকে মকর সংক্রান্তি অবধি এই এক মাস হল টুসুর পালনকাল। টুসুর সরা ( এবং কোনো-কোনো জায়গায় তার সঙ্গে ঘটও ) 'অ্যাডোনিসের বাগান' বলেই গণ্য হবে। টুসুকে তুষুও বলা হয়—ধানের তুষ থেকে শব্দটি এসে থাকা সম্ভব ( কারুর-কারুর মতে তিষ্যা নক্ষত্রকালীন উৎসব বলেই ঐ নাম হয়েছে ) ; বাংলা দেশের অন্যত্র এই সময়ে যে তুষু-তুষুলী ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, ভাবগত ক্ষেত্রে তার সঙ্গে টুসু ( বা তুষু ) -র কোনো মৌল পার্থক্য নেই।

টুসুর কোনো ঐতিহ্যবাহী মূর্তি নেই ভাদুর মতো ; যেটা আছে সেটা হল ভাবমূর্তি : টুসুকে সংশ্লিষ্ট বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ 'ঘরের মেয়ে' বলেই মনে করেন ভাদুর মতোই। বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিজস্ব একটি লক্ষণ

হল আরাধ্যা দেবীকে শুধু মাতৃমূর্তি নয়, কন্যামূর্তিতেও কল্পনা কবা ; ভাদু এবং টুসু সেই ঐতিহ্যেরই অনবদ্য দুটি অভিব্যক্তি।

টুসু পুতুল কোনো-কোনো এলাকায় প্রচলিত আছে। টুসু অর্থে 'পুতুল' এমনও বলেছেন প্রয়াতা গবেষক সরিতা ভৌমিক। একটা থালায় করে ঐ পুতুল, সরা, ঘট ইত্যাদি রেখে, ধান, চাল, ফুল, ফল, দুর্বা, জলন্ত প্রদীপ, ধূপ। ধূনো-গুগ্‌গুল, এই সব সাজিয়ে দেওয়াই হল টুসুর আপ্যায়ন—পুজো করার তথাকথিত কোনো রেওয়াজ নেই।

টুসু-পরবের মূল কথাই হল ঐটি : বৎসরান্তে ঘরে-আসা-মেয়েকে আপ্যায়ন। গানই এই পার্বণের প্রধান অঙ্গ—ঠিক ভাদুব মতোই ঘরোয়া সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, বিরহ-মিলনের সঙ্গে সমাজ ও দেশের নানান্ কথাও ঐ সব গানের কথার উপজীব্য। পরবের প্রথম দিনের 'বাউরি ( বা বৌরি ) বাঁধা' থেকে গান শুরু—ঘরবাড়ি সাফ করা, কাপড় জামা পরিষ্কার, নদীতে-পুকুরে গিয়ে কিছু জ্যান্ত মাছ ধরা ( এটিও অনিবার্যভাবে উর্বরতাকেন্দ্রিক কাল্‌টের সূচক ), চাল গুঁড়িয়ে পিঠে-পুলি করা, তুলসী তলায় টুসুকে সাজানো, আল্‌পনা দেওয়া—আর গান, সব সময়েই! ছোট্ট কুণ্ড কেটে জলে গোবর গুলে দেওয়া, রঙিন কাগজ আর রাংতা দিয়ে চৌদোল সাজানো, ফুল-দুর্বা দেওয়া, সবাইকে 'ভোগ' দেওয়া আর গানের পালা অবিরাম। মকর সংক্রান্তির দুদিন আগে থেকেই এই সব চলে, তারপর সংক্রান্তির দিন টুসুকে চৌদোলে বসিয়ে বিসর্জন দিতে যাবার সময় এক দলের সঙ্গে আরেক দলের গানের পাল্লা। সম্পূর্ণই মহিলা-কেন্দ্রিত এই পরবের মধ্যে ( ভাদুর ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা) গানের এই সীমাহীন গুরুত্ব উৎসব হিশেবে এর মধ্যে অনন্যতা সৃষ্টি করছে। আরাধনা বা বন্দনাসূচক মন্ত্র নেই, অথচ ভাদু-ও-টুসু ধর্মধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ; মন্ত্রের পরিবর্তে এসেছে গান এবং তার উপজীব্য ঘরোয়া-কথা যেমন, তেমনই, বিলিতি প্রবাদের অনুসরণে বলি, 'সূর্যের তলার যে কোনো বস্তু!' সুপ্রাচীন-অতীত এবং সাম্প্রতিক-অধুনার এই আশ্চর্য সংশ্লেষণই হচ্ছে ঐ অনন্যতা। সন্নিহিত বিশাল অঞ্চলের মুখ্য তিন পরব—আদিবাসী সমাজের করম এবং বাঙালী সমাজের ভাদু-টুসু, এ তিনের মধ্যেই এই জিনিষ পাই।

রাঢ় অঞ্চলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব পরব হল ইদপুজো। গবেষকদের বহুজনের অভিমতেই এ হল প্রত্ন-ঐতিহাসিক কালের ইন্দ্রপূজারই ভগ্নাবশেষ।

ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে অনুষ্ঠেয় এই পার্বণের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের ছত্তাবোঙ্গার পুজো ওরফে ছাতম পরবের খুবই সাদৃশ্য আছে। মনে করা যেতে পারে একই সঙ্গে প্রাগার্য অস্ট্রিক-ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতিগোষ্ঠীর পর্ব এবং বৈদিক সংস্কৃতির আত্মগরিমা প্রচারমূলক উৎসব কালক্রমে এতে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে।

কথাটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ইঁদ পরবের মূল উদ্যোক্তা হলেন সমাজের ওপরতলার বিত্তবানেরা। প্রাক্তন 'রাজা', জমিদার এবং ইদানীন্তন কালের বড় জোতদাররা এই পরবের জাঁকজমকসমেত সব খরচের ঝক্কিটা নেন সাধারণত নিজেদের বৈভবের বিজ্ঞাপন হিশেবে। স্বভাবতই এই ধরনের একটি উৎসবে সমাজ-সোপানের একেবারে নিচের তলার মানুষদের স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে ব্যাপকভাবে মিশে যাওয়াটা সাধারণভাবে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এই পরবে সেটিই হয়েছে: বর্ণহিন্দুরা এবং সাঁওতাল, ভূমিজ প্রমুখ জাতিকোমগুলির মানুষেরা অন্যান্যদের সঙ্গে সমান উৎসাহে এই উৎসবের শরিক হন। বস্তুত-পক্ষে, সাঁওতালদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই রয়েছে এই উৎসবে।

দ্বারভাঙা থেকে ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম থেকে মালভূম-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূম-বর্ধমান—এই বিস্তৃত এলাকাব সর্বত্রই এই পরবে সর্বশ্রেণীর সমাহার ঘটে। রাধাষ্টমীর দিন স্থানীয়ভাবে মুখ্য বিত্তবান্ যিনি তাঁর পক্ষ থেকে কেউ একজন গিয়ে দুটি শাল গাছ নির্বাচন করেন। তারপর 'শবর' বা 'ধীরা' নামে অভিহিত একদল সাঁওতাল গিয়ে সেই গাছ দুটি ডালপালা সাফ করে এনে বসান চাষের খেতে। একমাত্র এঁদেরই অধিকার ইঁদপুজোর গাছ কাটার। অবণ্য দেবীর বন্দনান্তে এঁদেরকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। ঐ খুঁটি দুটির বডটি হল ইন্দ্রের প্রতীক, অন্যটিতে খাঁজকাটা থাকে—এটিকে তাঁর 'মাসী' (!) বলা হয়। মাঠটি তখন পরিচিত হয় ইঁদকুড়ি নামে।

ইঁদ দেবতার মাথায় একটি উল্টোনো ঝুড়ি (যার নাম 'শাঁখা') বসানো হয়—সবটুকু মিলিয়ে একটা ছাতার অনুরূপ চেহারা ফুটে ওঠে। তারপর গাছ দুটিকে নতুন কাপড়চোপড় পরিয়ে আধাগাছি (বা অধিবাসের) ব্যবস্থা করা হয় পুজোর আগের দিন। খুঁটির তলায় বেদী তৈরী করে জলভর্তি ঘট ইত্যাদি রেখে ইঁদ গাছ বা ইঁদডাঙের তলায় বিভিন্ন ধরণের ফসলের দানাও ছড়িয়ে দেওয়া হয়, পুজোর দিন যাতে সেগুলি থেকে কল বেরোয়। তারপর একদিকে যেমন যাগ-যজ্ঞ-হোম-বৈদিকমন্ত্র-ইত্যাদি সাড়ম্বরে চলে, অন্যদিকে ইঁদডাঙের গায়ে খই ছোঁড়া, দই ছোঁড়া, ফুল ছোঁড়া, আতপ চাল ছোঁড়া-ইত্যাদি লোকাচারও

সমানভাবেই পালিত হয়। এর সঙ্গে নাচগান তো আছেই। বৃষ্টির প্রত্যাশায় এই সব হয়—এবং বৃষ্টি বা হাওয়ার তোড়ে যদি শাঁখা-ঝুড়ি কোনো একদিকে হেলে দোলে, তাহলে ধরা হয় সেদিকে যাদের ক্ষেত তাদের সেই মরশুমে ভাল ফসল হবে।

এই পূজোর শাস্ত্রীয় নাম হচ্ছে শক্রোত্থান বা ইন্দ্রধ্বজ পূজা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ( যাঁদের সহযোগী হিশেবে অনিবার্যভাবে নরসুন্দররা থাকেন কোনো-কোনো অঞ্চলে, যেমন মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ীতে ) শাস্ত্রীয় মতে পূজো-আচ্চা করেন তাঁদের মুরুব্বি বিত্তবান্ ব্যক্তিটির বিত্ত এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মানসে। এঁরা একাধিক পৌরাণিক কাহিনীও প্রচার করেন এ প্রসঙ্গে যাদের মূল কথা হল : অসুর বা দৈত্যরা দেবপুরী দখল করার পর, বিষ্ণুর প্রদত্ত ধ্বজের প্রহারে ইন্দ্র তাঁদের বিতাড়িত করেন ভাদ্রের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে। তারপর থেকে ঐ ধ্বজদণ্ডের গায়ে তাঁর রাজছত্র বেঁধে তিনি দেবসভায় বসতেন! সেই বিজয়-গরিমার সূচক ধ্বজের পূজা তখন থেকেই নাকি প্রচলিত। এই উৎসব তাই 'ইন্দ্রকল্প' (!)-স্থানীয় বিত্তবানের বিজয় ও সমৃদ্ধির মুখপাত করে। ইঁদ-ডাং-এর কেটে ফেলা ডালপালার টুকরো চাষের জমিতে ছড়ালে এবং ইঁদ এবং 'মাসী'-র গায়ের কাপড়ের কুচি ঘরে রাখলে মঙ্গল হয়, এই হচ্ছে স্থানীয় বিশ্বাস। এইটি অবশ্য পূজোর ন-দিন পরের ব্যাপার ; যখন বিসর্জন হয়ে যায়, তাব পরের কথা।

যাঁরা পূজোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তাঁরা কতকগুলি নিয়মও পালন করতে বাধ্য হন। 'শবর'-রা আগে থেকেই নিরামিষ খান। ইঁদ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার দিন উপোস করেন। যাঁর অর্থে-উৎসবের মুখ্য খরচ-খরচা চলে তিনি সস্ত্রীক এবং দুই নিকটাত্মীয় ও পুরোহিত-সহ ইঁদ-ডাং সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। ঐ কদিন ধানসিজানো এবং মাঠে লাঙ্গল দেওয়া বাঁশুই দেওয়া প্রভৃতি কাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ব্যাপার।

ইঁদ পরবের প্রকৃত স্বরূপটি তাহলে কি?…শাস্ত্রীয় জয়োৎসব? বিত্তা-কাঙ্ক্ষার অর্ঘ্য নিবেদন? না, প্রাক্/প্রত্ন-ঐতিহাসিক কিছু সংস্কারের আরোপিত রূপান্তরণ?…তৃতীয়টিই যে যথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুণ্ডা সমাজে যে ইন্দি পরব প্রচলিত আছে, সেখানের আচারবিধি অনুধাবন করলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁদের 'ইন্দি' সারা বছরই মাঠে থাকেন, ফসল রক্ষা করেন, অপদেবতার কুনজর দূর করেন এবং পূজোর দিনে হাঁড়িয়া বা পচাই মদ, চাল, ফুল এবং হাতে-ছেঁড়া-মুরগীর-মাথা উৎসর্গরূপে পেলেই তিনি খুশী।

যে-সমস্ত উপকরণের মাধ্যমে এই পরব অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি এক-এক করে বিশ্লেষণ করলে এঁকে শুধুমাত্র বৃষ্টির বা শস্যের অধিদেবতা বলেই গণ্য করা যায় না ; অন্তত, মূল যে উৎস থেকে এই পার্বণ উৎসারিত হয়েছে, সেটির তাৎপর্য যে আরো কিছু ছিল, সেটি সন্দেহাতীত।

প্রথমত, শাল গাছকে বিশেষভাবে সজ্জিত কবার আড়ালে আদিম বৃক্ষোপাসনার প্রথা লুকিয়ে আছেই ; 'শবর'-দের অরণ্যদেবীকে বন্দনা করে গাছ কাটার মধ্যে তার একটি পরিচয় রয়েছে। ইঁদ-ডাং তার বিশেষ ধরনের আকৃতির জন্য অবশ্যই 'ফ্যালিক সিম্বল' বা যৌনপ্রতীকী ধর্মধারার ব্যঞ্জনাবাহী। একটি 'গাছ' নারী, অন্যটি পুরুষ—এই কল্পনা ঐ ভাবনাকেই প্রশ্রয় দেয়—বিশেষত, গায়ে ত্রিকোণ খাঁজ কাটা ডাং-টিকে নারী কল্পনা করার মধ্যে যৌনপ্রতীকী ব্যাপারটিত আরো সুস্পষ্ট।

সমস্ত ব্যাপারটার ভিতবে কোথায় যেন একটি বিবাহ উৎসব-কেন্দ্রিক রীতি-প্রকরণের ছায়াপাত ঘটেছে। ডাঙের মাথার 'ছাতা'-রূপী পাতার ঝুড়িটির নাম 'শাঁখা', পুজোর আগের দিনটির পরিচয় 'অধিবাস', পুজো উপলক্ষে খই, চাল, ফুল, দই-ইত্যাদি ছোঁড়া, ইঁদকাঠের মাথায় উল্টো করে ঝুড়িটিকে বসিয়ে দেওয়া এর সবটাই বিবাহ এবং যৌনাচরণের ইঙ্গিত বহন করছে। (আগ্রহী পাঠক এসবের তাৎপর্য বিশদতরভাবে গ্রহণ করার জন্যে এই লেখকের "বিবাহের লোকাচার: আদিম ইতিহাসের সন্ধানে" প্রবন্ধটি ডঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার-সম্পাদিত 'বিবাহের লোকাচার' বইয়ে দেখে নিতে পারেন।) যাঁরা পুজার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাঁরা কেউ-কেউ উপবাসে থাকেন পুজোর আগে, পুজার প্রাক্কালে কেউ সাত পাক ঘোরেন গাছের চারদিক বেড়ে—এগুলিও ত বিবাহের অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ বহন করছে। ইঁদ পুজোয় নরসুন্দর বা নাপিত-দের উপস্থিতির বিষয়টিও অনুধাবনযোগ্য। মৈমনসিংহ অঞ্চলে বসন্ রায়-পুজোয় যে কলাগাছের বিয়ে দেবার রীতি আছে। এইসব প্রথা বেশ কিছু-কিছু তাতেও দেখা যায়, প্রাসঙ্গিক তুলনা রূপে সে কথা বলা যায়।

শস্যবীজ ইঁদকুড়িতে ছড়িয়ে দেবার পর কল বা অংকুর বেরোনোর আগে ধানসিজানো, লাঙল-বাঁশুই চালানো ইত্যাদি ব্যাপার ট্যাবু বলে গণ্য হওয়াটার অন্তর্নিহিত ভাবনাটুকুও অনুধাবন-সাপেক্ষ। শস্যবীজ পুজার স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—এটি ধরিত্রীর গর্ভাধানের প্রতীক হলে, অংকুর বেরোনোর আগে পর্যন্ত সময় তাঁর গর্ভিণী-অবস্থা রূপে গণ্য করতে হয় ; আদিম সংস্কার অনুযায়ী

সেই সময়ে নরনারীর মিলন বহুক্ষেত্রেই ট্যাবু ( বা নিষিদ্ধ সংস্কার )—তাই যে-সব কাজ ঐ বিশেষ কাজটির অনুরূপ বলে মনে হয়েছে প্রাচীন পিতামহদের কাছে—ঐ লাঙ্গল, বাঁশুই ব্যবহার করা ইত্যাদি—সেগুলিও অনিবার্যভাবে নিষিদ্ধ তখন।

সুতরাং ইঁদ পূজার অন্তর্কাঠামো ( ইনফ্রা-স্ট্রাকচার ) যেটি, সেটা 'বৃক্ষের বিবাহ'-জাতীয় একটি অনুভাবনাকে অবলম্বন করে ধীরে-ধীরে একটা চেহারা ধরেছে। এটি অবশ্যই তাহলে আদিম আরণ্যক সমাজের স্মৃতিকে প্রতিভাসিত করে। বৃষ্টি, শস্য, তার সূত্র ধরে বিত্তাকাঙ্ক্ষা—ইত্যাদি বিষয়গুলি উত্তরকালে সংযোজিত হয়েছে।

সমস্যা একটিই অবশ্য থেকে যাচ্ছে: ইন্দ্র এবং 'মাসী' এই পরবে এলেন কেমন করে?...বৈদিক ইন্দ্রধ্বজ পূজার যে বিবরণ মেলে, তাতে এই পরবের অন্তর্গত নানান্ রীতি, উপচার আচার-ইত্যাদির সঙ্গে তার যথেষ্টই সাদৃশ্য দেখা যায়। এমনও হওয়া সম্ভবপর যে, কোনো একটি সময় স্থানীয় কোনো শাসক ( বা রাজা ) ঐ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরই নির্বন্ধে লৌকিক 'ছত্তাবোঙ্গা' ( ছত্রদেবতা )-র পূজা এবং বৈদিক-সংস্কারানুগত ইন্দ্রধ্বজ পূজা সমীভূত হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে স্থানীয় অঞ্চলের 'ইন্দ্র'-স্বরূপ বলে গণ্য করার অহম্মন্যতা সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। ধ্বজছত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রের বিজয়গরিমা ঘোষণার অবকাশে এই শাসকের আত্মকীর্তি প্রতিষ্ঠারও বাসনা সক্রিয় ছিল স্বাভাবিকভাবেই। এক ভূস্বামীর অনুসরণে অন্য ভূস্বামীরাও এই পথের পথিক হয়েছিলেন। এইভাবে একটি ব্যাপক লৌকিক উৎসব ওপরতলার মানুষদের সাহচর্যে মূল চরিত্রটি বজায় রেখেও নূতনভাবে পরিচালিত হল। ছত্তাবোঙ্গা এবং ইন্দ্র মিলে গিয়ে 'ইঁদ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন নূতন নামে। তবে 'মাসী'-র ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করা দুরূহ। ইন্দ্রাণী শচী কিভাবে সাধারণ্যে 'মাসী' ( বা স্থানীয় উচ্চারণে 'মৌওসী' ) হলেন তার হদিশ পাওয়া কঠিন। এই 'মাসী'-বাচক সম্বোধন পূজা-পার্বণের ক্ষেত্রে আর মাত্র দুটি জায়গায় আমরা দেখি: রথে এবং কালীপূজোর প্রাক্কালে অনুষ্ঠেয় অলক্ষ্মী পূজোয়। রথের ক্ষেত্রে 'মাসী'-র তাৎপর্য যথাকালে আলোচনা করেছি। অলক্ষ্মীপূজোর ক্ষেত্রে বহু অঞ্চলেই এই দেবীর নাম মুখে আনা ট্যাবু ( পাছে নাম করলেই দেবী-অলক্ষ্মী স্থায়ীভাবে থেকে যান বাড়িতে; এই ধরণের সংস্কার আদিম ডাইনীতন্ত্রের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ )—তাই তাঁকে 'মা'-লক্ষ্মীর বোন ধরে নিয়ে 'মাসিমা' বলা হয়।

কিন্তু ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতীক যে-ডাং, সেটি কার বোন হিশেবে গণ্য? ইন্দ্র পিতৃদেবতারূপে গণ্য হলে (এখানে সেটি হওয়া স্বাভাবিক, কেননা, তিনি বজ্র বৃষ্টির অধিদেবতা), পৃথিবী হচ্ছেন অতি-অবশ্যই মাতৃকাদেবী, সেক্ষেত্রে শচীব প্রতীক ডাং-কে বসুমতীর ভগিনী রূপে ধায কবা হয়েছে, এমনই যদি হয, তাহলে 'মাসী' নামেব তাৎপর্য বোঝা যায়। কিন্তু এই বক্তব্যকে পুবোপুরি গ্রহণ কবাব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয তথ্য বাস্তবিকই অপ্রাপ্ত বলে এটি সমস্যা হযেই রইল।

সর্বত্র অবশ্য ইঁদ-ডাঙেব জুডিটিকে 'মাসী' বলা হয না এও ঠিক, কিছুই বলা হয় না—এমন এলাকাও কম নয়। দু-একটি অঞ্চল আছে, যেখানে শুধু একটি ডাং-এব পুজোই হয়। ইউবোপেব লোকজীবনে প্রচলিত অনুরূপ উৎসব 'মে পোল'-এব মতো শস্যকামনায় আদিম শিশ্নপ্রতীকী একটি ধর্মধ্বজ সর্বময় হয়ে আছে সেখানে।

## ছাব্বিশ ॥ নানা পার্বণ [৪] : দশহরা, মকর স্নান, কুমির পূজা, ধর্মপূজা

নদী, পশু ইত্যাদির মধ্যে অলৌকিক দৈবী সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তাদের পূজা করার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কার কোনো-কোনো উৎসবের অন্তরীক্ষে রয়েছে। এ ধরণের পার্বণ অসংখ্য : উদাহরণত কয়েকটিই মাত্র এখানে বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে এই সব উপলক্ষের মূল রূপটির কাঠামোটি চিহ্নিত করবার জন্য।

নদী পূজার সবচেয়ে ব্যাপক নিদর্শন হল দশহরা এবং মকর সংক্রান্তির স্নান —যে উপলক্ষে সাগরদ্বীপে বিখ্যাত মেলা বসে প্রতি বছর। এ দুটির মধ্যে মোটামুটি ভাবে একটা সর্বজনীনতা রয়েছে ; এরা ছাড়া আঞ্চলিক ভাবেও কিছু কিছু নদীকে পূজা-অর্চনা করা হয় নানা তিথি উপলক্ষে, যেমন : উত্তরবঙ্গের তিস্তা বুড়ির পুজো, মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব-ইত্যাদি।

দশহরা এবং মকর স্নানের উপর যে-শাস্ত্রীয় তাৎপর্য আরোপ করা হয়েছে, সেটা নিতান্তই কৃত্রিম। নদীমাতৃক একটি দেশে নদীই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে যে, এটাই তো স্বাভাবিক। স্মৃতিকাররা জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমীতে গঙ্গাস্নান করে দশবিধ পাপমুক্তির যে বিধান দিয়েছেন, তার খোলসটি সরিয়ে ফেললেই দেখা যায় যে, মূলত ভরা গ্রীষ্মে নদীনালা খালবিল যখন শুকিয়ে আসে তখন নদীর অধিদেবীর কাছে পূজা-প্রার্থনার মাধ্যমে আবার তাঁর পূর্ণ-তোয়া হবার আবেদনই মুখ্য হয়ে ওঠে। ভগীরথের গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার পুরাণবৃত্ত অনুসারে, ঐ তিথিতেই নাকি সেই ঘটনা ঘটেছিল—এমন মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাসন্ন বর্ষার মরশুমের ঠিক আগে এই উৎসব পালিত হয় প্রকারান্তরে বর্ষার জল এবং নদীর কমে-যাওয়া জলের সম্মিলন প্রত্যাশা করেই।

ভগীরথের আনা গঙ্গার স্রোতে ইন্দ্রের ঐরাবত ভেসে যাবার পৌরাণিক রূপকটিও এ প্রসঙ্গে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। দেবতাদের আয়ত্ত বৃষ্টির জলকে মর্ত্যমানব নদীরূপে পৃথিবীতে নিয়ে আসছেন এবং বজ্র-বর্ষণের অধিদেব ইন্দ্র তাতে বাধা দিচ্ছেন নিজের পর্বততুল্য বাহনকে নদীর গতিপথের মুখে দাঁড় করিয়ে। এই কাহিনী বস্তুতপক্ষে, প্রকৃতির ওপর মানুষের বিজয়েরই দ্যোতক। (প্রমেথিউস-কাহিনী বা অনুরূপ অজস্র অগ্নি-হরণের যে-সব কাহিনী সারা

পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, এটিও ভাবগত দিকে তাদেরই সমগোত্রীয়; বরং, এর গুরুত্ব বেশিই, কেননা ঠকিয়ে বা ভুলিয়ে নয়, মানুষ এখানে বাহুবলে দেবতাকে হটিয়ে নিজের যা প্রয়োজন তাকে অর্জন করছে)।

কৃষির প্রয়োজনে মানুষ নদী থেকে খাল কেটে আনছে প্রকৃতির বাধাকে অতিক্রম করে, আসন্ন বর্ষার প্রাক্কালে দশহরা উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য এটিই। নদী এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধনের রূপকই এই পার্বণের মধ্যে যে ব্যঞ্জিত, দশহরা উৎসবের সঙ্গে ভগীরথ মীথের যোগসূত্র হল এই। নদীরূপিণী গঙ্গার মূর্তিপূজা তারই দ্যোতক ছাড়া আর কিছু নয়।

এই নদী পূজার আর একটি উৎসবই মকর সংক্রান্তি। সূর্য উত্তরায়ণে যাবার প্রাক্কালে সাগর সঙ্গমে গিয়ে স্নান করলে পুণ্য হয় এমন সংস্কার, মূলত, বিশেষ-বিশেষ তিথিতে নদীর জল পুণ্যতোয়া বা সুপবিত্র হয়ে ওঠে—সেই বিশ্বাস থেকেই সঞ্জাত হয়েছে। একদা নদীর মোহনায় প্রথম সন্তান বিসর্জন দেবার ভয়ংকর রীতির পিছনে ঐ নদীর অধিদেবতাকে তুষ্ট করার আদিম কুসংস্কারই সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কিংবা 'বিসর্জন' কবিতাদুটির স্মৃতি সকলেরই আছে অবশ্যই! নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পদসঞ্চার' উপন্যাসটির একটি নাটকীয় মোড়-ফেরা ঐ সাগর-সঙ্গমে সন্তান বিসর্জন দেবার সূত্রেই ঘটেছে, সন্ধিৎসু পাঠকের সেটি অবশ্যই মনে পড়বে। শিশুর পরিবর্তে, এখনও নরমুণ্ডের প্রতিভূ স্বরূপ আস্ত নারকেল ভাসিয়ে দেবার রীতি কোনো-কোনো সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

দেবতার তুষ্টিবিধানের জন্য এই সন্তান-বিসর্জন অতি পুরোনো একটি লোক-সংস্কার। শস্যক্ষেত্রে একটি কুমারী অথবা গর্ভিণী নারীকে বলিদানের রীতি কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র-দেবতার দাক্ষিণ্য লাভ, যাতে পরের মরশুমে ভাল ফসল হয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতি-বলয়ের মতো ভারতেও সে প্রথার হদিশ মেলে: মহেঞ্জোদড়ো এবং চন্হুদড়োতে পাওয়া সীলমোহরে সেই ছবি খোদাই-করা অবস্থায় দেখা গেছে।

এই একই মানসিকতার জাতক, অন্যান্য দেবতার কাছেও এভাবে জীবন্ত মানুষকে উৎসর্গ করার বিশ্বজনীন রেওয়াজও। মকর-সংক্রান্তির তিথিতে সূর্যাবর্তন উপলক্ষে নদী এবং সূর্যের যুগল-বন্দনার সঙ্গে-সঙ্গে সে-রেওয়াজের ক্ষীণ আভাস আজও প্রাপ্য। শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাই নয়—সূর্যের দিকে তাকিয়ে

সমুদ্র-সঙ্গমে ঐ নারকেল ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যে আজকের আধুনিক সময়কালের মানুষও একটি আদিম সংস্কারেরই উত্তরাধিকার বহন করছে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে দক্ষিণ ২৪-পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকায় কুমির পূজো কিন্তু নক্র-মূর্তিকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। এটি স্পষ্টতই পশুর পূজা; ঐ একই অঞ্চলে প্রচলিত দক্ষিণরায় কিংবা উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সোনারায়ের পূজার মতো পশুর অধিদেবতার পূজা নয়। লক্ষণীয় যে, কুমিরের দেবতা বলে পরিচিত কালু রায় কিন্তু এই পূজার প্রাঙ্গণে গরহাজির আছেন। দক্ষিণরায় এবং সোনারায়ের ক্ষেত্রে বাঘ কিন্তু গৌণ, ঐ দুই দেবতাকে তুষ্ট রেখে বাঘের ভয় দূর করাটাই মুখ্য। কিন্তু এই কুমির পূজার ক্ষেত্রে সে রকম কোনো মানব দেহী-তথা-অ্যানথ্রোপোমর্ফিক দেবতার অস্তিত্ব নেই, এ হল সরাসরি পশুকেই তার নিজের চেহারায় (থেরিওমর্ফিক) উপাসনা করা। এ জিনিষ মোটামুটি ভাবে দুর্লভ এখন। মনসার ক্ষেত্রে সাপ পূজিত হলেও, দেবীও সেখানে আছেন মূর্তিতে বা প্রতীকে। বড়িশার কুমির পূজোয় কোনো মানবীয় কলেবরধারী দেবতা না-থাকায়, এটি একদিক থেকে অনন্যভাবে আদিম।

ঠিক এতটা না-হলেও, বহুলাংশেই আদিম ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা আর একটি পরব বাঙালীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দেখি: ধর্মপূজা। এই দেবতার ভৌগোলিক বিস্তার কেবলমাত্র রাঢ় বাংলাতেই হলেও, মঙ্গল সাহিত্যের কল্যাণে এঁর পরিচিতি খুব ব্যাপক।

ধর্মঠাকুরের মতো সমন্বিত-দেবতা খুঁজে পাওয়া ভার। এঁকে একই সঙ্গে সূর্য, যম, শিব এবং বুদ্ধের সমাহৃত রূপ বলে গণ্য করা যায়। ধর্মঠাকুর মূলত কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডে উপাসিত হন। একই সঙ্গে প্রস্তরপূজা এবং পশুপূজার মানসিকতাজাত এই ব্যাপারটি। 'ধর্ম' শব্দটি বৌদ্ধ ত্রিশরণ (ধর্ম-সংঘ-বুদ্ধ)-এর অন্যতম; সমাজের অতি নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যেই তাঁর ভক্তসমাজ আবদ্ধ—এঁরাই একদিন সামাজিক পীড়নে বৌদ্ধ হয়েছিলেন; ধর্মপূজার মধ্যে এঁদের সেই পূর্ব-পুরুষের বিশ্বাস সন্নদ্ধ আছে। ধর্মরাজ হিন্দু সংস্কারানুযায়ী হলেন যম; বৈদিক বিশ্বাসানুযায়ী সূর্য এবং যম উভয়েই বিবস্বানের পুত্র বলে পরে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ভাবনায় অভিন্ন রূপেই গৃহীত হয়েছেন বহু সময়ে।

বৌদ্ধ শূন্যবাদ এবং ধর্মঠাকুরের 'শূন্যমূর্তি' সমানার্থ-ব্যঞ্জক বলে গণ্য করেন অনেক পণ্ডিত। ধর্মঠাকুরের কুষ্ঠ-ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের মাহাত্ম্য তাঁকে সূর্য দেবতার সঙ্গে সমীকৃত করেছে। চড়ক সংক্রান্তিতে ধর্মপূজার প্রথা সূর্যপূজা এবং শিব-অর্চনার সঙ্গেও একে মিলিয়ে ফেলেছে ক্রমে-ক্রমে।

ধর্ম দেবতাকে বিষ্ণুর রূপান্তর বলেও গণ্য করেছেন কেউ-কেউ। এটা বিতর্কসাপেক্ষ। মূলত ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণবীয় উপকরণ যা-যা সমাহৃত হয়েছে, তার সূত্রানুসরণেই এই মতের উদ্ভব—সমাজবিজ্ঞান-সম্মত কোনো তথ্য থেকে এই ধারণা করা সম্ভবপর নয়।

আসলে ধর্ম হলেন ডোম জাতির উপাস্য দেবতা; 'ডোম' শব্দটিও খুব সম্ভবত 'ধর্ম' শব্দ থেকে সৃষ্ট: ধর্ম>ডম্ম>ডোম্ম>ডোম। রাঢ় অঞ্চলে ডোমরা নিজেদের 'ধর্মপুত্র' বলে উল্লেখও করেন। এঁদের আদিম শিলাদেবতা ও কচ্ছপ 'টোটেম' পরবর্তীকালে ওপরতলার সাংস্কৃতিক অভিক্ষেপে যুক্ত হয়েছে। সূর্যদেবতা আদিতে উপাসিত হতেনই—বৈদিক সংস্কৃতির ধারাবাহী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যখন এঁদের ওপর প্রভাব ফেলল তখনই এলেন যম। 'বাঙালী' পুরুষ দেবতারা প্রায়শই শিবের রকম-ফের। বুদ্ধ কিভাবে সমাবৃত হয়েছেন, ওপরে বলেছি। এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে 'ধর্মরঞ্জো' (ধর্মরাজ) রাঢ় বাংলায় গড়ে উঠেছেন। তাঁর পুজোয় শালে-ভর, হাকন্দ-সাধনা-ইত্যাদি ভয়ঙ্কর সব আদিম প্রক্রিয়া আজ অপ্রচলিত হলেও, এই দেবতার পরতে মধ্যে প্রাগিতিহাসের সংস্কারকেই সূচিত করে।

চড়কের দিন ধর্মের ভক্ত্যারা যে বিষধর সর্পসংকুল বিরাট-বিরাট গাছের ওপরে দল বেঁধে ওঠেন 'জয় বাবা ধর্মরঞ্জো' হুংকার দিতে-দিতে তাঁদের পূজার অভিচার হিশেবেই, তার শাস্ত্রসম্মত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। বহু যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত আদিম কোনো প্রত্যয়ই এই প্রথার গভীরে নিহিত। স্মরণাতীত কালের কোনো আরণ্যক ধর্মবিশ্বাসই আছে এর মধ্যে অবলীন হয়ে। শিব বা বিষ্ণু বা বুদ্ধ-কেন্দ্রিত ধর্মীয় ব্যাখ্যান নেহাৎ পরবর্তী কালের অনুলেপন। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজাও বুদ্ধের সঙ্গে একে সংযুক্ত করারই পরবর্তী-কালীন প্রয়াস মাত্র।

বাঙালীর সংস্কৃতিতে উৎসব, পার্বণ-ইত্যাদির প্রভাব যে কতখানি, সম্ভবত তার যথার্থ সন্ধান মেলে 'বারোমাসে তেরো পার্বণ' এই প্রবাদটির মধ্যে। সাধারণভাবে পাঁজিতে যতগুলি পার্বণের তিথি থাকা স্বাভাবিক কিংবা প্রত্যাশিত, তার চেয়েও বেশি উপলক্ষ যে আমাদের জীবনে আসে, এই প্রবাদ তারই একটি সুন্দর উদাহরণ। এই সমস্ত উৎসবের অনেকগুলিই আঞ্চলিকভাবে বেশ কয়েকশ বছর ধরে চলে আসছে, বহু উৎসবের অন্তরালে ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানান্ সংস্কার এবং বিশ্বাসও বিলীন হয়ে আছে। বিভিন্ন পার্বণের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা সেটি দেখেছি আগের অধ্যায়গুলিতে। সচরাচর বাংলার লৌকিক উৎসবগুলি গোষ্ঠীগত এক-একটি উপলক্ষ। কিছু-কিছু গাহস্থ্য-উৎসব আছে, যেমন ভাইফোঁটা বা জামাইষষ্ঠী, যেগুলি প্রায় সর্বজনীনভাবেই পালিত হয়, কিন্তু গোষ্ঠীগত ব্যাপার নয়, নিতান্তই পারিবারিক উৎসবগুলি, ত অগণ্য : এদেরকে এই আলোচনার বাইরে রেখেই মোটামুটি একটা হিশেব নেওয়া চলে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় কি পরিমাণ লৌকিক উৎসব, মেলা-ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের জনগণনা-বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিম বঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা' গ্রন্থের পাঁচ খণ্ডে এ ধরনের উপলক্ষের যতগুলি বিবরণ আছে, তার সঙ্গে পরবর্তীকালে আকাদেমী অব ফোকলোরের ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সংগৃহীত বিবরণগুলি মিলিয়ে নিচে জেলাওয়ারী একটি প্রাসঙ্গিক সারণী সন্নিবিষ্ট করা গেল :

| | | | |
|---|---|---|---|
| কুচবিহার | ১৬৫ ; | ২৪-পরগণা | ৩৯৬ ; |
| জলপাইগুড়ি | ৪৩ ; | দার্জিলিং | ৪৩ ; |
| নদীয়া | ১৩৭ ; | পশ্চিম দিনাজপুর | ১২৮ ; |
| পুরুলিয়া | ৩০৩ ; | বর্ধমান | ৩৬১ ; |
| বাঁকুড়া | ৯৫ ; | বীরভূম | ২৬৪ , |
| মালদহ | ৯৫ ; | মেদিনীপুর | ৫৪৪ ; |
| মুর্শিদাবাদ | ২৭৩ ; | হাওড়া | ১৬৪ ; |
| হুগলী | ১৫১ । | | |
| মোট : | ৩১৬২ ॥ | | |

এই হিশেবের মধ্যে কলকাতাকে ধরা হয় নি, ধরলে যে আরো কিছু বাড়ত সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মতো এত ছোট আয়তনের একটি রাজ্যের পক্ষে মোটামুটি-ভাবে হাজার তিনেকের ঐতিহ্যবাহী মেলা-ও-উৎসব অনুষ্ঠিত হবার এই খবর যথেষ্টই উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নেই! তা-ও এই তালিকার মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন বারোয়ারী এবং সর্বজনীন পূজাগুলিকে ধরা হয়নি।

এটা কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নয়। বাঙালী জাতটাই গড়ে উঠেছে বহুবিচিত্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বহু সহস্র বছরের বিমিশ্রণে, এই বহু-উৎসজতার উত্তরাধিকার বাঙালীর মানসক্ষেত্রকে ভরিয়ে রেখেছে। তাছাড়া, সাঁওতাল, ওরাওঁ, লেপ্‌চা, রাভা, মেচ-প্রভৃতি অজস্র আদিবাসী জাতি বাঙালী প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন নিশ্চিত সৌহার্দ্যে বসবাস করে আসছেন এই রাজ্যে, যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কটাও তার ফলে খুব নিবিড়। এই কারণে, একের কোনো উৎসবের প্রেরণায় প্রতিবেশী অন্যতর গোষ্ঠীগুলি অনুরূপ কোনো উৎসব শুরু করেছেন কোনো সময়ে। এইভাবে, সময়ের বিবর্তনে উৎসব-পার্বণ-ইত্যাদির সংখ্যা বেড়েই গেছে ক্রমে-ক্রমে।

এমন অনেক মেলা-বা-উৎসব আছে, স্থানীয় লোক-প্রসিদ্ধি-অনুসারে যাদের বয়স কয়েকশ বছর; পাঁচশ বছরের পুরোনো বলে কথিত, এমন উৎসবের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। সচরাচর কোনো-না-কোনো ধর্মীয় উপলক্ষে এই সব মেলা-ইত্যাদি বসে থাকে, পশ্চিম বাংলার প্রধান-অপ্রধান সব ধর্মাবলম্বীরাই এগুলির উদ্যোগ নিয়ে থাকেন।

॥ ২ ॥

বয়সের দিক থেকে খুব পুরোনো অনুষ্ঠানগুলি সহজবোধ্য কারণেই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত। এই রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস। এঁদের মধ্যে বৃহত্তম হলেন সাঁওতালরা। এঁরা ছাড়া অস্ট্রিক-নৃবংশজ অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে ওরাওঁ এবং মুণ্ডারা খুবই উল্লেখযোগ্য। উত্তরবঙ্গের টোটো, রাভা এবং লেপ্‌চারাও নানা কারণে উল্লেখনীয়। এঁরা মোঙ্গলীয় নৃবংশজাত। ঐ এলাকারই অধিবাসী রাজবংশী, মালপাহাড়ী প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠীরও নিজস্ব কিছু-কিছু উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এঁদের যেসব পরব আছে, যেমন, করম, সিরুয়া, জাওয়া, বাঁধনা, ছাতা ইত্যাদি, এদের মধ্যে স্মরণাতীত কালের নানান্ স্মৃতি সঞ্চিত-হয়ে আছে প্রত্যক্ষে বেশি, অপ্রত্যক্ষে কম। আলোচনার জন্য নমুনা হিশেবে পুরুলিয়া অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত 'বাহা' পরবের প্রসঙ্গ বলা যেতে পারে। গ্রীষ্মের বিশেষ একটি দিনে অযোধ্যা পাহাড়ের ওপরে প্রত্নপ্রস্তর যুগের স্মৃতিবাহী শিকার-ও-সংগ্রহমূলক জীবনচর্যার অনুকরণ করেন স্থানীয় আদিবাসীরা; সেকালীন সূত্রানুষঙ্গের ট্যাবুও কিছু আছে এই পরবের সঙ্গে জড়িয়ে: যেমন, পরব চলাকালে মেয়েরা পাহাড়ের ধারে-কাছে যেতে পারবে না!

এ রকম অজস্র উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন কোন্ গ্রামের কথা বলবেন কে যেখানে এক-বা-তার বেশি গ্রামদেবতা-বা-দেবী প্রতিষ্ঠিত নেই এবং যাঁকে নিয়ে নানান্ অতিলৌকিক কিংবদন্তী গড়ে ওঠেনি? এই গ্রামীণ দেবতাদের অবস্থিতি কখনো মন্দিরের মধ্যেই হয় বটে, তবে মুক্ত আকাশের নিচে কোনো গাছতলাতেও (বট, বেল, অশ্বত্থ, বকুল-ইত্যাদি) তাঁদের অধিষ্ঠান ঘটে। কখনো-কখনো ঐ গাছটিই হয় দেবতা বলে গণ্য; কখনো আবার এক খণ্ড পাথরই দেবতার বিকল্প বলে মনে করা হয়, ঐ গাছতলায় যাদের অধিষ্ঠান। আদিম বৃক্ষপূজা, প্রস্তর পূজা-ইত্যাদির ঐতিহ্য তাহলে এখনো প্রবলভাবেই প্রচলমান!

দুখানা পাথরের ওপরে আর একখানা চ্যাটালো চেহারার পাথর বসিয়ে দেবতার থান তৈরী (প্রাগৈতিহাসিক 'ডল্‌মেন্'-এর সঙ্গে যার চেহারায় ও চরিত্রে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই) কিংবা পূর্বপুরুষ-অথবা কল্পিত দৈবশক্তির স্মারক হিশেবে লম্বা মাপের একখণ্ড পাথর পুঁতে তাকে পবিত্র 'বীরস্তম্ভ'-রূপে গণ্য করা (প্রত্ন-প্রস্তর এবং প্রাক্-প্রাচীন যুগে এগুলিই 'মেন্‌হির্'-রূপে গড়া হত) ইত্যাদি ব্যাপার এখনো ত গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে ঘটে চলেছে!

যেখানে, এই আদিম ধর্মস্থানগুলি বাহিরঙ্গিক চরিত্রে অন্তত, পরবর্তীকালের সংস্কার গ্রহণ করেছে সেখানেও দেবতা বা সন্তজনের অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিশ্বাসটা প্রায় আদিমকালীনই বলা চলে! সেই বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি ঘটে ঐ পুণ্যস্থান-বলে-গণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলিকে অবলম্বন করে-ওঠা মেলা, উৎসব ইত্যাদির মধ্যে। হিন্দুর ক্ষেত্রে এই সব পুণ্যস্থানের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মাত্রেই হলেন হয় শিব, নয় শক্তির কোনো আঞ্চলিক প্রকরণ, অথবা (বৈষ্ণব-অধ্যুষিত এলাকা হলে) রাধা-কৃষ্ণ। আর মুসলমানের ক্ষেত্রে এই মেলা-উৎসবের

কেন্দ্রে কোনো প্রয়াত পীর বা ফকির গোছের কেউ থাকেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু উৎসবের ব্যাপ্তিটা ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেনা, যথা-অর্থে সর্বজনীন চরিত্র ফুটে ওঠে তার মধ্যে।

॥ ৩ ॥

এই ধরণের কতকগুলি মেলা-উৎসবের নমুনা-স্বরূপ একটি তালিকা এখানে যেওয়া গেল, স্থানীয় লোকপ্রতীতি অনুসারে যাদের বয়স ৫০০ বছরের কম নয়। এই প্রাচীনত্বের কিংবদন্তীকেই এক ধরণের ঐতিহ্যের দ্যোতক ধরে নিয়ে এই তালিকা তৈরী করা হয়েছে।

১. শব্-এ-বরাত-উৎসব, পাণ্ডুয়া ( গাজোল, মালদহ ; '৮০০+' বছর বয়সী বলে প্রচলিত ) ;
২. গাজন-উৎসব, ধরঙ্গি ( খাতড়া ; বাঁকুড়া, '৮০০+' বলে এটিও কথিত ) ;
৩. সিংটির পীরের দরগার উর্স্-উৎসব, ( উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ; '৭০০+' আনুমানিক )
৪. গাজন-উৎসব, সোনাতলী ( উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ; '৬০০+' বছর ) বয়সে অর্ধসহস্রাব্দের কম নয় বলে কথিত, এই মেলা-উৎসবগুলি :
৫. মথদুমী পীরের উর্স্, কশবা মহেশ ( রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর );
৬. কালীপূজা ( বড়বেলিয়া, ইটাহার, পশ্চিম দিনাজপুর ) ;
৭. গোষ্ঠাষ্টমী ( নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ) ;
৮. ধর্মরাজপূজা, কড়েয়া ( মুর্শিদাবাদ ) ;
৯. বারুণীস্নান, মলয়পুর ( আরামবাগ, হুগলী ) ;
১০. চড়ক, দেগঙ্গা ( ২৪ পরগণা ) ;
১১. রাসযাত্রা, পঁচেৎ ( মেদিনীপুর ) ;
১২. গাজন, মেটেলী, বড়জোড়িয়া ( মেদিনীপুর ) ;
১৩. ঈদ, খাতড়া ( বাঁকুড়া ) ;
১৪. রথযাত্রা, জয়পুর, কুটিয়াকোল ( বাঁকুড়া ) ;
১৫. গাজন, দৈয়াপুর, সোনামুখী ( বাঁকুড়া ) ;
১৬. গাজন, গোলনা, পাত্রসায়ের ( বাঁকুড়া )
১৭. গাজন, গোপালনগর, ইন্দাস ( বাঁকুড়া ) ;
১৮. ব্রহ্মচারীপূজা, মনোহরপুর, বোলপুর ( বীরভূম ) ;

প্রায় হুসেনশাহী আমল থেকে চলে আসছে যে সব উৎসব—অর্থাৎ শ-চারেক বছরের কম যাদের বয়স নয়—তাদের মধ্যে মাহেশের (হুগলী) রথযাত্রা, চন্দননগরের (হুগলী) জগদ্ধাত্রীপুজা এবং কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) বারদোল অত্যন্ত পরিচিত।

এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য, প্রথাগত প্রভেদ বা সংস্কারের প্রকাশগত ফারাক আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু একটি কথা এখানে সবিশেষ উল্লেখনীয়। বাংলার পাল-পরবগুলির উপলক্ষে যে-সমস্ত সামাজিক উৎসব হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের চরিত্র সর্বজনীন। ভারতের অন্যান্য এলাকার মতো ধর্ম, বর্ণাশ্রমিক শ্রেণী এবং আঞ্চলিকতার ভাবনা এদের মধ্যে প্রবল নয়। একটি সামাজিক সমন্বয়ের ভাব এই সব পার্বণোৎসবগুলির মধ্যে যে সব সময়েই থাকে, তার অজস্র উদাহরণ দেখানো যায় অবশ্যই। একটি ক্ষেত্রসমীক্ষণের প্রতিবেদনকে ঐ কথার প্রতীক-নিদর্শ রূপে এখানে তুলে ধরছি, যার মাধ্যমে বাংলার পূজাপার্বণের মূল চরিত্রটির যথার্থ রূপটি উদ্ঘাটিত হতে পারবে:

মেদিনীপুর জেলার মেচেদার কাছে (এক্সপ্রেস বাসে ৮-১০ মিনিটের পথ) কাকটে ওরফে কাকটিয়া নামে একটি গঞ্জ হল আশেপাশের ৩২টি গ্রামের স্নায়ুকেন্দ্র। পান এবং লেবুর বলতে গেলে একচেটিয়া বাজার সেখানে। এই কাকটিয়ায় গত ৩০-৩২ বছর ধরে নবদুর্গার প্রতিমা গড়ে পুজো প্রচলিত হয়েছে। ৩২ গ্রামের মোড়লদের মুখপাত্র শ্রীসুকেশ মহাপাত্রের মারফতে এবং প্রত্যক্ষ সমীক্ষায় জানা গেছে এই তথ্যগুলি:

ক. মূর্তি গড়েন যাঁরা হিন্দু-সামাজিক-কাঠামোতে তাঁরা 'ডোম' শ্রেণীর অন্তর্গত;

খ. এই পুজোয় যাঁরা অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী হিন্দুরা ছাড়া আছেন লোধা, মুণ্ডা এবং সাঁওতালেরা; আর বাঙালী মুসলমানেরা;

গ. পুজো করেন ভাটপাড়া থেকে ১৪ জন পুরোহিত এসে;

ঘ. দেবী প্রতিমার নাভিটুকু শুধু গঙ্গামৃত্তিকায় গড়া হয়;

ঙ. হিন্দু পুরাণবৃত্তের নানান্ কাহিনী অবলম্বন করে—যেমন শ্রীবৎস চিন্তা, সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি পুতুল গড়া হয় মণ্ডপে;

চ. জাতি-গোষ্ঠী-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার-হাজার লোক এসে ওখানে পুজোর প্রসাদ নেন—ভাত এবং 'বৈতাল' (মানে, কুমড়ো সিদ্ধ); এতে

কারুরই 'জাত' যায় না কিন্তু! ধর্ম বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এমন সামগ্রিক ঐক্য লোকজীবন ছাড়া আর কোথাও বোধহয় গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এই ঐক্যবোধের খোলা আঙিনাতেই অনুষ্ঠিত হয় বাংলার পূজা-পার্বণ-উৎসব: বিভেদের বোধ সেখানে প্রক্ষিপ্ত।

এই সব উৎসব-পার্বণগুলি বাঙালীর সংস্কৃতির মৌলিক অবয়বটিকে প্রকাশ করেছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। নিছক, নেহাৎ বর্ণনার মাধ্যমে সেই অবয়বের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হওয়া যায় না। মূল উৎসব-পর্বগুলিকে সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্র হিশেবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা গেছে এই বইতে সেই পরিচয়ের আভাস দিতেই। যোগ্যতর গবেষকরা এ-বিষয়ে উত্তরকালে অনেক বেশি সুষ্ঠুভাবে ঐ পরিচয়কে যাতে তুলে ধরেন এই গ্রন্থের একমাত্র অভীপ্সা সেইটিই॥

●

"প্রথম মানুষ কবে
এসেছিল এই সবুজ মাঠের উৎসবে,
দেহ তাহাদের এই শস্যের মত উঠেছিল ফলে,
এই পৃথিবীর ক্ষেতের কিনারে সবজীর কোলে কোলে,
এসেছিল তারা ভোরের বেলায় রৌদ্র পোহাবে বলে,
এসেছিল তারা পথ ধরে এই জলের পথের রবে…"

—'আদিম': জীবনানন্দ দাশ